বাংলা ওয়েবসাইট সৃষ্টিসন্ধান www.srishtisandhan.com বাংলা সাহিত্য ও শিল্প গ্রন্থনার একটি প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত এমনকি দেশের বাইরেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিয়মিত অথবা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় অগণীত বাংলা পত্রিকা। সুপরিচিত পত্রিকা গুলো ছাড়াও অনেক পত্রিকাতেই ধরা থাকে হয়ত বা অনেক ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে, দুর্মূল্য সাহিত্য উপাদান। অর্থ সমস্যা, প্রচার সমস্যা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে অনেক ক্ষেত্রে এরা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সময়ের সঙ্গে এরা হারিয়ে যায়, হয়ত কিছু লাইব্রেরীতে একটা সংখ্যা সংগৃহীত হয়ে থাকে অজ্ঞাতে।

সেখান থেকেই নির্বাচিত কিছু গল্প নিয়ে এই সংকলন। গল্পগুলির মধ্যদিয়ে সাম্প্রতিক বাংলা ছোট গল্পের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর ইন্টারনেটের বেড়াজাল অতিক্রম করে এই দূর্মুল্য সাহিত্য ভাণ্ডারকে পৌছে দেওয়া সম্ভব হবে আরও কিছু মানুষের কাছে।

সৃষ্টি সন্ধান

নাড়ুয়া বারোমন্দিরতলা, চন্দননগর, হুগলী ৭১২১৩৬
www.srishtisandhan.com

সেরা সৃষ্টি গল্প সংকলন

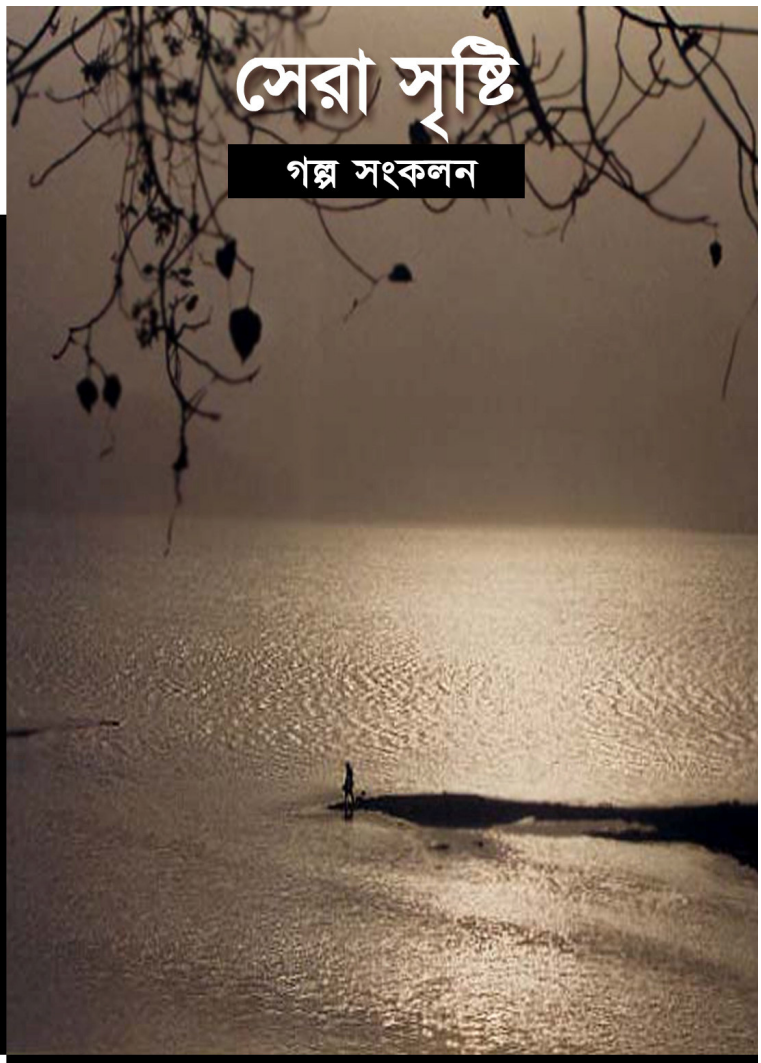

সেরা সৃষ্টি

গল্প সংকলন

সৃষ্টিসন্ধানের বিগত পাঁচ বছরের সংগ্রহ থেকে সংকলিত গল্প সমূহ

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ - লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
আশ্রয় - দিলীপ পাত্র
মহারানির উর্দি ও তিসিখালির কুতুবুদ্দি - জাকির তালুকদার
ভুল্‌কাগড়ের রক্ষী - শক্তি সেনগুপ্ত
সুন্দরবনে বাঘ দেখা - ভগীরথ মিশ্র
জীবন - রাজা
সমিরন - সৈয়দ শামসুল হক
ছায়া নৃত্য - অনুপম দত্ত
প্রয়োজনীয় কিছু কথোপকথন - গৌর বৈরাগী
ভাঙাচোরা মানুষ - নির্ঝর সেন
একটা অন্ধকার সম্মেলন, তার আলো - বিশ্বজিৎ অধিকারী
ছায়াঘর - অসীম চট্টরাজ
চশমা বিভ্রাট - বিমলেন্দু পাল
ডানা - নবনীতা বসু
তিনি হারিয়ে গেলেন - সজল দাশগুপ্ত
বাস্তুসাপ - হেদায়েতুল্লাহ
বিসর্পিল - অনুরাধা কুণ্ডা
ফুল্লরা উপাখ্যান - প্রদীপ সামন্ত
বৃত্তের বাইরে চিত্তপ্রসাদ - রতন শিকদার
শ্বেত পাথরের ঘোড়া - রতন শিকদার
মুখস্থের বাইরে - শতদ্রু মজুমদার
হুইল চেয়ার - হিমাংশু কীর্তনীয়া
শারদীয়া - ভাস্কর
একটি বিয়ে বাড়ির গল্প - অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য
শিরোনামাহীন - সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়
রুলিং পার্টি অপোনেন্ট পার্টি - ব্রত চক্রবর্ত্তী
সমীরণ বরুয়া আসছে - মনোজকুমার গোস্বামী

অমলের বিয়ে - সুকুমার মন্ডল
অমৃত সমান - সমীর সেন
প্রতিদ্বন্দ্বী - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
অর্থ বর্ণ-বিবর্ণ আন্দোলন কথা - সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য
কাঁঠাল - পঞ্চানন কুন্ডু

শতাব্দীসন্ধির ছোটগল্প

বাংলা কথাসাহিত্যে এখন ছোটগল্পের বাজার ভালো নয়। পূজা সংখ্যাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় কে কটা উপন্যাস দিচ্ছে। পাবলিক লাইব্রেরিতে উপন্যাসের চাহিদা বেশি। বইপাড়ার লোকেরা বলেন উপন্যাসের তবু কাটতি আছে। ছোটগল্পের একেবারেই নেই। এই অবস্থায় বাংলা ছোটগল্পের ধারটিকে মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা করে চলেছে লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলিই। সব রকম রচনার পাঁচ মিশেলি সম্ভাবের ওপরও ছোটগল্প তো থাকেই। তা ছাড়া শুধু ছোট গল্পের ওপরও অনেকগুলি পত্রিকা আছে। ছোটগল্প বিষয়ে আলাদা সংখ্যাও বের হয়। এই সব সংখ্যায় বাংলা গল্প, অন্যান্য ভাষা থেকে অনুবাদ গল্প এবং গল্প ও গল্পকারদের বিষয়ে প্রবন্ধ সবই থাকে। হাল আমলের নতুন লেখাগুলিকে এইভাবে পরিচিত করবার দায় নিয়েছেন লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরা।

হয়ত উপন্যাসে হাত দিতে তাঁদের কিছু অসুবিধা আছে। নিজেদের অনিশ্চিত অবস্থায় ধারাবাহিক বড় লেখার দায়িত্ব তাঁরা স্বভাবতই নিতে পারেন না। তাই গল্পের খিদেটা তাঁরা মেটান ছোটগল্প এবং ক্বচিৎ কখনও বড় গল্প বা ছোট উপন্যাস দিয়ে। তবে কারণ যাই হোক এখনকার উঠতি ছোটগল্পলেখকদের প্রধান ভরসা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনগুলিই, এবং এখান থেকেই একটা প্রতিনিধিমূলক সামান্য অংশ সৃষ্টিসন্ধান সংগ্রহশালায় ধরে রাখা হয়েছে।
এই লেখাগুলি থেকে হাল আমলের ছোটগল্পের বিশেষ কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে কিনা এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত। ভালোমন্দমাঝারি মেশা বিশাল স্তূপের ভেতর থেকে ভালো লেখাটি বেছে আনা খুবই কঠিন। নির্বাচকমণ্ডলীর মানদন্ডটিইযে সঠিক এমন অহংকার তাঁদের নেই। তবু মোটামুটি বিচারে বলা চলে যে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের গল্পের মান প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার গল্পমানের থেকে কোনো অংশেই কম নয়। বরং প্রকরনে ও বৈচিত্র্যে অনেক নজর কাড়া।

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাস কিঞ্চি দধিক একশো বছরের। এই একশো বছরের মধ্যে বার বার তার গতিপথ বদলে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে যখন বাংলা ছোটগল্পের পত্তন হল তখন পল্লীগ্রামের ''ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোটছোট দুঃখকথা'' ই তাঁর লক্ষ্য ছিল। সেই রবীন্দ্রনাথই কয়েকবছরের ব্যবধানে গল্পগুচ্ছ তৃতীয় পর্ব লেখবার সময় নিজেকে বদলে ফেললেন। আনলেন তির্যক দৃষ্টি, সমাজ সমালোচনা, ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্লীন নানা জটিল স্তর। যে লেখক দেনাপাওনা, পোষ্টমাষ্টার, সমাপ্তি প্রভৃতি দিয়ে শুরু করেছিলেন তাঁর কলম থেকেই বেরিয়ে এল স্ত্রীর পত্র, নামঞ্জুর গল্প, পয়লা নম্বর এর মত তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী রচনা। এরকম যে হল তার কারণ সাহিত্যে কখনও এক রীতি বেশিদিন চলে না। এখানে টিঁকে থাকার শর্তই হল উত্তরোত্তর নতুন রকমের লেখা। তাই রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধকেরা যুগধর্মে ও নিজ নিজ স্বভাবধর্মে প্রত্যেকেই আলাদা। কল্লোল, কালিকলম প্রভৃতি পত্রিকা আশ্রয় করে যে তরুণ লেখকগোষ্ঠী দেখা দিলেন তাঁরা অনেকেই বেছে নিলেন নিম্নবিত্ত নাগরিক জীবন বা হত দরিদ্র অন্ত্যজ জীবনের ক্লেদ ও গ্লানির বৃত্তান্ত। কথা বললেন সেখানকারই ভাষায়। বিংশ শতকের তৃতীয় দশক বাংলা ছোটগল্পের স্বর্ণযুগ। তখন - বিভূতিভূষণের আত্মমগ্ন প্রকৃতিদৃষ্টি, তারাশঙ্করের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সম্মিলিত প্রেক্ষিতে দেশের পরিবর্তনশীল রূপ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ক্রমান্বয়ে ফ্রয়েডিয় ও মার্কসীয় তত্বের প্রয়োগপরীক্ষা একের পর এক ঢেউয়ের মত এসেছে। মোটামুটি ঐ সময়েই বনফুল দেখিয়েছেন জীবনের উপরিতলের চঞ্চল ঝিকিমিকি, সূচনা করেছেন অণুগল্পের। সতীনাথ ভাদুড়ির রাজনৈতিক বীক্ষা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাসপ্রয়ান আমাদের মুগ্ধ করেছে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর চার ইয়ারি কথা বা নীললোহিতের গল্পগুলি নিয়ে আমাদের বুদ্ধির কাছে আবেদন রেখেছেন। পরশুরাম মাতিয়েছেন উতরোল হাস্যে। এই রকমভাবে ক্রমাগত পরীক্ষানিরীক্ষায় বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি বাংলা ছোটগল্প তার গতিধারা অব্যাহত রেখেছিল।

বিশ শতকেতর মধ্যভাগ বাঙ্গালীর জীবনে বড় দুঃসময়। ততদিনে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগের পর্বগুলি পার হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসে গেছে। খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে সমস্যার আর শেষ নেই। সেই সার্বিক উদ্‌ভ্রান্তির কালে বাংলা কথাসাহিত্যের মূল ধারাটি নিঃশব্দে ছোটগল্পকে গৌন করে দিয়ে উপন্যাসের দিকে প্রবাহিত হল। সবুজপত্রের যুগে প্রমথ চৌধুরী ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন বাংলা ভাষায় উপন্যাসের সম্ভাবনা তেমন উজ্জ্বল নয়, কারং স্বরূপ তিনি বলেছিলেন যে বাঙ্গালীর জীবন নিস্তরঙ্গ ও গতানুগতিক বলে সেখানে ছোটগল্পের বিকাশ স্বাভাধিক, কিন্তু মহৎ উপন্যাসের আবহাওয়া তৈরি হতে গেলে জাতীয় জীবনে যে সংঘাত ও বিশালতার অভিজ্ঞতা দরকার বাঙ্গালীর তা নেই। এই ভবিষ্যদ্বানী সত্য হল না, কারণ বাঙ্গালীর ইতিহাসটাই বদলে গেল হঠাৎ। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে উপর্যুপরি দুর্ভাগ্যের আঘাতে গৃহগতপ্রাণ বাঙ্গালী তার শান্তি স্থিতি ও সন্তোষ হারিয়ে ফেলল। তীব্র জীবনসংগ্রামে ভেঙে গেল তার সামাজিক অচলায়তন। মহৎ উপন্যাসের অনুকূল লগ্ন শুরু হল।

এর পর থেকে বাংলা উপন্যাসে যত পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে ছোটগল্পে ততটা হয় নি। লেখা হয়েছে বিস্তর। এ কালের ঔপন্যাসিকেরা প্রত্যেকেই গল্পও লিখেছেন। সেগুলির উন্নত মান নিয়ে সন্দেহ নেই। তবুও একথা ঠিক যে তাঁদের উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পগুলি নিষ্প্রভ। তাতে এমন কিছু নেই যা উপন্যাসে মিলবে না।

শতাব্দীশেষে মনে হচ্ছে বাংলা ছোটগল্প এতদিনে তার একটা নিজস্ব বাসভূমি খুঁজে পাচ্ছে। এখনও এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলবার সময় আসে নি। উঠতি লেখকদের বিক্ষিপ্ত দু চারটি লেখা থেকে তাঁদের মনের কোনো হদিশ আমরা পুরোপুরি পাই না। যা করা যায় তা হল শুধুমাত্র কতগুলি প্রবণতাকে চিহ্নিত করা।

অসীম চট্টরাজের ছায়াঘর গল্পটি এই রকম -- চার বন্ধু মিলে একটা কমপিউটার প্রোগ্রাম চালু করেছিল। তাদের মধ্যে সঞ্জীবের দক্ষতা ছিল কম কিন্তু চেহারাটি ছিল সুদর্শন। সেই সঞ্জীবের নানা ভঙ্গী দিয়ে ইনটারনেট চ্যাট শো ভরিয়ে ওরা দর্শক টানত। সেই টানে আটকা পড়েছিল একটি মেয়ে। মেয়েটি ছাত্রী, হস্টেলে থাকে। সচ্ছল, সাহসী ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রবন। চ্যাট শোর মাধ্যমে সঞ্জীবের সঙ্গে আলাপ করে তার মন ভরে নি। তাকে সে ভালোবেসে ফেলে এবং আরও বেশি করে জানতে চায়। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে . অবশেষে মেয়েটি পৌঁছয় সেই ডেরায় যেখান থেকে ঐ চ্যাট শো হত। গিয়ে সে জানতে পারে সঞ্জীব অনেক আগেই মারা গেছে। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে কারন বেশির ভাগ লভ্যাংশ সে একাই দাবি করেছিল। এখন লোকে যা দেখে তা মৃত ব্যক্তির নানা ইমেজ মাত্র। সঞ্জীবের সহকর্মীরা এই ইমেজগুলিকে জ্যান্ত করে নিজেদের টেকনিক্যাল জ্ঞান প্রয়োগ করে তাই দিয়ে ব্যবসা করছে। সত্যিটা জানবার পর মেয়েটির মনে কোনও হৃদয়ঘটিত প্রতিক্রিয়া হল না। শোক দুঃখ নয়, ঠকে যাবার জন্য রাগ নয়। বিজ্ঞানের ে করামতিতে বিস্ময় নয়। সে শুধু বিমূঢ় হল এই ভেবে যে জগতে কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কে জানে? ''সন্‌জিদা হস্টেলে গেল না। পূর্ণ চন্দ্রের আকাশে গিয়ে বসল গঙ্গার ধারে। স্টিমার ছাড়ার আওয়াজ, বড় জাহাজটার স্থির ভেসে থাকা, যা যা কিছু ও দেখছে, আশঙ্কা হয় সন্‌জিদার, তা কি দেখছে, না কি ডিসকভারি চ্যানেলের কোনো ডকুমেন্টরি?''

গল্পটা কল্পবিজ্ঞানের, কিন্তু একে ঘিরে ভিন্নতর অর্থব্যঞ্জনার একটি বলয় রয়েছে - তা হল খণ্ডিতপরিচয় মানবসম্পর্কের চেতনা। আমরা যার সঙ্গে চলি ফিরি, ঘরসংসার করি, তার ভেতরকার আসল মানুষটা যদি ইতিমধ্যে মরে গিয়ে থাকে তা কি আমরা সহজে বুঝি। তার নানা ইমেজের খণ্ডিত পরিচয়ের মালা গেঁথে তাই নিয়েই দিন চলে যায়।

এইরকম রূপকধর্মিতার ঝোঁক একালের বেশ কিছু গল্পে আছে। ব্যাপারটাকে কাব্যধর্মী বলা যায় কি? বিশেষ করে সাম্প্রতিক অনেক কবিতার ভেতরেই যেখানে প্রচ্ছন্ন থাকছে গল্প। জয় গোস্বামীর অনেক কবিতাই তাই। কবিতায় উপন্যাসোপম বড় গল্প লেখা হচ্ছে। শুধু জয় গোস্বামীর 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' ই নয়। অনেকদিন আগে আনন্দ বাগচি লিখেছিলেন 'স্বকালপুরুষ'। হারিয়ে যাওয়া সেই বই সম্প্রতি কোনও লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ইংরাজি ভাষাতেও সম্প্রতি কাব্যোউপন্যাস লেখা হচ্ছে এবং কোনও কোনও লেখকের ছোটগল্পে থাকছে বিমূর্তের ব্যঞ্জনা। আমেরিকান লেখক রোয়াল্‌ড্ ডাহেল যার প্রকৃষ্ট উদাহরন।

অমর মিত্রের জগৎপুরের ভগবান গল্পে রয়েছে এইরকম প্রচ্ছন্ন কাব্যভাষা। কলকাতার আনন্দবাবু শস্তা পেয়ে জগৎপুরে খানিকটা জমি কিনেছিলেন। একটা বাড়িও করে রেখেছেন। কিন্তু বসবাস করতে পারছেন না। কারন এখানে পাকারাস্তা, বাসরুট, জলকল, ইলেকট্রিক লাইন এসব কিছুই নেই। অসহিষ্ণু আনন্দবাবু বলেন '' কবে হবে?'' আর এখানকার আদি বাসিন্দা গৌড়েশ্বর মণ্ডল নিশ্চিন্তে বলে আপনি বাস করুন না, ও সব ভগবান যেদিন চাইবেন সেদিনই হবে।'' এই চাপান উতোরের মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন কাটে। আনন্দবাবুর আর জগৎপুরে আসা হয় না।

এ গল্প নগরায়ন সমস্যার গল্প নয়। মধ্যবিত্তের বাড়ি করা নিয়ে স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নভঙ্গের গল্পও নয়। এ হল দুটো দৃষ্টিভঙ্গীর গল্প, একটা চায় উন্নতি, অন্যটা চায় সন্তোষ। এখন জগৎপুরের কোন বাসিন্দা কি নিয়ে আনন্দে থাকবে সেটা সে নিজেই ঠিক করুক।

কোথাও কোনও ঘটনা নেই এমন গল্প আছে, যেমন রাজা লিখিত জীবন। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কামরায় একটা বছর দশেকের ছেলে ভিক্ষা করছে। ছেলেটা একা এবং বোবা। সঙ্গে প্লাস্টিকের থলিতে দুটো আধপচা আম ছাড়া আর সঙ্গে কিছু নেই। এই ছেলেকে নিয়ে যাত্রীরা নানা জনে নানা রকম মন্তব্য করছে এবং পরক্ষনেই তার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এটা খুবই গতানুগতিক একটা স্কেচ। যাত্রীদের ব্যবহারবৈচিত্র্যের মধ্যে সমাজের চেহারাটা ফুটে উঠছে। সতর্ক, সন্দেহপরায়ন, বিশ্বনিন্দুক, সব জান্তা, নির্দয়, করুনা দেখাতে চাওয়া, নানারকম মানুষ আছে। আছে কুরোসাওয়া - পুদোভকিন আওড়ানো আঁতেল তরুণ তরুনীও। আছে অনীক নামের এক সফল শহুরে বহিরাগত ছেলে, এইরকম ট্রেনযাত্রা যার কাছে নতুন। এই ভিন্ন পরিস্থিতির ছেলেটির দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখা হয়েছে বলেই গল্পে একটা অভিনবত্ব এসেছে। সে ঈষৎ কৌতুককৌতূহলে সব কিছু দেখছিল, যদিও বোবা ভিখারি বালক সম্বন্ধে সেও ছিল উদাসীন। শেষে নোআদার ঢাল নামক এক ছোট্ট স্টেশন আসে। জানালা দিয়ে অনীক দেখে সামনে প্ল্যাটফর্মে বসে আছে ময়লা থান পড়া খুনখুনে এক বুড়ি। ট্রেন ছাড়বার পর অনীকের চোখে পড়ল হঠাৎ কোথা থেকে ট্রেনের সেই বোবা ছেলেটা এসে বুড়ির পাশে দাঁড়িয়েছে। দুজনে হাত ধরাধরি করে ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে। ''প্রতি মূহূর্তে দূরে সরে যেতে থাকা সেই বালক, নুব্জ্য বৃদ্ধা, দিগন্ত বিস্তারী ধানক্ষেত, আর ক্রমশ ম্লান হয়ে আসা দিনের আলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অনীক।'

কথাসাহিত্যের সবচেয়ে বড় ভাণ্ডার হল সমসাময়িক জীবন। এরপর সে কথায় আসি।
সম্প্রতি আমাদের দেশটা দ্রুত বদলাচ্ছে। ইন্টারনেট ও কেব্‌ল্‌ টিভির দৌলতে পৃথিবীর কোনও কিছু আর অজানা নেই। বিশ্বায়নের হাত ধরে হচ্ছে নগরায়ন। কলকাতা ও মফঃস্বলের ক্রমস্ফীতি, নতুন নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির বাহারি নক্‌শা বুঝিয়ে দিচ্ছে লোকের জীবনযাপনপ্রনালীর ক্রমপরিবর্তনশীলতা। ঝকঝকে ফ্লাইওভারের ধারে ধারে বিশাল হোর্ডিংগুলি সেক্‌স্‌ ও লোভের নিপুন ছলনায় দর্শককে এক মায়াজীবনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। শুধু তেল সাবান ক্রিম শ্যামপুর শস্তা লোভানি নয়। উচচমানের ফ্ল্যাট, ব্র্যান্ডেড গাড়ি, নামকরা হোটেলে ডিনার, সপরিবারে বিদেশ ভ্রমন -- এইসব কাম্যবস্তু এখন অনেকেরই নাগালের মধ্যে এসেছে। এ সব বা ততোধিক যারা পেল তারা সেজন্য কী মূল্য দিল, এবং কেমন আছে, যারা পাবার জন্য মরিয়া তারা কেমন আছে, এবং যারা পাবে না কিন্তু পাবার জন্য লোলুপ ও বিক্ষুব্ধ তারা কেমন আছে, সব ছবিই আধুনিক ছোটগল্পে পাওয়া যায়। তবে কিছুকাল আগেও যেমন গরিব বড়লোক শ্রেণীনির্নয়ের একটা বাঁধা ছক ছিল -- ধনী হলেই খারাপ আর গরিব হলেই ভালো, আর দুয়ের সম্পর্ক শুধুই শ্রেনীসংগ্রামের সেই সব মোটাদাগের ধ্যানধারনা থেকে একালের গল্পকারেরা অনেকটাই মুক্ত। এমন কি নারী সম্পর্কে একালের মূল্যায়নও বদলে যাচ্ছে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছামতী বেরিয়েছিল। সেখানে স্বৈরিনী নারী গয়া সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন ''মেয়েমানুষ কিনা, তাই পাপপথে গেলেও তার হৃদয়ের ধর্ম বজায় আছে ঠিক।'' এখনকার কালের কোনও লেখক আর এই ক্ষমাশীল চোখে মেয়েদের দেখেন না। শিক্ষাবিস্তার, চাকরির সুযোগ, সম্পত্তির অধিকার এবং আইনি রক্ষাকজচ মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুলে দিয়েছে, এবংসমাজের কোন কোন শ্রেনীর নারী সেই প্রতিষ্ঠা পেয়েও গেছে। পাবার পর দেখা যাচ্ছে, অন্ততঃ লেখকেরা সেই রকমই দেখেছেন, যে হৃদয়ধর্মে নারী বড়' এটা নেহাতই গল্পকথা। সুযোগ পেলে স্ত্রী পুরুষ দুজনেই সমান খারাপ হতে পারে। আধুনিক গল্পকারেরা অনেকেই এভাবে মানুষের শ্রেণীপরিচয়ের অন্তরালবর্তী আত্মাটাকে দেখতে চান। তাই মানবসম্পর্কের জটিলতা নিয়ে বহু গল্প আছে। বিশেষত ঃ ভাতকাপড়ের সমস্যা যেখানে নেই সেখানেই এসববেশি আছে। আছে দম্পতির পরস্পরের কাছে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা, আছে সচ্ছল সংসারের নির্দয় আত্মকেন্দ্রিক নারী, নিজের পরিবারে কোনঠাসা পুরুষ, প্রেমহীন দাম্পত্যের বিমূঢ় সন্তান। অসংযম দেখে যারা বড় হল তাদের উদ্দাম বয়ঃসন্ধি। নিজের বিবেককে সুবিধার খাতিরে অবিরত চুপ করিয়ে রাখার আত্মনিপীড়ন। এ সবই গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে, তবে সোজাসুজি গল্প বলার রীতি এখন আর নেই। সব কিছুর উপর লেখকেরা একটা পাতলা দার্শনিকতার আড়াল টেনে দিতেই যেন বেশি আগ্রহী।

একটু আগেই দেশের উন্নতির কথা বলেছি। এই উন্নতির একটা উলটো পিঠও আছে। আজ যেখানে মায়াপুরীর মত আলো ঝলমল আবাসন, কিছু কাল আগেই হয়ত সেখানে ছিল ডাঙ্গা, জঙ্গল, খেত ও গ্রাম। সেখানকার আদি অধিবাসীরা কোথায় গেল? কি ভাবে এখন তারা সংসার চালায়? বাঁকুড়া মেদিনীপুরের দিকে নিঃশব্দে মাইলের পর মাইল জঙ্গল লোপাট হয়ে যাচ্ছে। বন্য হাতি লোকালয়ে চলে আসছে। জঙ্গলের আশ্রয়ে যারা বাস করত সেই সব মানুষেরা কোথায় গেল? কাগজে তাদের খবর বেরোয় না। জীবনানন্দ হলে বলতেন তারা হেমন্তের অবিরল পাতার মতন ঝরে গেছে। আধুনিক উদ্বাস্তুদের এই ঝরে যাবার বৃত্তান্ত এখনও কোনও নামকরা লেখকের বিষয়বস্তু হয় নি। কিন্তু নতুন লেখকদের মধ্যে, যাঁদের গ্রামগঞ্জে শেকড় আছে কেউ কেউ সচেতন হয়েছেন। হতদরিদ্র অঞ্চলে আজকাল দালাল ঘোরে। তারা শুধু মেয়ে পাচার করে না, ছেলেদেরও করে। উঠতি বয়সের কর্মহীন ছেলেরা কাজের আশায় চালান হয়ে যায় মুম্বই, গুজরাট, দিল্লির বস্তিতে। সেখানে তাদের অর্ধাহার বন্দিদশা, যৌনপীড়নের ইতিহাস পরিবারের বাইরে বিশেষ ছড়ায় না, কারন তাদের না আছে ইউনিয়ন, না আছে ভোটাধিকার।
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের ছবিটা আর একরকম। সেখানে মেধাবী, করিতকর্মা এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা আজকাল স্বদেশে বা বিদেশে যেখানে হোক একটা কাজ জুটিয়ে নেয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সেই অংশ, যারা মেধাবী নয়, নিম্নমানের স্কুল কলেজে পড়ে কোনোমতে পাশ করে বেরিয়েছে, ঠিকমত বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ যাদের নেই, একটা চলন সই জীবিকা খুঁজতে খুঁজতে তাদের সারা যৌবনকালটা কেটে যায় তারপর নানা উঞ্ছবৃত্তির মধ্য দিয়ে কাটে বাকি জীবন। এদের একটা বড় অংশকে কাজে লাগিয়ে রাখে রাজনৈতিক দলগুলি। শরীরের শিরায় শিরায় যেভাবে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে আজকাল ক্ষমতা দখলের রাজনীতি সেভাবে আমাদের সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। নেতারা এই ছেলেদের সেই কাজে লাগায় এবং কাজ শেষ হলে অনায়াসে নষ্ট করে ফেলে। এ বিষয়ের গল্প প্রায়ই দেখা যায়। ঘটনাচক্রে যারা অন্ধকার জগতে পা বাড়ায় তাদেরও গল্প আছে। আর যারা কোথাও গেল না, কেবল আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেল তাদের কথাও লেখকেরা মনে রেখেছেন।

এই বহুবিচিত্র সমাজজীবন থেকে তুলে আনা দু চারটি গল্প এবার দেখা যাক।
সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের অথ ''বর্ণ বিবর্ণ আন্দোলন কথা'' একটি অল্প কথার গল্প। একদিন ছুটির সময় কোনও কারখানার মালিক জনৈক শ্রমিককে ফরমাশ করেছিল এক গ্লাস জল দিয়ে যাও। এতে আত্মমর্যাদার হানি হল মনে করে ঐ শ্রমিক এমন আন্দোলন পাকিয়ে তুলেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত মালিককে ক্ষমা চাইতে হয়। এ ঘটনার তিরিশ বছর পরে এখন পুরোনো মালিকের ছেলে মালি, এবং

পুরনো শ্রমিকের ছেলে শ্রমিক হয়েছে। একদিন সবে ছুটি হয়েছে এমন সময় ঐ মালিক ঐ শ্রমিকের কাছে এক গ্লাস জল চাইল। শ্রমিক কিছুমাত্র আপত্তি না করে তক্ষুনি জল এনে দিল এবং পরিবর্তে মালিকের কাছে বকশিস পেয়ে খুবই খুশী হল।

বুদ্ধদেব গুহর নান্দনিক উত্তমপুরুষে বলা গল্প। বক্তা প্রবীন লোক , ধনী এবং সফল চাকুরিজীবী। ইদানিং তার শরীর ভালো যাচ্ছে না বলে সেবাযত্নের জন্য বেয়ারা নন্দনের ওপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়। স্ত্রী তৃনা সোসাইটি লেডি। স্বামীর দেখভাল করবার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই তার নেই। তাতে অসুবিধা হয় না কারন নন্দন তার মনিবকে আন্তরিক ভালোবাসে ও যত্ন করে। ছেলেটির বুদ্ধিপ্রখর, তাই অবসর সময়ে মোটর ড্রাইভিং শিখে নিয়েছে। যদিও এখনও লাইসেন্স পায় নি। সৎপথে সে উন্নতি করতে চায়। এই নন্দনকে কয়েকটা পুরনো শাড়ি চুরি করার মিথ্যে অপবাদ দিয়ে একদিন গৃহকর্ত্রী তাড়িয়ে দিল। আসল কারন নন্দন তার স্বামীর শিবিরের লোক, সে তার হাতের মুঠোয় থাকবে না। তার গম্ভীর ও সংযত স্বভাবের কাছে কর্ত্রীর ইগো আহত হত সেটাও একটা কারন। মোটের ওপর নন্দনকে অন্যায় করে তাড়ানো হল এবং যাবার আগে তার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল না। ক্ষুব্ধ গৃহকর্তা মনে মনে ভাবে ''ঝাড়খণ্ডে(নন্দনের দেশ) মাওবাদিদের খুব দৌরাত্ম্যের খবর পড়ি কাগজে। নন্দনের ঠিকানা আমার কাছে নেই, তৃনার কাছে আছে। ভাবলাম ওকে একটা চিঠি দিয়ে দিই। বলি -- যা ভিড়ে যা ওদের দলে।'

ভগীরথ মিশ্রের সুন্দরবনে বাঘ দেখা বেশ উপভোগ্য গল্প। সুন্দরবনের পাখিরালয়ে কলকাতা থেকে একটা দল এসেছে। অফিসার লোক সব, বাড়ির ছেলেমেয়েরাও সুন্দরবন না বলে বলে সুন্ - ডোর - বন্। যথারীতি খানাপিনা, রংতামাশা, গৃহিনীদের ব্যাঘ্রভীতি এবং কর্তাদের বাঘ মোকাবিলার সাহসী গল্পে সারাদিন কেটেছে। নিঃশব্দে তাদের সেবা করে যাচ্ছে স্থানীয় বেহারা রতিকান্ত। রাত নামলে এক সাহেব ঢুলুঢুলু চোখে রতিকান্তকে ডাকেন। তারপর এইরকম কথাবার্তা হয়। --

সাহের রতিকান্তকে বলেন-- ''কী হে, গ্রাম ট্রাম আছে - নাকি এদিকে?''

''আছে তো।'' -- খুব নির্লিপ্ত জবাব রতিকান্তের

''তাতে মানুষ থাকে?''

''থাকে বৈকি, অনেক মানুষ থাকে।''

''কী বলছ?'' ভার্মা সাহেব রতিকান্তের প্রতি সামান্য বিরক্ত বুঝি। ''আমি তো কতবার এসেছি এদিকটায়। খালি তো জঙ্গল আর জঙ্গল। গ্রাম কই? মানুষ কই?''

রতিকান্তের সারা মুখে আলোআঁধারি ছায়াখানি প্রকট হয়। চোখের মনিজোড়া সামান্য জ্বলে ওঠে। খুব চেরা গলায় বলে ওঠে '' মানুষ কী করে দেখবেন হুজুর? সন্দরবনে তো কেউ মানুষ দেখতে আসেনা। সবাই বাঘ দেখতে আসেন হুজুর, বাঘ!'' বলতে বলতে দপ্ করে জ্বলে ওঠে রতিকান্তের চোখ। ক্ষনেকের তরে পশুর চোখের মত নীলাভ হয় চোখের মনি।

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের শিরোনামহীন এক অতি সাধারন ছেলের গল্প। মানব চক্রবর্তীর জীবিকা টিউশনি। তার বয়স আটাশ, বাবা মৃত, বোন এক মিস্ত্রির সঙ্গে পালিয়ে গেছে, তার খোঁজ নেই। একদা মানবের একটি প্রেমিকা ছিল। তারা এখন ফ্ল্যাট কিনে অন্য পাড়ায় উঠে গেছে। মেয়েটি ভালো চাকরি করে। কালভদ্রে তাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। একদিন মানবেরা তিন বন্ধু মিলে মজা করতে করতে এক গণৎকারের কাছে হাত দেখাতে গিয়েছিলে। মানবের হাত দেখে গনৎকার বলল -- এ হাতে আপাতত : ভালো কিছু হবার নেই। -- কিছুই কি নেই? হাঁ, আছে বটে একটা জিনিস, তবে তা কোনো কাজে লাগবে না। কী জিনিস? গনৎকার বলল-এ গ্রেট লাভ। অবিশ্বাসের মধ্যেও কথাটা মানবের কানের কাছে গুনগুন করে। অনিবার্যভাবে তার পা চলে যায় প্রেমিকার বাড়ির দিকে। গিয়ে দেখে সেখানে আজ জোর মজলিশ। চাকরিতে তার একটা বড় লিফ্ট্ হয়েছে। তাই বন্ধুবান্ধবের নেমন্তন্ন। মানবকে সে আদব. করে তাদের মধ্যে নিয়েযায়। সেখানে তার আলাপ হয় ঝকঝকে এক যুবকের সঙ্গে, যে মেয়েটির বর্তমান প্রেমিক এবং ভাবী স্বামী। এই যুবকের চোখে অভ্রান্তভাবে ফুটে আছে মানবের সম্পর্কে গভীর অবজ্ঞা ও চাপা বিদ্রূপ। মর্মাহত মানব নিমন্ত্রনের হৈ হল্লা থেকে যত তাড়াতাড়ি পারে পালিয়ে আসে। পালিয়ে এসে সে যায় তার দৈনন্দিন কাজে। এই সময় একটা ফাঁকিবাজ, বাচাল টিন এজার মেয়েকে সে পড়ায়। সেদিন পড়ার ফাঁকে বিমর্ষ বিরক্ত মানবের দিকে হঠাৎ মুখ তুলে মেয়েটা বলে ওঠে ''মাস্টারমশাই, আমি আপনাকে খুব কষ্ট দিই, না? '' মানব চমকে যায়। ঐ দৃষ্টি ঐ স্বর তার অন্তরাত্মা চেনে। এ হল গনৎকার কথিত ''এ গ্রেট লাভ'' যা এখন আর তার মত ভাঙাচোরা মানুষের কোনও কাজে লাগবে না।

এইভাবেই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পগুলিতে উঠে আসছে সমকালীন জীবনের নানা খন্ডচিত্র।

উপসংহারের দিকে যেতে যেতে অনিবার্যভাবেই কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে। গল্পলেখকেরা জীবনের খণ্ডচিত্র দেখাবার সময় বিশেষকরে সেইগুলিকেই কেন বেছে আনেন যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হতাশা, ক্ষোভ, মোহভঙ্গ? কেন তাঁরা মনে মনে এত তিক্ত? আশা, আনন্দ, প্রেমের ছবি নেই তা নয় তবে তুলনায় কম। হাসির গল্পও কম। এমন হবার নানা কারন থাকতে পারে। হয়ত এককালে সরল নিটোল সুখের গল্প বাংলা ভাষায় অনেক লেখা হয়েছিল বলেই এখনকার লেখককুল কালের নিয়মে বিপরীত মুখী। এমনও হতে পারে যেঠিক এই মূহূর্তে বাঙ্গালীর জীবনে বড় কোনও আদর্শ না থাকায় তার মন কোনও বিশ্বাসে স্থিত হতে পারছে না। তাই ভিতরে বাইরে শুধু - ভাঙচুরই দেখছে। কিংবা এও হতে পারে যে এটা একটা সাময়িক অবস্থা। কারন যাই হোক সমসাময়িক গল্প আমাদের একটা অস্থির, অনিশ্চিত, বিক্ষুব্ধ ও প্রশ্নাকুল জগতের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

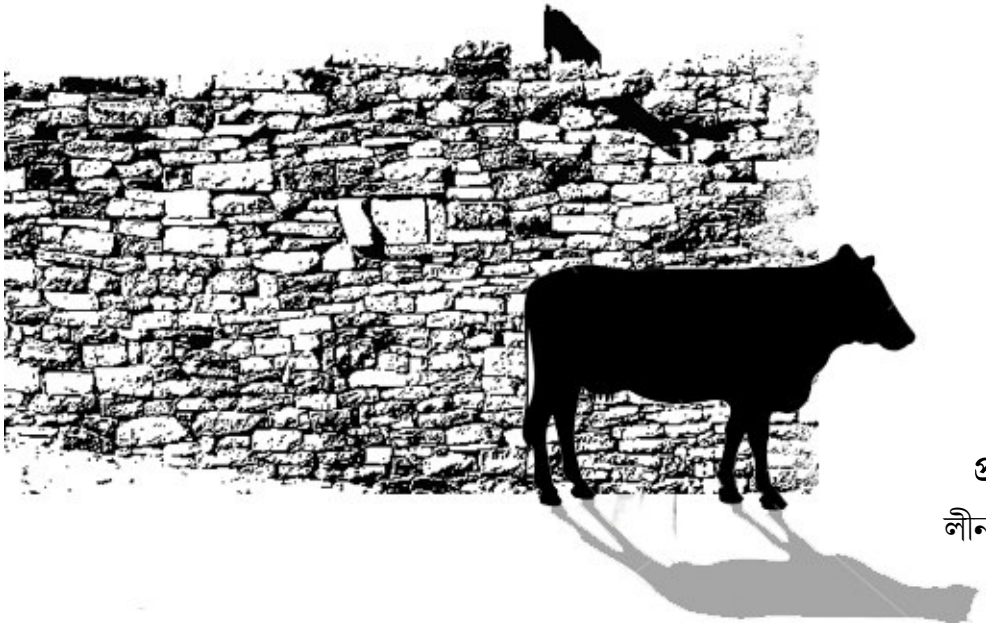

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

খবরটা দিল খুদি। সহিমুদ্দিনের বড় মেয়ে। রোজকার মতো সকালবেলা চলটা-ওঠা কাপে গরম চা এনে ঘুম ভাঙাল। তারপর তিড়ং বিড়িং লাফাতে লাফাতে বলল---- 'চাচা, আজ আমাদের বাছুর আনবে। আববা হাটে গেছে।'

কাল রাতে বেশ কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই আজ ঠাণ্ডা পড়েছে জাঁকিয়ে। কম্বল ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। তার ওপর আজ ইস্কুল ছুটি। সারাদিন করারও কিছু নেই। আকাশ এখনও মেঘলা। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। জানলা দিয়ে পেছনদিকের খেত মাঠটা দেখা যাচ্ছে দু - একজন মাঠে ফসল তোলার কাজ করছে। মনে হচ্ছে আকাশটা যেন ওদের মাথার ওপর নেমে এসেছে। এইরকম দিনগুলোতে এখনও প্রবমেম হয়...মনে হয় সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে পালিয়ে যাই। মা-দাদা-বউদি-বনশ্রী-কফিহাউস-একটা ইনিফউশন চার ভাগ করে খাওয়া---কলকাতার অলিগলি সব যেন দশ হাত বাড়িয়ে ডাকতে থাকে।

আসলে ইনটারভিউ দিয়ে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছি ঠিক সেই সময় এই গ্রামের ইস্কুলের চাকরিটা হয়ে গেল ট্যালেন্টের জোরে নয় অবশ্য। মায়ের খুদকুড়ো যে দু-এক কুচি সোনা পড়েছিল মা বলল তা নাকি এতদিনে কাজে লাগল। তাতেও সবটা হল না। অগত্যা দাদার প্রভিডেন্ট ফান্ড। এখন ইস্কুলের চাকরির বাজার ভাল। ঢুকলেই চারের কাছাকাছি। তাই বউদি খুব একটা ট্যা-ফোঁ করল না। তবে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই মনমরা হয়ে পড়ছিলাম। আসলে জন্ম - কর্ম কলকাতার। গ্রাম - ফ্রাম নিয়ে কোনও সেন্টিমেন্ট কখন তৈরি হয়নি। যাওয়াও হয়নি সেভাবে। কলকাতা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে যে একরম গন্ডগ্রাম থাকতে পারে তা এখানে না আসলে জানতে পারতাম না। বনশ্রী বোঝাল--- ছেড়ে দিতে কতক্ষণ?' অবশ্য দুজনেই জানতাম এই কথায় বিশ্বাসের তেমন জোর নেই। তবু সেই মুহূর্তে ওই কথাটাকে আঁকড়ে থাকতে ভাল লেগেছিল।

ইন্টারভিউ-এর দিনই বোধ হয় পছন্দ হয়ে গিয়েছিল আমাকে। তাই সেক্রেটারি সহিমুদ্দিনকে দিয়ে অপেক্ষা করতে বলে পাঠালেন। সহিমুদ্দিন ওই স্কুলের চাপরাশি। ইন্টারভিউ পর্ব মিটলে আমাকে ডেকে ইস্কুল ডেভেলপমেন্টর জন্য সামান্য পঁচিশ হাজার....? ঠিক তখনই জিজ্ঞাসা করলাম 'চারকি হলে থাকব কোথায়?' মুশকিল আসান করল সহিমুদ্দিন নিজে। হৈ হৈ করে বলে উঠল--- 'এই গাঁয়ে তো পাকাবাড়ি, আলো, পাখা পাবেন না স্যার। আমার একটা কামরা ফাঁকা পড়ে আছে সেখানে থাকবেন। থাকার জন্য কিছু দিতে হবে না। আমার ছেলেমেয়েগুলোকে একটু লেখাপড়া দেখিয়ে দেবেন আর খাওয়া-দাওয়া বাবদ আপনার যা বিবেচনা। এতএব সেই বিবেচনাতেই আজ বছরখানেক হয়ে এল। প্রথম মাসে একবার বাড়ি যেতাম। এখন আস্তে আস্তে কমছে। না, গ্রামকে ভালবেসে না। চাকরিটা পাওয়ার পর থেকে লাইফটা কেমন স্ট্যাটিক হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো দৌড়ঝাঁপ করতে ইচ্ছে করে না। মধ্যবিত্ত নিরাপত্তা!

বনশ্রী আগে সপ্তাহে একটা করে চিঠি দিত। এখন মাসে - দুমাসে। শেষ চিঠিতে লিখেছিল, দাদারা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একমাত্র বোনকে দূরে পাঠাবে না তাই কলকাতাতেই ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যাঙ্ক অফিসার....

সহিমুদ্দিনের ফ্যামিলির সঙ্গে মোটামুটি চলে যাচ্ছে। বাচ্চাগুলোও বেশ মজাদার। মুরগির ছানার মতো সারাদিন উঠোনময় ছুটে বেড়াচ্ছে। সন্ধের দিকে সবকটা যখন পুকুর পাড় থেকে 'আয় আয় চই চই' করে হাঁস তাড়িয়ে ফেরে বেশ লাগে দেখতে। বাচ্চাগুলোর বোধ হয় কখনই খেয়ে পেট ভরে না। তাই, কাউকে খেতে দেখলেই সবগুলো চোখ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এই এক ঝামেলা। আর খাওয়া - দাওয়াও তেমনি। সহিমুদ্দিনের উঠোনের শাক- পাতা, লাউ, কুমড়ো এসব দিয়ে চলে যায়। সপ্তাহে একদিন মাছ হলতো অনেক। তাও ছুটির দিন সহিমুদ্দিন সকাল থেকে ছিপ ফেলে যে কখানা কুচো - কাচা পায়। বুঝতে পারি আমার খাওয়া খরচ নিয়ে সহিমুদ্দিনের বউকে সংসারের অনেক কুটো সামাল দিতে হয়। এতদিনে অবশ্য সহিমুদ্দিনের বউয়ের সঙ্গে সরাসরি কথা-টথা হয়নি। তবে বিদ্যুৎ চমকানির মতো মাঝে মাঝে আধ হাত ঘোমটার আড়াল ভেদ করে তার শরীরের কোনও কোনও অংশ দেখতে

পাই। পরিবেশনের সময়ও কনুই থেকে বাকি হাত। আর সহিমুদ্দিন বা খুদির মাধ্যমে কথাবার্তা। মাঝে মাঝে চাপা গলায় ধমক - ধ ামক শুনতে পাই অবশ্য। ইস্কুল থেকে ফিরে সরষের তেল দিয়ে এক বাটি মুড়ি বরাদ্দ আমার। তাই থেকে বাচচাগুলোকেও ছিটে ে ফাঁটা দেয় না কি আর! ভাগে কম পড়ে গেলে কোনও কোনওটা হাত - পা ছড়িয়ে কাঁদে, তখন চাপা গলায় ধমক অথবা দু-একটা ি কল চড়।

কদিন ধরে সহিমুদ্দিনকে খুব খুশি খুশি দেখছি। উঠোনের এক কোণে কাঠকুটো বেড়া টেড়া দিয়ে নিচেই বাছুরের থাকার জায়গা ব ানিয়েছে। রোজ রাত্তিরে খাওয়া - দাওয়ার পর আবার ঘরে এসে একটু গল্পগাছা করে। সেসব নানা বিষয়। ইস্কুলের ভেতরের দল াদলি থেকে আরম্ভ করে পঞ্চায়েত অফিসের দুর্নীতি, ইলেকশনের হাওয়া, বাজার - দর ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ। সেদিন আবার দুঃখ করেছিল, বাচচাদের গায়ে লেপ - কাঁথা নেই। শীতে সব কষ্টপাচ্ছে। আসছে শীতে বানাতে হবে। তবে এখন কদিন সব কথার ফাঁে ক ফাঁকেই বাছুর কেনার ব্যাপারটা চলে আসছিল।

সহিমুদ্দিনের সংসারেও দেখছি আজ বেশ খুশি খুশি ভাব। বাচচাগুলো ঘুরছে - ফিরছে। আজ কেউ নিজেদের মধ্যে মারামারি কর ছে না। খিদে পেয়েছে বলে মার পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করছে না। বড় দুটো আবার বাছুরের কিনাম রাখা হবে তার ফিরিস্তি বানাচে ছ। মাঝে মাঝে আমার মতামত নিয়ে যাচ্ছে। আজ যেন ওদের মায়েরও হাঁটা চলার বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। এমনকি খোলা গ লায় ছেলে- মেয়েদের ডেকেও উঠছে মাঝে মাঝে। জানিনা, আমারও ভুল হতে পারে। রোজ তো এই সময়টা থাকি না। ইস্কুল চলে যাই। তবে আজ আবার সহিমুদ্দিনের নতুন হওয়া মাসখানেকের বাচচাটা খুব জ্বালাচ্ছে । অন্যদিন যতক্ষণ থাকি সাড়াশব্দ পাই ন া। আজ থেকে থেকেই কঁকিয়ে কেঁদে উঠছে। যত বেলা বাড়ছে আকাশও তত মুখ কালো করছে। এই দিনে চান - টান ইমপসিবল। শুধু শুয়ে আলসেমি করতে ইচ্ছে করছে। সুটকেশ খুলে জমিয়ে রাখা বনশ্রীর চিঠিগুলো নাড়াচাড়া করছি। ওর লেখায় একটা দা রুণ মজা আছে। ডেইলি নিউজ পেপারের মতো। এক বছরের কাগজ স্টাডি করলে যেমন একই ধর্ষণ, একই রাজনীতি,একই খুন-জখম ঘুরে ফিরে আসে, ওর চিঠিও তেমনি। প্রতিটা চিঠিরই ভাষা, বিষয়বস্তু, স্টাইল প্রায় এক। দেখে দেখে টুকে দেয় কি-না কে জা নে। মা -ও মাঝে মাঝে পোস্টকার্ড পাঠায়। বেশিরভাগই শরীরের কথা। চোখটা দিন দিন কমজোরি হয়ে যাচ্ছে সেই আশঙ্কা। তাছা ড়া, বৌদির সঙ্গে খুঁটিনাটি...।

সহিমুদ্দিনের নতুন বাচচাটা এখন আরও জোরে কাঁদছে। একই ঘরে মাঝখানে বেড়া দিয়ে পার্টিশন করা। সহিমুদ্দিনের বউ খুব চে ষ্টা করছে ঠাণ্ডা করার। সম্ভবত বাচচাটা বুকের দুধও মুখে নিচ্ছে না। ঘর থেকে বারান্দায় এলাম। বাচচাগুলো গোয়াল ঘরে আশে - পাশে খেলা করছে। একটাকে ডাকলাম। বড় ছেলেটা এল। বললাম--- 'তোদের ভাইটা আজকে এত কাঁদছে কেন রে?' ওর গাে য় সহিমুদ্দিনের একটা ছেঁড়া লুঙ্গি। গলায় কাছে গিঁট পাকানো । আজ সত্যিই জববর ঠাণ্ডা। বলল, 'জ্বর হয়েছে।' খুদি এসে বলল --- 'রান্না হয়ে গেছে। চান করতে যাও। বললাম --- আজ চান করব না। খেতে দিতে বল। রান্নাঘরেই খাওয়ার ব্যবস্থা। পিঁড়ি পেে ত জল দিয়ে খুদি ডাকল। জিজ্ঞেস করলাম--- তোরা কখন খাবি? খুদি সারা শরীরে হাসি ছড়িএয় বলল --- আববা আসলে।

সহিমুদ্দিনের বউ খেতে দিতে এসেছে। বাচচাটা এখন আরও জোরে কাঁদছে। আজ খিচুড়ি রান্না হয়েছে। গরম গরম ধোঁয়া - ওঠা খিচুড়ি আর পেঁয়াজের বড়া। খেতে খেতে বুঝলাম, বেশ খিদে পেয়েছিল। সহিমুদ্দিনের বউ জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে বসে আছে । আজ সহিমুদ্দিন নেই। তাই মাঝখানে খুদি। বললাম--- বাচচাটার খুব জ্বর?এই প্রথম সরাসরি। সহিমুদ্দিনের বউ ঘাড় নাড়ল। ব ললাম --- আমার আর কিছু লাগবে না। আপনি বাচচাটার কাছে যান।

খাওয়া - দাওয়া সেরে আবার কম্বল মুড়ি দিলাম। এখন দু-এক ফোঁটা করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বাচচাটারকান্না আরও বেড়েছে। চারপাশে ব্যাঙ ডাকছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম যখন ভাঙল তখন চারপাশ অন্ধকার। কম্বল জড়িয়েই বাইরে এলাম। একপাশে অন্ধকারের মধ্যে জড়াজড়ি করে বাচচাগুলো কলরকলর করছে। আমার গলার আওয়াজ পেয়ে খুদি একটা কালি - পড়া লম্ফ এনে ঘরে রাখল। গোয়াল ঘরটা ফাঁকা। তার মানে সহিমুদ্দিন ফেরেনি। মাঝে মাঝে ছোট বাচচাটার তীব্র কান্না...।

একটু পরে খুদি আবার এল--চাচা, তেল বাড়ন্ত। তোমার লম্ফটা দেবে? বিরক্ত সুরে বললাম--- এই তো সেদিন কেরোসিন আনার জন্য পয়সা নিলি। এর মধ্যে শেষ। সন্ধেবেলা অন্ধকার ঘরে ভূতের মতো বসে থাকব? খুদিমুখ নিচু করে চলে গেল। বিছানায় খুে ল রাখা জীবনানন্দের কাব্যসমগ্র। পড়তে চেষ্টা করলাম। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। মন বসছে না। বাইরে এখন ঠাণ্ডা হাওয়া, ঝমঝ ম বৃষ্টি আর বাচচাটার কান্না। একটু পরে দরজার পাশে একটা ছায়া শরীর নড়ে চড়ে উঠল। অর্ধ হাত ঘোমটা। সহিমুদ্দিনের বউ। এরম কখনো আসেনি আগে। বললাম---

----কি হল?

----বাচচাটা শীতে কাঁদছে। লম্ফটা দিলে গরম সেঁক দিতাম।

সহিমুদ্দিনদের লেপ - কম্বল নেই। কিছু ছেঁড়া - ছেঁড়া কাঁথাকানি।। সেদিনই সহিমুদ্দিন বলছিল, 'আসছে শীতে...।'

সন্ধে প্রায় সাতটা বাজল। এখনও সহিমুদ্দিন ফিরছে না। বেশ ক'মাইল দূরের গ্রামে হাট। তা হলেও দুপুর দুপুর চলে আসার কথা । বাছুর কেনা নিয়ে কোন বিপদ হল কি না। এইসব হাঁচোর - পাঁচোর ভাবতে ভাবতেই...

দূর থেকে সহিমুদ্দিনের গলায় হাঁক শুনতে পেলাম। বাচচাগুলো শীত আর বর্ষাকে উপেক্ষা করেই উঠোনে নেমে পড়ল। আমি দাও

য়ায় এলাম।

আপাদমস্তক ভিজে নেয়ে এসেছে সহিমুদ্দিন। সঙ্গে লালচে রঙের বাছুর। ওর গায়ের জামাটা বাছুরটার গায়ে জড়ানো। বৃষ্টি আর শীত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা। সহিমুদ্দিনের বউও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাচ্চাগুলো কোলাহল করছে। বাছুরটার গায়ে - মাথায় হাত বুলোচ্ছে। সহিমুদ্দিন আমার দিকে তাকাল--- 'পার্বতীপুরের দিকে এক হাঁটু জল জমে গেছে। ঠাণ্ডাও পড়েছে আজ!' আমি একটু হাসলাম। বললাম ---'তাড়াতাড়ি গা- মাথা মোছ। জ্বর - টর হয়ে যাবে।' সহিমুদ্দিন গা কাঁপিয়ে হাসল--- 'আমাদের ওসব অভ্যাস আছে।' ঘর থেকে লম্ফটা বাইরে এনেছে সহিমুদ্দিনের বউ। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে।

লম্ফের কাঁপা - কাঁপা আলোয় গোয়ালঘরে সহিমুদ্দিনের ছায়াটা নড়াচড়া করতে দেখলাম। বাছুরটা কাঁদছে। ঠাণ্ডায়, না মাকে না পেয়ে কে জানে। সহিমুদ্দিনের বাচ্চাটাও কাঁদছে পাল্লা দিয়ে। ঘরে চলে এলাম। বাছুরের থাকার ব্যবস্থা ঠিক-ঠাক করে জামাকাপড় ছেড়ে সহিমুদ্দিন ঠিক আসবে একবার। একটা সিগারেট ধরালাম। এই ঠাণ্ডায় শরীরটা গরম থাকে। সহিমুদ্দিনও এল। বললাম--- 'এসো, বলো।' ও ঘরে ঢুকল। বসল না। কি একটু ভাবল। তারপর এক ঝোঁকে বলে ফেলল--- 'আপনার তো আরও একটা চাদর আছে। কম্বলটা দিন না!' খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আগুন-জ্বর গায়ে বাচ্চাটা ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারছে না। সকাল থেকে কাঁদছে। কিন্তু এ কথাটা মাথায় আসেনি। সারাদিন বউ নিজে বলতে পারেনি বলে এখন সহিমুদ্দিনকে দিয়ে বলাচ্ছে? মনে কোথায় একটু খচখচ করতে লাগল। লজ্জাবোধ! কি জানি? গা থেকে কম্বলটা খুলে দিলাম। বালিশের তলা থেকে গরম চাদরটা বার করে জড়িয়ে নিলাম। অন্ধকার ঘরে ঝুম হয়ে বসে আছি। উঠোনের দিক থেকে এখনও আলোর আভাস আসছে। সহিমুদ্দিন গোয়ালঘরে ঠিক করছে? বাছুরটা এখনও কাঁদছে অবশ্য। বাইরে বেরলাম। সহিমুদ্দিনের কাণ্ড দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমার কম্বলটা দিয়ে বাছুরটা আগাপাশতলা জড়িয়ে লম্ফ নিয়ে সহিমুদ্দিন বারান্দায় উঠে আসছে।

আমাকে দেখে দাঁত বের করে হাসল। অসহ্য! রাগে আমার সারা শরীর জ্বলছে। ঘর থেকে এখনও বাচ্চাটার কান্নার আওয়াজ আসছে। বললাম--- 'এর মানে?' আমার ধমকে সহিমুদ্দিন অপ্রস্তুত হল না। একটু চুপ করে থেকে যেন ভেতরে ভেতরে প্রতিরোধ তৈরি করে নিল। বলল---'বাছুরটা ঠাণ্ডায় মরে যাবে স্যার।' ওর নৃশংসতা দেখে আমি ক্ষেপে উঠলাম। হিংস্র কণ্ঠে বললাম--- 'আর বাচ্চাটা?' মাথা নিচু করে ফেলল সহিমুদ্দিন। বলল ---'তিরিশ বছর ধরে আজকের দিনটার স্বপ্ন দেখছি স্যার। কত কষ্টে তিলে তিলে পয়সাকটা জমিয়েছি।' হাতের লম্ফটা এবার এপরে তল। আমার দিকে সোজাসুজি তাকাল। খুব পরিষ্কার করে বলল--- 'একটা বাচ্চা গেলে আরও একটা বাচ্চা পয়দা করতে পারব। বাছুরটা গেলে জিন্দেগীতে আর বাছুর কিনতে পারব স্যার?'

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। লম্ফের কাঁপা - কাঁপা আলোয় সহিমুদ্দিনের মুখ দেখলাম। আশ্চর্য, এই আবছা আলো - আঁধারিতে সহিমুদ্দিনের মুখটা ঠিক ভারতবর্ষের ম্যাপের মতো লাগছে! ওইরকম তিন কোণা। তবে কি, সহিমুদ্দিনের গলায় ভারতবর্ষ কথা বলে উঠল? না-কি ভারতবর্ষের গলায় সহিমুদ্দিন?

আশ্রয়

দিলীপ পাত্র

আদরী ধরেই রেখেছিল ওর ছেলেটা বেশী দিন বাঁচবে না। আঁতুড়েই ধরেছিল তাকে অসুখে। না চিকিৎসা না পথ্য। জন্ম থেকেই ত াই ছেলেটা অনেকদিন পর্য্যন্ত মায়ের বুকের দুধ পায়নি। তারপর ঐ তো বাপ! দিন রাত মদ গাঁজা আর ঘিঁচি - কড়ির জুয়ায় ডুবে আছে। আদরী আর তার ছেলের জন্য ওর সময় কোথায়! মলিন্দরের যে চালচূলো নেই তা নয়। চাল আছে --- ছাউনীতে খড় না ই। চূলো আছে --- জ্বলে না প্রায়ই, হাঁড়ি চড়ে না রোজ। এই তো আদরীর সংসার। মলিন্দর দু'চারটা দিনরাত কাবার করে কখনে া যদি ঘরে ফেরে তো সে ছেলে- বৌয়ের মুখের দিকেও তাকায় না। সে তাকায় আদরীর আঁচলের খুঁটে দু'চারটে টাকা যদি বাঁধা থ াকে। নিদেন হাঁড়িতে সঞ্চয় দু'একসের চাল। যা পাওয়া যায়। ঐটুকুন বাচ্চা নিয়ে দিন মজুরী। সে যে কী কষ্ট আদরীই জানে। আর জানে পাড়া- প্রতিবেশী।

তবু এইভাবে চলছিল আদরীর দিনের শুরু রাতের শেষ। একদিন, মনসাপূজার আগের দিন, আবগারী পুলিশের ভয়ে কোত্থেকে তি ন হাঁড়ি চোলাই মদ এনে লুকিয়ে রেখেছিল চাটাই ঢাকা দিয়ে। দিনভর রোদে পুড়ে ধান রূয়ে খিদে তেষ্টায় প্রাণ ওষ্ঠাগত আদরী ঘ র ফেরে পড়ন্ত বেলায়। রুগণ-দুর্বল বাচ্চাটাকে শোয়াবে বলে চাটাই খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল মদের হাঁড়ি। যে মদ তার সংসারের এ ই হাল করেছে সেই মদের হাঁড়ি তার ঘরে দেখতে পেয়ে রেগে আগুন। একে একে হাঁড়িগুলো বের করে ফেলে দিল উঠোনের ভে রেণ্ডাগাছের বেড়া টপকে।

ভোর রাতে মলিন্দর লাল চোখে টলতে টলতে ঘরে ফিরল। ঘরের টানে না, মদের টানে। সব দেখেশুনে মলিন্দর যেন জখমি বাঘ। আদরীর বাচ্চাটাকে চাটাইশুদ্ধ তুলে ছুঁড়ে ফেলে উঠোনের জলে কাদায়। বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আদরী। শেষ রক্ষা হয়নি । যখন তার জ্ঞান ফিরে এল বুঝল দাওয়ার খুঁটিতে লেগে তার কপাল ফেটেছে। রক্ত গড়িয়ে চাপ বেঁধেছে মাটিতে। প্রতিবেশিনীর কোলে বাচ্চাটা তখনো কঁকিয়ে কাঁদছে। ধীরে ধীরে উঠে বসে কপালের চাপ বাঁধা রক্ত মুছে নেয় হাতে। হাতের চেটো কালচে লা ল। আর কখন পূব আকাশে টকটকে লালের স্পষ্ট ইশারা।

কিছুই ভাবে না সে । যেন পূর্ব নির্ধারিত , অবধারিত। ধীরে ধীরে উঠে ঘরে ঢুকল দুর্বল পায়ে। বেরিয়ে এল একটা পুঁটলী হাতে। ে কালে তুলে নিল বাচ্চাটাকে। ক্ষীণ গলায় বলল--- 'সনকা, বাপের ঘরকে যাচ্ছি।' উঠোন পেরিয়ে খেজুর পাতায় বাঁধা দুয়ারের আগড়টা টেনে দ্যায়। দুয়ারে হাত দিয়ে থাকে একটুক্ষণ। তারপর শুরু হোল তার পথ - চলা । তখন আদবীর ঘর - উঠোনে চারা ধানের ক্ষেতে-কাঁপানো হু-হু হাওয়ার সংসার।

আদরী যখন তার বাপের ঘরের পাড়ার সীমানায় তখন থেকেই তার কান্না শুরু হ'য়ে গেছে। মরা মা আর আধমরা বাপকে ডেকে ে ডকে পাড়াশুদ্ধ মানুষকে জনান দিল ---সে ফিরেছে। কান্নার সুরে ও নির্ভুল ছন্দে টেনে টেনে ফেরার কারণও জানিয়ে দিল পাড়াশু দ্ধ সবাইকে। ভমরার উঠোনে যখন সে পা দিল তখন 'জল - খাই' বেলা। ভমরা তখন হাঁড়ির মদ্যে রাখা আকামা কালো খরিশটাে ক জ্যান্ত চ্যাংমাছ খাওয়াতে ব্যস্ত। আদরীকে দেখেই সে যেনচমকে উঠল। না, তার বিধস্ত রগ্ন রক্তাক্ত চেহারা দেখে নয় -- আদরীে ক সে খাওয়াবে কী এই ভেবে! স্পষ্ট বিরক্তি তার গলায় --'আর মরার জায়গা পালি নাই। খাবি কি?' তবু মেয়ের বাপ! হাড় জির জিরে শুকনো বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা চিনচিনে ব্যথা। দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়ে বলল, 'আলি যখন, থাক্।' সেই থেকেই থেকে যা ওয়া। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অভাব এদের নিত্যসঙ্গী। দক্ষিণ রাঢ়ের কাঁকুড়ে মাটির মতই এদের জীবন। তবু সে মাটিতেও সময়ে সবুজ জাগে, ফুল ফোটে, ফলও হয়। আদরীর ছেলেটা দিনে দিনে প্রায় সাত মাসের। যেন পাথরকুচির পাতা রুক্ষ নির্মম কাঁকুরে মাটির উপর। শুকায় না। সময়ে সে পাতা থেকে নতুন চারা বের হয় ঘন সবুজ পাতার বিজয়পতাকা উড়িয়ে। ছেলেটার গায়ে মাংস জমে, হামা ট ানে। হামা টানতে টানতে একদিন ঘরের কোনে রাখা সাপের হুড়পি ধরে টানে। আলগা দড়ির বাঁধন খুলে বেরিয়ে পড়ে আকমা খি

রশ। ঘরময় ছড়িয়ে যায় নানা আকরের কড়ি, তামার পয়সা, রংবেরঙের তাবিজ মাদুলী আর জড়ি - বুটি। হাতে বাড়িয়ে খেলার সঙ্গী ভেবে সাপটাকে ধরতে যায় ছেলেটা। তারপর যাহবার.....। ছেলের কান্না, ভমরার চিল - চিৎকার আদরীর কানে পৌঁছায়। পুকুরঘাটে বাসন ফেলেই ছুটে আসেসে। প্রতিবেশীরাও একে - দুয়ে এক উঠোন। আদরী বুক চাপড়ে বলে--- 'হেই বাপ, হেই গুণীণ, বাঁচা তোর লাতিটাকে'। আমার ছা'টাকে বাঁচা বাপ্।'

ভমরার ঝাড়ফুঁক তুকতাক, অদ্ভুত শব্দের মন্ত্রোচ্চারণ, জড়িবুটির দ্রব্যগুণ সবে একে একে পরাস্ত হোল। জয়ী হোল মৃত্যু। ছেলের মৃত্যু চোখ মেলে দেখল আদরী। আর সন্ধ্যারাতের প্রথম চোখমেলার মত তারা।

আদরী নীরব, স্থির, যেন স্পন্দনহীনা। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে মরাছেলে কোলে রাত কাটায়। মরা মাছের চোখে চেয়ে থাকে মব. া ছেলের মুখের পানে।

ভোর হতেই কোল খালি আদরীর। হাহাকার কান্নায় ছেঁড়া লতার মত লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তখন তার ঘর - উঠোনে হাহাকারের হাওয়া যেন পৌষ শেষের ফসলহারা ক্ষেতে।

ভমরা যখন কালীদ'র 'গাবা' থেকে কোদাল হাতে ফিরল আদরী তখনো দাওয়ায শুয়ে। সঙ্গী এক প্রতিবেশিনী মংলী। বাপ ঘরে ফিরতেই চোখ তুলে তাকাল আদরী। দেখল -- ভমরার সমস্ত শরীরে পরাজয়ের গ্লানি। যেনমূক-বধির একটা অবোধ প্রাণী।

বেলা বাড়ে। দিন যায় রাত নামে। একের পর এক রাত কাটে দিন কাটে। দৈনন্দিন জীবনধারার সাময়িক বিচ্যুতির পর ধীরে ধীরে আবার যেন স্বাভাবিক হয় আদরী। কিন্তু কিছু ছন্দহীন, বেশ যেন প্রাণহীন তার দিনরাতেরপাঁচালী।

ঋতুচক্রের স্বাভাবিক পরিবর্তনে এক সময় বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে ওঠে গাজনের গান। সাঁসাঁ হাওয়ার তৃষ্ণার্তজিভ চেটে নেয় মাটিব. সবটুকু রস, গাছের পাতায় সবুজ, মাঠের ঘাস.....সব কিছু। খাল বিল ডোবা শুকিয়ে মাটিফেটে চৌচির। দুপুর রোদে কাঁপে ধূ ধূ মাঠের বিস্তীর্ণ প্রান্তর। নিষ্করুণ নটরাজের নৃত্যে মাতে চৈতালী ঘুণী। হাহাকার আকাশের বাতাসে মাটিতে। শুধু ক্ষুধা, শুধু - তৃষ ণা, শুধু ক্লান্তি সর্বব্যাপী হয়। তেমন দিনের একটা বিকেলে প্রচণ্ডঝড় বৃষ্টি করকাপাত। চারিদিক লণ্ডভণ্ড করে যখন ঝড় বৃষ্টি আসল তখন শান্তি! এবং সন্ধ্যা।

অল্প রাতেই দাওয়ার হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল আদরী। রান্না ঘরের চালের নীচে ভমরার নাকডাকা যখন গভীর হ'য়েছে ঠিক তখন আগড়ের ওপারে আকুলিবিকুলি ডাক। 'গুনীন হে, আগুড় খুল। আমরা শিমুলডিহার লোক। তুয়ার জামাইকে কাল - এ খাঁইচে।' ধড়মড় করে উঠে বসে আদরী। কূপী জ্বালায়। দু'জন লোক এসে উঠোনে বসে। ভমরাকে বলে--- জল - ঝড়ে বাদে সাঁঝের বেলায়। তুয়ার জামাই যাচ্ছিল কুথা। শ্মশানগাবার ইটপাজায় ছিলবেনাচিতি। ঠাণ্ডা হাওয়া খাত্যে বেরাইছিল । পায়ে কামড়াই দিয়েছে। এখন মুখে ফেন ভাঙ্গছ্যে বোধহয়। চল চল ঝটা কর্যে।'

গুণীনের কাজ --- ডাক এলে যেতেই হবে। জড়িবুটির হুড়পি বগলদাবা করে লোকগুলোর সঙ্গে বেড়িয়ে পড়ল ভমরা। জামাইয়ের শরীর থেকে কাল - সাপের বিষ নামাতে হবে যে!

কাপড়ের আঁচলটা কোমরে কে'যে বেঁধে সন্তর্পণে কিছুটা দূরত্ব রেখে ভমরার পিছু নিল আদরীও। ঘন্টা তিনেকের পথ। তার নিজের ঘরের উঠোনে পা দিতেই ভমরার চোখে পড়ল আদরীকে। সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে।সামনে ছেঁড়া দড়ির খাটিয়ায় মলিন্দর। মুখে গাঁজলা। লম্পের অল্প আলো অনেক ধোঁয়ায় উঠোনে অলৌকিক পরিবেশ। ভমরা বলে, 'তুই! কিস্‌কে আলি। ই তুর আর কে বটে!' আদরীর স্পষ্ট জবার ----'আমার মরদ। আমি উয়াকেডাক্তারবাবুর কাছে লিয়ে যাব। তু ঝাড়িস্ না।' উপস্থিত সবাই রে রে করে উঠে। --- 'বলছিস কী! তুর বাপের অপ্‌মান, আমাদের গুণীনের অপ্‌মান! আমরা সহ্য করব নাই। গুণীন ঝাড়বেক।'

'না। কীসের গুণীন উ, কেমন গুণীন! যে লিজের লাতিকে বাঁচাত্যে লার‍্যেছে সে জামাইকে বাঁচাবেক? সবমিছা। উসব ঝাড়ফুঁক সব মিছা। আমার মরদকে তুমরা ছুঁয়ো না।' উপস্থিত ছোকরা ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলল--- 'তুমরা একটা ঠেলা - রিকসা আন্যে দাও।'

আদরীর গলায় অনুরোধ নয় যেন আদেশ। একে তো সম্পূর্ণ নতুণ এক প্রস্তাব, তায় আদরী যুবতী। ছোকরাগুলো অতি উৎসাহে একটা ঠ্যালা রিকসা এনে হাজির করল অল্পক্ষণে। আদরী আর ক'টা ছোকরা মলিন্দিরের ঠেলা - রিকশা ঠেলে নিয়ে চলল গ্রামীন স্বাস্থকেন্দ্রে উদ্দেশ্যে।

পঞ্চায়েতের নতুন ফেলা মোরাম রাস্তার শরশর শব্দের সংগে তখন ভোরের পাখির কিচিরমিচির মিলে মিশে একাকার। একটু পরেই পূবের আকাশ সিদুঁর ছড়াবে।

মহারানির উর্দি ও তিসিখালির কুতুবুদ্দি

জাকির তালুকদার

।। এক ।।

খাকি জামা সপ্তাহে একদিনই গায়ে চড়ায় কুতুবুদ্দি। হাটবারে। সেটাও সারা বছর নয়। বছরে পাঁচ মাস। আষাঢ় থেকে কার্তিক। কারণ এই পাঁচমাসই বিলে পানি থাকে। কুতুবুদ্দির কিছু আয় উপার্জন হয়। বাকি সাত মাস বিল শুকনো ঠনঠনে। কুতুবুদ্দিরও তখন পেট টনটন, মাথা খাঁ খাঁ। বিল অঞ্চলের মানুষের তখন অনেক কাজ। দুইবার ইরি ধানের চাষ সেরে ফেলতে হয়। কুতুবুদ্দির ওসব ঝামেলাই নেই। কারণ তার জমি নাই। তাছাড়া অন্যের খেতে মজুরি করার বয়স তার নাই। ইচ্ছাও কোনোকালে ছিল না। তাহলে সেই শুকনো সাতমাস কুতুবুদ্দি করে কী? পাখি ধরে বিক্রি করে। বনমালির তাড়িভাটিতে কাজ করে। দিনগুলো খুব কষ্টে কষ্টে কাটে।

কিন্তু এখন আশ্বিন মাস। বিলে ফণা তোলা পানির ঢেউ। অতএব কুতুবুদ্দির চিন্তা নেই। তার ওপর আজ হাটবার। কুতুবুদ্দির গায়ে আজ খাকি জামা। ডিনে কাজ, রাটে ফুর্টি। শিখিয়েছিল লেপ্টান টমসন সাহেব। কুতুবুদ্দি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে সেকথা। পুরো ইউনিয়নে কুতুবুদ্দি সবচেয়ে বয়স্ক মানুষ। একসময়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট টমসনের বাবুর্চি কম আর্দালি ছিল সে।সেই সময় যেখানে ইংরেজ আর সেখানে টমসন সাহেব। ফলে সেখানে কুতুবুদ্দিও। এইভাবে অনেক জায়গা ঘোরা হয়ে গেছে তার। সেইসব জায়গা এখন অন্য অন্য দেশ। অন্য দেশ মানেই হল বিলাত। অর্থাৎ এই ইউনিয়নের প্রথম বিলাতফেরতও হচ্ছে কুতুবুদ্দি। পল্টন থেকে ফিরে আসার পরে পুরো বিল অঞ্চলে তার সম্মান ছিল চৌধুরীদের পরেই। এখন আর সেই সম্মান নেই। সম্মান দেখাবেই বা কে? যারা তার গোরাবাহিনীতে ঢোকার কথা জানত, তারা কেউই আর বেঁচে নেই। তার সমসাময়িকরা তো নেই, ঢের কমবয়সি অনেকেই টেঁসে গেছে। কিন্তু কুতুবুদ্দির লেফট - রাইট ড্রিল করা লোহাপেটা শরীর। আর ছিল পল্টনের খাঁটি দুধ-ঘি। এখনও আজরাইল তার সাথে শক্তি পরীক্ষা করতে আসেনি। এই বয়সেও সে কারও ঘাড়ে বোঝা হয়ে চেপে বসেনি। অবশ্য চাপার মতো কোনো কাঁধও তারনেই। তিন কুল তার রক্ত সম্পর্কের কেউ আছে বলে সে জানে না। নিজের ভাত সে নিজেই জোগাড় করে। বছরের এই সময় তার কোনো চিন্তা নাই।তার নিজের একটা নৌকা আছে। কেরায়া খাটলে পয়সার অভাব নাই।

ইদানীং অবশ্য স্যালো ফিট করা নৌকার চল হয়েছে। বড়ো বড়ো সাইজের নৌকা। পেছন দিকে স্যালো বসানো। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে চাপ দিলেই ফট - ফট - ফট। সাঁ সাঁ করে পানি কেটে ছোটে নৌকা। মাঝির কাজ বলতে শুধু হাল ধরে দিক ঠিক রাখা। এখনএই ফটফটানিতে জয়-জয়কার। কারণ দাঁড়টানা কিংবা গুনটানা নৌকার চেয়ে অনেক জোরে ছোটে স্যালোর নৌকা। দুই-পাঁচ মাইল যেতে আগে যেখানে পাঁচ-ছয় ঘন্টা লেগে যেত, স্যালোর নৌকাতে লাগে আধঘন্টা - চল্লিশ মিনিট। লোকে ওগুলোতেই বেশি ওঠে। কিন্তু নিজের নৌকাতে স্যালো ফিট করেনি কুতুবুদ্দি। কেউ একথা বললে সে-ই উলটো নাক সিটকায়। আরে ইঞ্জিনে নাও ঠ্যালে, তুমি খালি হাল ধরে বসে থাকো--- এড্যা তো মাগি মাইনষের কাম। মরদ হও তো মারো বৈঠা। আমি মরদ। বৈঠা মারি।

কুতুবুদ্দি যাই বলুক, লোকে এখন সহজে স্যালো ছেড়ে দাঁড়টানা নৌকায় উঠতে চায় না। গাঁয়ের লোকও সময়ের মূল্য বুঝতে শিখেছে।

সারি সারি কেরায়া নৌকা ঘাটে বাঁধা। কুতুবুদ্দিরটাও। লোকে টপাটপ উঠে যাচ্ছে স্যালো নৌকায়। কেউ তেমন একটা গা করছে না দাঁড়টানা নৌকার দিকে। দশ - পনেরো মিনিটের মধ্যেই একটা করে নৌকা ভরে যাচ্ছে যাত্রীতে। তারা স্টার্ট দিয়ে ভটভটিয়ে চলে যাচ্ছে ঘাট ছেড়ে। কুতুবুদ্দি ডোন্ট কেয়ার ভাব করে নিজের নৌকায় বসে আছে। বিড়ি ফুঁকছে একটার পর একটা। কিন্তু তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যখন ফরমান সরকারকে স্যালোর নৌকায় উঠতে দেখল। ফরমান সরকার তার পারমানেন্ট যাত্রীদের মধ্যে একজন। আজ সে-ও! তার দিকে তাকিয়ে একটু সান্ত্বনার হাসি হাসল সরকার -- আমার আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরা দরকার বাবাজি।

কুতুবুদ্দি মাথা ঝাঁকাল নিরর্থকভাবে। তারপরে পকেটের সর্বশেষ বিড়িটা ধরাল। ঠিক করল এটা শেষ করে সে যাত্রী ধরারজন্য এ কটু তৎপর হবে। হাঁকডাক করবে। বিড়ি হাতে সে নৌকা ছেড়ে পাড়ে উঠে এল। তখনই তার চোখে পড়ল চায়ের দোকানের বেঞ্চি ছেড়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে দুইজন পুরুষ, একজন মহিলা। এদের সে চেনে। বিল অঞ্চলে এনজিও-র সাহেব আর ম্যাডাম। এরা বেশ পয়সা খরচ করে। কেরায়া নৌকা না নিয়ে পুরো নৌকা রিজার্ভ করে সারাদিনের জন্য। বিভিন্ন গাঁয়ে ঘোরে। তাদের দি কে হাসি মুখে এগিয়ে গেল কুতুবুদ্দি -- আছেন ছার, আমার নায়ে আসেন।

তারাও কুতুবুদ্দিকে চেনে। একজন হেসে বলে --- তোমার দাঁড়টানা নৌকায় তো আমাদের চলবে না বাবা।

কুতুবুদ্দির মুখের হাসি দপ করে নিভে যায়। তার এই নিভে যাওয়া দৃষ্টি এড়ায় না ম্যাডামের। তার মুখে সহানুভূতির ছাপ ফুটে ও ঠে। ধীর গলায় বলে -- আজ তো আমাদের সার্ভে মাত্র দুটো গ্রাম। খুব একটা তাড়াহুড়ো নেই। তাছাড়া ইঞ্জিনের নৌকার শব্দে আ মার মাথা ধরে যায়। আজ না হয় আমরা চাচামিয়ার নৌকাতেই যাই।

মেয়েদের কথা খুব ঠেকায় না পড়লে পুরুষরা ফেরায় না। এক্ষেত্রেও তাই ঘটল। ওদের নিয়ে হাসিমুখে নৌকা ছাড়ল কুতুবুদ্দি।

:

আরোহীরা বেশ আয়েশ করে ছইয়ের নীচে বসেছে। গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। কিছুক্ষণ ওদের কথা শোনার চেষ্টা করল কুতুবুদ্দ। শুনল কিন্তু বুঝল না প্রায় কিছুই। ওদের সম্পর্কে তার কৌতূহল অনেকদিনের। আজ মওকা পেয়ে কিছুটা মেটানোর চেষ্টা করা যেতে পারে ভেবে সে গলা খাঁকারি দিল। জিজ্ঞেস করল -- ছার যদি বেয়াদপি না ন্যান, আপনেরা তো এনজু!

---এনজু!

ওরা হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকায়। অল্প পরে নিজেরাই অবশ্য বুঝতে পারে কুতুবুদ্দির আঞ্চলিক ভাষায় বলা কথাটা --- হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা এনজিও কর্মী।

--- তা ছার আপনেরা টাউনের মানুষ গাঁয়ে আইছেন। কিন্তু করেনডা কী? আপনেরা কি গরিব মাইনষেক বড়োলোক বানাবার আ ইছেন?

ওরা হো হো করে হেসে ফেলে তার কথা শুনে --- তাহলে তো আলাদ্দিনের চেরাগ লাগবে চাচামিয়া। অত ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা শুধু গ্রামের মানুষদের নিজেদের অধিকারের কথা মনে করিয়ে দিতে এসেছি।

--- ঠিক বুঝলাম না।

--- বুঝলেন না? যেমন ধরেন দেশে আইন বলে একটা জিনিস আছে তা জানেন?

--- তা জানি। আইন তো সবতাতেই আছে।

--- হ্যাঁ। সবকিছুরই আইন আছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ অনেক সময় আইনের কথা না জানা থাকায় ন্যায্য বিচার চাইতেও জানে ন া।

কুতুবুদ্দি গরুর চোখে তাকিয়ে থাকে। ম্যাডাম তখন তাকে বোঝাতে শুরু করে --- যেমন ধরেন কোনো স্বামী তার বউকে তিনবার তালাক বললেই তার তালাক হয়ে যায়।

--- হ্যাঁ, তা যায় ।

--- কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তা অবৈধ। শুধু মুখের কথায় তালাক হবে না। তারপরে ধরেন, তালাকের পরে বউটার কী হয়?

--- কী আর হয়! হয় অন্য কারও সাতে নিকা বসে, না হয় দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে।

--- হ্যাঁ তাই। কিন্তু আইন হচ্ছে, তালাকের পরেও স্বামী তার স্ত্রীকে খোরপোষের টাকা দিতে বাধ্য। তাদের যদি সন্তান থাকে, আর সেই সন্তান যদি মায়ের কাছে থাকে। তাহলে সেই সন্তানের খরচও পিতাকে বহন করতে হবে।

--- অ। বুঝলাম। তা আপনেরা টাউন থাক্যা গাঁয়ে এইসব শুনাতে আসেন ক্যান?

ওরা তিনজন এই প্রশ্নে আবার একচোট হাসে --- এটাই আমাদের চাকরি। এই কাজ করার জন্যই আমরা বেতন পাই।

---কে দ্যায় আপনাদের বেদন ? গরমেন?

--- না বাবা। গভর্নমেন্ট নয়। আমাদের বেতন দেয় বিদেশি লোকজন। বিদেশ মানে বোঝেন। মানে বিলাত।

এবার মনে মনে ঠোঁট বাঁকায় কুতুবুদ্দি। এরা এসেছে তাকে বিলাত বোঝাতে। বলতে গেলে তার পুরো যৌবন কেটেছে বিলাতের মানুষের সঙ্গে। ওই টমসন সাহেবের দেশের লোকেরাই তাহলে এনজিও-কে টাকা দেয়। তা ওরা দিতেই পারে। কুতুবুদ্দি দেখেছে গোরা সাহেবরা যেমন কথায় কথায় পাছায় লাথি মারতে পারত, চাবকাতে পারত, তেমনি ঝনাৎ করে পকেট থেকে রানিমার্কা চাঁ দির টাকা ছুঁড়ে দিত তাদের দিকে।

হঠাৎ একজন প্রশ্ন করে -- তা চাচা আপনাকে প্রায়ই দেখি খাকি জামা পরতে। আপনি কি চৌকিদার ছিলেন?

একেবারে প্রেস্টিজে ঘা লাগে কুতুবুদ্দির -- না। আমি আছিলাম মহারানির রয়েল আর্মিত।

ওরা তেমন একটা চমকিত হয় না। শুধু মেয়েটা বলে -- তাই নাকি?

তারপরেই ওরা ফের নিজেদের মধ্যে আলাপ শুরু করে।

তার পল্টন জীবনের স্মৃতিচাররণার সুযোগ না দেওয়াতে কুতুবুদ্দি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়। বাধ্য হয়েই তাকে ওদের কথা শুনে যেতে হয়। একজন বেশ উষ্মার সঙ্গে বলে -- ধুর! চাকরি করি বটে, কিন্তু এনজিও-র এসব ওপরপালিশ দেওয়া কাজ আমার পছন্দ হয় না।

--- ওপরপালিশ দেওয়া নয়তো কি বিপ্লব করবে এনজিও! সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো কি বিপ্লব করার জন্য আমাদের টাকা দিচ্ছে?

--- এইসব সাহায্যের নামে ওরা আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকছে। এক টাকা ডোনেশন দিয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এক কোটি টাকা। আর আমরা হচ্ছি শালা ওদের দালাল, পাতিদালাল, তস্য দালাল।

---জানেন, সার্ভে করতে গিয়ে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হয়ে যাই। এই বিশাল চলনবিলের বেশি ভাগ জমির মালিক মাত্র কয়েকজন। কারও কারও জমির পরিমাণ হাজার বিঘা। অথচ এখানে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যারা বছরে একবারই শুধু মাংস খাবার সুযোগ পায়। তা হচ্ছে কোরবানির ইদে। কী বৈষম্য!

একজন পকেট থেকে নোটবুক বের করে --- আমি বৈষম্যের কিছু তথ্য পেয়েছি। আন্তর্জাতিক তথ্য। পড়ে শোনাচ্ছি শুনুন। ১৯৬৫ সালে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের শতকরা ২.৩ ভাগ ছিল পৃথিবীর দরিদ্রতম বিশ ভাগ লোকের হাতে, তার ওপরে বিশ ভাগ লোকের হাতে ছিল সম্পদের ২.৯ ভাগ। তার ওপরের বিশ ভাগ লোকের হাতে ৪.২ ভাগ। তার ওপরের বিশ ভাগের হাতে ২১.২ ভাগ। আর সবেচেয়ে ধনী বিশ ভাগ লোকের দখলে ছিল পৃথিবীর মোট সম্পদের ৬.৯ ভাগ। পাঁচ বছর পরের অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের রিপোর্ট হচ্ছে --- দরিদ্রতম বিশ ভাগ মানুষের সম্পদ কমে দাঁড়াল ২.২ ভাগে, তার ওপরের বিশ ভাগের ২.৮ ভাগ, তার ওপরের বিশ ভাগের হাতে ৩.৯ ভাগ, তার ওপরের বিশ ভাগের হাতে ২১.৩ ভাগ এবং সবচেয়ে ধনীদের হাতে ৭০.৪ ভাগ।

---আর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, দরিদ্রতমদের ভাগ সম্পদ নেমে দাঁড়াল ২.৩ থেকে ১.৪, তার ওপরে ২.৯ থেকে ১.৮, তার ওপরে ৪.২ থেকে ২.১, তার ওপরে ২১.২ থেকে ১১.৩ এবং সহচেয়ে ধনী কুড়ি ভাগ লোকের সম্পত্তি ৬৯.৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৩.৪ ভাগ।

অনেক্ষণ বৈঠা এবং জলের শব্দ ছাড়া নৌকাতে কোনো শব্দ রইল না। তিনজনই নাথা নীচু করে ভাবছে সত্য কথাগুলি। পাশ দিয়ে একটা স্যালো নৌকা ভটভটিয়ে চলে গেল। সেটি সাইজে বেশ বড়োসড়ো। ফলে একটা ঢেউ উঠল। কুতুবুদ্দির নৌকা স্বাভাবিকের চেয়ে দুলল বেশি। স্যালোর শব্দ দূরে চলে যাবার পরে সর্বশেষ বক্তব্যটি পাঠ হল নোটবুক থেকে --- পৃথিবীর সহচেয়ে ধনী কুড়ি ভাগ লোক মানে আসলে কিন্তু কুড়ি ভাগ নয়। সম্পদের সিংহভাগ অধিকারী মাত্র তিনশো ছাপান্নটি পরিবার। বাকিরা এদের পোষ্য, স্তাবক, অনুগৃহীতের দল।

ম্যাডাম ফিস ফিস করে বলল --- তার মানে গরিবরা আরও গরিব, আরও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, আর ধনীরা আরও ধনী!

কুতুবুদ্দির অভ্যেস হচ্ছে, সহজে সে কিছুতেই অবাক হয় না। সে ফস করে বলে ফেলল --- এড্যা বুঝতে তো বই - খাতা লাগে না। এই বিলের একবিঘা - দুইবিঘা জমিআলারা জমি হারায় বছর বছর আর ছরোয়ার চিয়ারম্যান টাউনে নতুন নতুন একখান কর‍্যাবাড়ি বানায়।

:

।। দুই ।।

ডিনে কাজ, রাটে ফুর্টি।

টমসন সাহেবের শিক্ষা অনুযায়ী কুতুবুদ্দি সন্ধেনামতেই ফুর্তি করে নিয়েছে। মাগরিবের আজান শোনামাত্র সে চলে গিয়েছিল বনমালী কুজুরের তাড়িভাটিতে। বয়স হয়েছে। বেশি তাড়ি পেটে সয় না। তবু যতখানি পারা যায় গিলেছে। তারপর গিয়ে বসেছে মহিম ঘোষের জিলিপির দোকানে। এই বিলের মধ্যে বিদ্যুৎহীন জনপদগুলোতে রাত আটটা মানে এমনিতেই অনেক রাত। তার ওপর কয়েক বছর হল সর্বহারাদের উপদ্রবে লোকজন পারলে সাঁঝ না হতেই দুয়ার দেয়। তবু বনেদি হাট বলে কথা। হাটের দিনে একটু - আধটু রাত হয়েই যায়। টিনের প্লেটে তার সামনে জিলিপি রাখতে ত্যারছা চোখে তাকায় মহিম ঘোষ--- পয়সা আছে তো? বাকি কিন্তু দিতে পারব না আজ।

পয়সা নাই মানে! সে কি ভিখিরি! কুতুবুদ্দি উর্দির পকেট হাতড়ায়। এখনই সে অগ্নিম টাকা ছুঁড়ে ফেলে ঘোষের ব্যাটার মুখে। এ পকেট, আরে পকেট। ডানদিকের পকেটে হাত ঢোকানোর সময় বামদিকে কাত হয়ে থাকে সে। কাত হতে হতে কেতরে পড়ে বেঞ্চের ওপর। দোকানের লোকজন হেসে ওঠে হো হো করে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি গলায় হেঁকে ওঠে কুতুবুদ্দি - হল্ট ! হুকুমদার !

তার চিৎকার শুনে আরও জোরে হেসে ওঠে লোকজন। আবারও হেঁকে উঠতে চায় কুতুবুদ্দি। কিন্তু হাত নিয়ে বেকায়দায় পড়ে। পকেট থেকে বের হচ্ছে না দুটো আঙুল। জোরে টান দিতে পকেট বেরিয়ে আসছে। আঙুলের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে কয়েকটা খুচরো পয়সা। মহিম ঘোষ খনখনে গলায় বলে -- ওই পয়সায় তো জিলাপি হয় না বাপজান। ট্যাকা যা কামাই করিছিলে সব বোধহয় দিয়া আইছ বনমালিরে। মাল খ্যায়া পয়সা হজম।

আঁতে খুব ঘা খায় কুতুবুদ্দি -- তোর জিলাপিত আমি লাথ্‌থি মারি। মাল খাইছি আমার ট্যাকা দিয়্যা। তোর বাপের কী?

একজন সহানুভূতির সঙ্গে বলে -- বুড়া বয়স, এট্টু আল্লা - বিল্লা করবি তা না, খালি তাড়ি খ্যায়া মাতাল হয়্যা ঘুরে!

ধমকে ওঠে কুতুবুদ্দি -- চোপরাও! হাম মেলেটারি লোক। মেলেটারি মাল খাবি না তো কি সাগু - বার্লি খাবি?
--- বাপের আমার মেলেটারি রে।
কুতুবুদ্দি সুস্থির হয়ে বসতে চায়। কিন্তু বেঞ্চি যেন তার মাথাকে চুম্বকের মতো টানছে। অনেক কষ্টে সে মাথাটাকে সোজা করে। তার ফুর্তি আজ একটু বেশি হয়ে গেছে। আধখোলা চোখে জিলিপির থালা খোঁজে। কই থালা কই। অ্যাই ঘোষের বাচ্চা, জিলাপি কঁাহা?
--- ট্যাকা নাই, জিলাপিও নাই।
--- তাহালে একখান বিড়ি দে।
--- কে তোমার জন্যে বিড়ির ফ্যাক্টিরি খুলে রাখিছে! বিড়ি কিনতেও পয়সা লাগে। এবার পশুর মতো ক্ষেপে ওঠে কুতুবুদ্দি --- শালা মাক্কিচোষ! মাছির গোয়া চিপ্যা খাস। এই জন্যই তো সর্বহারারা তোদের পোন্দে বাঁশ ঢুকায়।
শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দোকানের লোকগুলো কাঁটা হয়ে যায়। ভয় আর অস্বস্তি নিয়ে পরস্পর চোখাচোখি করে। শেষ লোকমান মিয়া পকেট থেকে বিড়ি বের করে -- লে বাবা একখান বিড়িই তো খাবু। তার জন্যে এত চিল্লাচিল্লি কিসের।
বিড়ি পেয়ে একটু শান্ত হয় কুতুবুদ্দি। তার বয়স্ক ফুসফুস অনেক কমজোরি হয়ে পড়েছে। তবু বুকভর্তি ধোঁয়া টানার চেষ্টাকরে। ফলশ্রুতিতে কাশির দমক। ঘরঘর করে শ্লেষ্মার শব্দ ওঠে। কিছু কিছু তার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। কারও গায়েও মেখেযায়। ওরা গাল বকে ওঠে। কিন্তু কুতুবুদ্দির তা শোনার সময় নেই। সে কাশতেই থাকে। তার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসে, চোখ উলটেআসে। মুখ হাঁ করে সে বাতাসের জন্যে খাবি খায়। বাতাস তাকে ফাঁকি দিয়ে তার শ্বাসযন্ত্রের বাইরে দিয়ে বয়ে চলে। ভেতরে ঢোকেনা।
--- শালার বুড়া কি মরতে বসিছে?
লোকমান মিয়া উঠে এসে কুতুবুদ্দির চাঁদিতে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে থাকে। একটা হাত রাখে তার বুকে। মেলামাইনেরগ্লাসে পানি ঢেলে নিয়ে আসে মহিম ঘোষ। আঁজলায় নিয়ে ছিটায় কুতুবুদ্দির মাথায়। গ্লাসটা ধরে তার মুখের কাছে।
ধীরে ধীরে একটু সুস্থির হয় কুতুবুদ্দি। নিঃশ্বাস নিতে পারে স্বাভাবিকভাবে। কাশি কমে গেছে। কিন্তু তখনও তার চোখে পানি আর চিপঁচুটি, শ্লেষ্মা মেখে গেছে বুকের কাছে উর্দিতে, তার দাড়ি ভিজে গেছে মুখের লালায়।
তার হাত ধরে লোকমান মিয়া - চলো বাবাজি। তোমার অবস্থা খারাপ। আমার সাথে চলো। তোমার ঘরে পৌঁছায় দি।
লণ্ঠনের আলো ছেড়ে ওরা বেরিয়ে আসে অন্ধকার পথে। ঘাটের দিকে এগুচ্ছে। এমনিতেই রাতে চোখে কম দেখে কুতুবুদ্দি।তার ওপর শরীরের এই অবস্থায় পুরো দিশা হারিয়ে ফেলেছে। লোকমানের হাত আঁকড়ে ধরে কোনোরকমে নিজের শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলে সে। ঘাটে পৌঁছে লোকমান বলে -- তোমার তো নাও চালানোর অবস্থা নাই। তোমার নাও ঘাটেই বান্দা থাকুক। তুমি আমার নায়ে চলো।
সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে ওঠে কুতুবুদ্দি - কভি নেহি। হাম স্যালো নৌকাত নাহি চড়েঙ্গা।
---আরে বাপু আপদ - বালাইয়ে সবকিছু মানতে হয়! অন্য সময় না হয় নাই-ই চড়লে। এখন তো বাঁচো।
--- নাহি! হাম মেলেটারি লোক। শির দেগা কিন্তু পাগড়ি নাই।
--- ধুশ শালা মেলেটারির গুষ্টি মারি! লোকমান ক্ষেপে ওঠে। শালার বুড়া মাতালের কপালে আজ খারাপি আছে।
--- থাকুক। হাম স্যালো নৌকাত নাহি চড়েঙ্গা তো নাহি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। লোকমান চলে যেতে গিয়েও ফিরে আসে --- বুড়া মাইনষের এত জেদ ভালো না বাপু। চলো! তুমি আমার সঙ্গে চলো।
--- না, তুই খালি আমার নাওকান খুঁজ্যা দে।
লোকমান আর রা কাড়ে না। কুতুবুদ্দির হাত ধরে টেনে নিয়ে বসিয়ে দেয় তার নৌকায়। হাতড়ে লণ্ঠনটা খুঁজে বের করে জ্বালিয়ে ছইয়ের সাথে ঝুলিয়ে দেয়। বৈঠা তুলে দেয় কুতুবুদ্দির হাতে। কিন্তু তার মনের খচখচানি যায় না। সে অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করে
--- ও বাপজি, নাও বাইতে পারবা তো?
--- হ্যাঁ হ্যাঁ পারব। তুই খালি রশিডা খুল্যা দে।
লোকমান ছোট্ট লাফ দিয়ে নেমে যায় পাড়ে। রশি খুলে পা বাড়িয়ে ঠেলা দেয় কুতুবুদ্দির নৌকায়। বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে কুতুবুদ্দির নৌকা স্রোতের চলিষ্ণুতার সঙ্গী হয় কুতুবুদ্দি বৈঠা পানিতে ফেলে না। সে গলুইতে বসে থাকে বৈঠা হাতে নিয়ে পুতুলের মতো। নৌকা স্রোতের গতিতে চলতে থাকে।
অন্ধকারের মধ্যে কুতুবুদ্দির মনে হয় সে অনন্তকাল ধরে নৌকায় ভাসছে। হাতে বৈঠা। কিন্তু একবারও সে বৈঠা পানিতে ছোঁয়নি। তার সেই ইচ্ছাশক্তিই নেই। তবু নৌকা একটু একটু করে চলে। আকাশে কোনো তারাও নেই যে সেটা দেখে দিক ঠিক করবে। সে নিজেকে এবং নৌকাকে পুরোপুরি স্রোতের হাতে ছেড়ে দেয়। আর স্রোত একসময় ঠিকই তাদেরকে এক ডাঙার সাথে ভিড়িয়ে দেয়।এটা যে কোন ভিটা, তার বোঝার উপায় নেই। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তবু ডাঙার সাড়া পেয়ে কুতুবুদ্দি নৌকা থেকে নেমে আসে। লণ্ঠনটাখুলে নিলে ভালো হত। কিন্তু লণ্ঠনের কথা তার মনেই নেই। সে আবছা ভাবে বুঝতে পারে এটা বোধ হয় ঘাসিপিরের ভিটা।স

ারা বছরঅন্ধকার আর ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা। শুধু চৈত্রসংক্রান্তিতে ওরসের সময় লোকে পা দেয় এই ভিটায়। কুতুবুদ্দি কয়েক পা এগে গায়। কিন্তু মাজারের টিনের চালার নীচে পৌঁছানো অন্ধকারে তার কাছে অসম্ভব মনে হয়। পায়ের নীচে নরম ঘাস। সে ওই ঘাসের ওপর বসে। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। সাপ - খোপ থাকতে পারে। সেসব কথা তার মনেই পড়ে না। পিঠের নীচে মাটির স্পর্শ তার ভালো লাগছে। সে আক্লেশে ঘুমিয়ে পড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

:

।। তিন ।।

স্বপ্নের মধ্যে কুতুবুদ্দি ফ্রন্টে পৌঁছে যায়। সামনাসামনি যুদ্ধ চলছে। গুলি ছুটছে দিক - বিদিক। আকাশে আগুন জ্বেলে ছুটে আসছে কামানের গোলা। লেপ্টান টমসনের বন্দুক থেকে ছুটে মৃত্যুবান। একটা বন্দুকের গুলি ফুরালেই ফেলে দিয়ে আরেকটা বন্দুক তুলে নিচ্ছে সাহেব। সেই ফাঁকা ফাঁকা বন্দুকে গুলি ভরছে কুতুবুদ্দি। হঠাৎ সে দেখল সাহেব ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে সামনের দিকে। তার দিকে ছুটে আসছে অসংখ্য গুলি। কিন্তু সাহেবের পরোয়া নেই। সে গুলির মধ্যেই ছুটে গেল সামনের টিলার পেছনে। শ্বাস বন্ধ করে সাহেবের কাণ্ড দেখছিল কুতুবুদ্দি। এইবার সাহেব ঢিবির আড়াল পাওয়া শ্বাস স্বাভাবিক হল। সে ট্রেঞ্চ থেকে গলা বাড়িয়ে বলল -- এইভাবে গুলি মধ্যে ছুটলেন ক্যান ছার?

টমসন সাহেব তার দিকে তাকিয়ে হাসল। বুকের কাছে উর্দিতে টোকা মেরে বলল--- এটা হল হার ম্যাজেস্টি মহারানির ইউনিফর্ম। এখানে বুলেট লাগলে স্লিপ করে চলে যায়। ভেতরে ঢুকতে পারে না।

এবার গুলিবর্ষণের শব্দ আরও বেড়ে গেল। আর সেই সব বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কুতুবুদ্দির।

চোখ খুলে অন্ধকারের মধ্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে রইল কুতুবুদ্দি। দেখা যাচ্ছে না কিছুই। কিন্তু সে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে বন্দুকের গর্জন। তার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে ছুটে যাচ্ছে গুলি। ঘাটে ভটভট করে এসে ভিড়ছে স্যালোর নৌকা। চিৎকার চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে হতবুদ্ধি হলেও মিলিটারি নিয়ম ভোলেনি কুতুবুদ্দি। সে উপুড় হয়ে শুল। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল নিশ্চল।

ধীরে ধীরে কমে এল গুলির শব্দ। দুদ্দাড় ছুটে চলে গেল কয়েকজন মানুষ। স্যালোর নৌকা স্টার্ট দিয়ে খুব দ্রুত চলে গেল ঘাট ছেড়ে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হুইসেল বেজে উঠল। টর্চের আলো ছুটাছুটি করছে এদিক - ওদিক। কুতুবুদ্দি উঠে নিতম্বের ওপর বসেছে ততক্ষণে। একটা টর্চের আলো সরাসরি এসে পড়ল তার মুখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার ----পাইছি স্যার। একজনারে পাইছি।

চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় হাত তুলে চোখ আড়াল করতে গেল কুতুবুদ্দি। সঙ্গে সঙ্গে হুংকার এল --- খবরদার, নড়াচড়া করলেই গুলি!

কুতুবুদ্দি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সেদিকে। ছুটে এল আরও কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ। আরও গোটা তিনেক শক্তিশালীটর্চ আলো ফেলল কুতুবুদ্দির ওপর। কয়েকজন ঘিরে ধরল তাকে। একটা কণ্ঠ ভেসে এল --- শালার চেহারা দ্যাখ! কী ভয়ংকর! এই শালা বল তোর সঙ্গীরা কোথায়?

কুতুবুদ্দি সেই আবছায়ার দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বলল -- ছার।

--- বল শালা! কোথায় পালিয়েছে তোর সঙ্গীরা? শালার দিনে - দুপুরে বেলতলি ফাঁড়ি লুঠ করেছিস আজ! এত সাহস! ভাবিস পুলিশ তোদের এমনি এমনি ছেড়ে দেবে। শালার সর্বহারা করাপাছার মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।

কুতুবুদ্দি আবার বলল -- ছার, আমি মেলেটারি লোক...

---মিলিটারি? শালা ভ্যাক ধরছ!

একজন চুলের মুঠি ধরে কুতুবুদ্দিকে তুলে দাঁড় করাল। তারপর দড়াম করে ঘুষি মারল বুটের লাথি। আবার চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করানো হল তাকে।

--- বল শালা! তোর সঙ্গীরা কোথায়? সর্বহারার বাচ্চারা?

--- ছার, আমি ছার মেলেটারি। এই দ্যাখেন ছার আমার উর্দি।

--- ইউনিফর্ম দেখানো হচ্ছে! --- একজন মুঠো করে তার উর্দির কলার চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আগুন ধরে গেল কুতুবুদ্দির। তার উর্দিকে অপমান! সে বুড়ো হাতের ঝটকায় নিজের কপাল ছাড়িয়ে নিতে চাইল --- খবরদার! মহারানির উর্দি। গুলি করলেও ঢুকে না পিছলায় যায়।

ক্রোধের মধ্যেও হেসে উঠল কয়েকজন।

আর সহ্য করতে পারল না কুতুবুদ্দি। ঠাস করে চড় কষাল তার কলার ধরে থাকা লোকটার গালে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশটা কোমরের খাপ থেকে পিস্তল বের করে চেপে ধরল কুতুবুদ্দির বুকে।

মরার সময় অন্তত ভুলটা ভাঙল কুতুবুদ্দির। মহারানির উর্দি, বুলেট তো বুলেট, একটা মশার হুলকে পর্যন্ত ঠেকাতে পারে না।

ভুল্‌কাগড়ের রক্ষী

শক্তি সেনগুপ্ত

।। এক ।।

ছাঁচতলার নিচে পা দুটো মুড়ে, এই সাত সকালেই মুখ ব্যাজার করে বসে আছে বাঘু মুর্মু। ওর বেটা দুখিয়ার বৌ মুংলী বাছুর বাঁধতে এসে আড়চোখে শ্বশুরের মুখের চেহারা দেখে আড়ালে একটু মুচকি হাসল। বুড়োর যত বাতিক, জঙ্গলের গাছ কেটে লরি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বুড়োর যত রাগ। লোকে পয়সা দিয়ে গাছ কিনছেকেটে নিয়ে যাবে না তো কি অমনি রেখে দেবে? এতে রাগের কি আছে?

একটা এনামেলের বাটিতে এক বাটি হাঁড়িয়া আর একটা শালপাতায় একটু কুমড়ো শাক সেদ্ধ এনে নামিয়ে রাখল বুড়ো পাশে। বাঘু বুড়ো ঘাড় ফিরিয়ে সেটুকু দেখেই আবার যেমনকার তেমনি।

দুনিয়ার ছেলে পটা কোথায় যেন গেছল, ছুটতে ছুটতে এসে দাদুর মেজাজের তোয়াক্কা না করেই বুড়োর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বললে---

---মাহাতোরা লদীতে হাওয়া জাল পেতেছে।

---পাতুক, তোর কি ?

---এত বড় বড় মিড়িক মাছ পড়ছে, কেউ কুথ্‌থাও নাই।

মাছের গন্ধে বুড়ো চনমনিয়ে উঠল, ---সড়কি দুটা বের করত।

হাত বাড়িয়ে হাঁড়িয়াটুকু এক চুমুকে শেষ করে, চোখ বুজে কুমড়োশাকটুকু আলগোছে মুখে ফেলে চোখ খুলতেই দ্যাখে তার ব্যাটা দুখিয়া তার সামনে দাঁড়িয়ে।

---আপিসে চল, বাবু ডাকছে।

---কেনে? আমিযাব কেনে? তুর আপিসে আমার কি?

---কলকাতা থিকে তিনটে বাবু আইচে, তুর সঙ্গে কথা বুলবেক।

---কেনে? আমার সঙ্গে কিসের কথা? আমি কি চুরি করেছি? আমি যাব নাই, আমার কাজ আছে সিখানেযাচ্ছি।

---চল্‌ না কেনে একবার, তোকে খুঁজছে, আমাকে ডাকতে পাঠাল।

---কেনে? আমাকে খুঁজছে কেনে? কি করতে হবেক কি?

---সেই ভুল্‌কা গড়ের খবর শুধাবেক। বিট বাবু বলেছে তুই ছাড়া ভুল্‌কাগড়ের খবর আর কেই জানে নাই।

ভুলকাগড়ের কথা শুনে বাঘুর মেজাজটা আবার বিগড়ে গেল। উশালারা ভুলকাগড় দিয়ে কি করবেক ? লড়াই করবেক ? বলে দে আমি কিছু জানি নাই।

---আমি অত বিত্তান্ত বলতে লাইরব। তোকে ডাকতে পাঠাল তাই আইলম। তু না যাবি, না যাবি।

:

।। দুই ।।

দুখিয়া এই মহাদেবসিনান বনের সামান্য একজন বনরক্ষী। সত্যিই তার পক্ষে এত বৃত্তান্ত বলা মুস্কিল। আসলে ব্যাপারটা হল কলকাতার একটি বেশ বড় - সড় পত্রিকার একজন বিশিষ্ট রিপোর্টার এই ভুলকাগড়ের খবর পেয়েছেন। চুয়াড় বিদ্রোহের সময় এই মহাদেবসিনান, মুচিকাটা সুতান এইসব গভীর অরণ্য অঞ্চলে, কাঁসাই কুলিয়া খয়রা ও বাইরীরা অরণ্যবাসী সাঁওতালদের সহায়তায় এক দুধর্ষ গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলে। এই অঞ্চলেরই কোথাও এক প্রকাণ্ড পাথরের তলায় এক বিশাল সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করে, সে

ই সুড়ঙ্গকে তারা দুর্গ বা গড় হিসাবে ব্যবহার করত। এই গড় এতই সুরক্ষিত ও দুর্গম ছিল যে ইংরেজ সশস্ত্র বাহিনী এই গড়ের কো
ান সন্ধান করতে তো পারেইনি, উপরন্তু যখনই এই গড়ের চারপাশ দিয়ে সৈন্যদল গেছে, বিদ্রোহীদের তীরে তারা প্রায় সম্পূর্ণ পরা
স্ত ও আহতহয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। চুয়াড় বিদ্রোহ দমনের পরেও অনেক সন্ধান করেও ইংরেজ সরকার এই ভুল্‌কা গড়ের কো
ন হদিশ করতে পারেনি।

স্থানীয় এক জৈন সন্ন্যাসীর প্রতিবেদন অনুযায়ী ভুল্‌কা গড়ের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এই রকম ঃ- .....''এই সুরক্ষিত দুর্গটি খা
তড়া হইতে রানিবাঁধ যাইবার পথে মহাদেবসিনান নামক এক দুর্গম জঙ্গলের ভিতর অবস্থিত। প্রকাণ্ড একখণ্ড পাথরের উপরমুখে এ
কটি চতুষ্কোণাকৃতি প্রস্তর খণ্ড ঢাকা সুড়ঙ্গ মুখ। পাথরটি সরাইলেই একটি ঢালু মসৃণ পথ সুড়ঙ্গের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। ভিতরে
অনেকখানি প্রশস্ত স্থান, মাথা সোজা রাখিয়াই দাঁড়ানো যায়, এবং একসঙ্গে প্রায় শতাধিক মানুষ প্রবেশ করিতে পারে। উপরে পাথ
র প্রায় ছাদের মত পাথর ও মাটির সংযোগস্থলে অনেকগুলি ছিদ্রপথ দিয়ে বাহিরের সবকিছু লক্ষ করা যায় বা তীর নিক্ষেপ করা
চলে। এই বিশাল প্রস্তরটির বহির্দেশ এমন ঘন জঙ্গল ও অন্যান্য প্রস্থরখন্ডে ঢাকা যে বাহির হইতে প্রায় কিছুই বোঝা যায় না। এটি
আদিম কৌম জনজাতির অত্যন্ত প্রাচীন দেবস্থান এবং সর্বদাই সুরক্ষিত, বিধর্মীরা এর ধারে কাছেও যাবার সাহস পায় না। আঞ্চলি
ক ভাষায় সুড়ঙ্গ বা গর্তকে ভুলুক বলা হয়। সুরঙ্গের গড় এই অর্থে ইহা ভুলুকাগড় বা ভুল্‌কাগড় নামে পরিচিত।গড়ের ভূমিতল শ
ক্ত পাথরের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বেশ ঢালু বলিয়া বন্যার জল প্রবেশ করিলেও দাঁড়াইতে পায় না।''

কলকাতা থেকে সব প্রতিনিধি বাবুরা এই ভুল্‌কাগড়ের সন্ধানে এসেছেন তাঁরাও কিছু কম কাঠ খড় পোড়াননি। তাঁরা নিজস্ব পরিচ
য় পত্র ছাড়াও, বনমন্ত্রীর সার্টিফিকেট, ডি এফ ও-র চিঠি, এ আই আই এর রোড ম্যাপ, গোটা তিনেক ক্যামেরা (তার মধ্যে একটা
মুভি) ক্যাসেট রেকর্ডার, একটা তাঁবু এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কঠিন, বায়বীয় ও তরল পদার্থের প্রচুর যোগাড় যন্ত্র নিয়ে মুকুটমণি
পুরের সেচভবনে উঠেছেন গতকাল সন্ধ্যায়। আজ সকালে কংসাবতী জলাধারে নৌকা বিহারের পর ব্রেকফাস্টের সময় খাতড়া অ
ম্বিকারণগরও কংসাবতী অফিসের বহু গণ্যমান্য মানুষজনকে ডেকে তাঁদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন।

তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে চুয়াড় বিদ্রোহের পরেও এই সুরক্ষিত সুড়ঙ্গ বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবী বা বিদ্রোহীদের আত্মগোপন করতে সা
হায্য করেছে এই অরণ্য অঞ্চলের কিছুটা দূরেই ছেঁদাপাথর এলাকার একটা গোপন জায়গায় শহীদ ক্ষুদিরাম ও তার সহকর্মীদের বে
বামা তৈরি ও অস্ত্রশিক্ষার গুপ্ত অনুশীলন কেন্দ্র ছিল। অম্বিকাগররাজ রাইচরণ ধবলদেব ছিলেন তাঁর প্রধান সহায়। বহুবার হানা দি
য়েও ইংরেজ পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেন নি। সারা অরণ্য চিরুণি তল্লাসী করেও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেত না। এই কিছুদিন আগে
ও কুমারী জলাধারের কিছু উদ্বাস্তু সাঁওতালবিদ্রোহীকে পুলিশ কোন মতেই খুঁজে বের করতে পারে নি। আরও ছোট খাট নানা ঘ
টনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিশ্বাস এই প্রাচীন গড়টি নিশ্চয়ই এখনো আছে, এবং নানা বিপ্লবের স্মৃতিচিহ্নবাহী এই গড়, আজ এক মূ
ল্যবান প্রত্নবস্তু। এর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ প্রয়োজন, এই বিষয়ে আলোকপাত করার জন্যই তাদের এই অভিযান।

:

।। তিন ।।

বাঘুবুড়া এল না দেখে বিট অফিসার কার্তিক মণ্ডল বেশ বিরক্ত হলেন। এই অরণ্য অঞ্চলে তিনি কাউকে ডাকলে সে আসবে না, সে
স তিনি ভাবতেই পারেন না। বিশেষত কলকাতার এই সব বড় বড় মানুষের সামনে তার মান সম্মান বলে আর কিছু রইল না। ভয়
ঙ্কর চটে উঠে বললেন, আসবে না মানে, মজা নাকি ? আমি দরকারে ডেকে পাঠিয়েছি, আসবে না কি আবার, তুই আবার যা, আম
ার নাম করে বলবি--- না এলে কিন্তু খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।

----বাঘু! ওঃ আজ কি মাছটাই খাওয়ালে। হেউ রকম পাকা মাছ, আমি লদীধারে এ্যাদ্দিন আছি চোখেও দেখিনি। কি করে ধরলে
বল দেখি?

বাঘুর মুখে কোন কথা নাই, চেলাটেরর তকলি ঘুরছে তো ঘুরাচ্ছেই। দুখিয়া ততক্ষণে তাড়াতাড়ি দুটো খাটিয়া এনে উঠানে পেতে
ফেলেছে। শশব্যস্ত হয়ে বসাচ্ছে সবাইকে। রিপোর্টারদের একজন ইতিমধ্যে বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে বাঘুর ছবি তুলতে শুরু করেছে
। বাঘুর কোন ভ্রুক্ষেপ নাই, মস্ত ভি. আই. পির মতো সে ভাবলেশহীন মুখে হাতের কাজ করে চলেছে। কেবল দুখিয়া তাড়াতাড়ি তা
র বৌটাকে গোয়ালঘরে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে, যাতে তার ছবি না উঠে যায়। তার এখন আটমাস চলছে এই অবস্থায় যদি ফটক উঠে
ঠ যায় সে ভারি লজ্জার ব্যাপার।

মন্ডলবাবু ব্যাগ থেকে দু - বোতল মদ বের করে আর সাইকেলের হ্যান্ডেল থেকে পাঁ বাঁধা একটা মুরগী খুলে নিয়ে, বাঘুর পাশটিতে
ত রাখলেন। বললেন বাঘু ---তুমি আমার অতিথ্‌কে এমন সুন্দর মাছ খাওয়ালে, তাই তুমাররাতের ব্যবস্থাটা আমিই করলাম। কি
ন্তু বাঘু তুমার ঘরে আমরা আইল, আর তুমি আমাদের দিকে ডাইলছই নাই,রাতক্‌ কাছড় নাই। ইটচা কি মড়লের মতন ব্যাভার হ
ল?

মন্ডল মশাই -এর মোক্ষম প্রচেষ্টায় বাঘুর মুখে কথা ফুটল - বলল, হঁ বাবু আপনারা আমার ঘরে আইছ - খুব ভাল, ঘরে ফল পাক
ড় যা আছে, তালশাঁস, আম, জাম, খেজুর, এইসব খাও। এ দুখ্যা --- তালশাঁস কাট দিকি বাপ কচি পারা, বাবুদের খাঁওয়াই দিই,
আর তুমরা যখন কুঁকড়া মদ আনেছ, রাইতে এইখানেই খাতে হবেক। খাও, দাও, লাচ গান কর। কিন্তুক বাবু একটি কথা - ভুলুকে

র কথা আমাকে কিন্তুক শুধাস না -- ভুলকাগড় কুথায় আমিজানি নাই - ব্যাস।
বাঘুর কথার ধরনে রিপোর্টাররা হো হো হেসে ওঠে।
সেনসাহেব একটু চাপা গলায় ইংরেজীতে মণ্ডল বাবুকে যা বললেন তার বাংলা হল--- বুড়োকে তার ভিটেয় বসে রাজি করানো যা বেনা - বন অফিসে নিয়ে চলুন - চেয়ারে বসান, খাওয়া দাওয়া হোক - নেশা হোক- তখন দেখবেন সব বলবে।
বিট অফিসার বোস উঠে বাঘুর পাশাটিতে গিয়ে বসলেন। বললেন, ভুলুকের কথা নাই বললে আরো তো কথা তুমি জানো। বাবুব . া সে সব কথা শুনবেক তুমার কাছে, তুমি চলো তো বাপ আমার সঙ্গে উখ্যানে আমরা জাঁকাই বসবো গান হবেক গল্প হবেক, চলে া---
---যা না কেনে বাবুরা এতে করে বলছে। দুখিয়া সাহায্য করতে চায় তার বাবুকে।
---যাব? উঠে দাঁড়ায় বাঘু, - নাতিকে খোঁজে, চোখাচোখি হয় নাতির সঙ্গে। বোতল দুটো আর কাঁকড়াটা তুলে নেয়। উখানে যখন যাচ্ছি - উখানেই খাওয়া দাওয়া হবেক।
বনবাংলায় সারাটা সন্ধ্যা খাওয়া দাওয়ার ফাঁকে রিপোর্টাররা বাঘুকে বুঝিয়েছে ভুলকাগড়ের মূল্য, পর্যটকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গু রুত্ব, আঞ্চলিক মানচিত্রে এর আকর্ষণ ইত্যাদি বেশ বড়ো সড়ো কথাবার্তা - অমরত্ব লোভীদের তালিকায় বাঘুর নাম কে চিহ্নিত ক রার চেষ্টাও চালালো তারা কিন্তু বাঘু বলেছে সে শুধু ভুলকাগড়ের গল্প শুনেছে। কোনদিন দেখে নাই, বোধহয় বানের জলে বালি চাপা পড়ে ভুলুক বন্ধ হয়ে গেছে, থাকলে সে একদিন না একদিন দেখতে পেতই। তারপর একসময় তাদের সমস্ত চেষ্টায় জল ঢেলে ি দয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরে গেছে সে।
সুহাস যেন হতাশ হয়ে বললেন-- মণ্ডলবাবু আপনার কি মনে হয় এই গড়ের আর কোন অস্তিত্ব নেই? আর থাকলে সত্যিই কি বাঘু সর্দার এই গড়ের খবর জানে না?
---অসম্ভব। নিশ্চই জানে ও, এখানের সাঁওতালদের যত হুলের পরামর্শ সব ওর বাড়িতে। যদি ভুলুকগড় নাই থাকে তবে এখান দি য়ে যেদিন শিকারে বের হয় এত অস্ত্র শস্ত্র বের হয় কোথা থেকে ? সাঁওতালদের বাড়িতে তো অস্ত্র শস্ত্র থাকে না।
---সে যাই হোক আমাদের তো খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে আপনি তো পারলেন না বাগে আনতে। আমাদের এত চেষ্টা সবই বিফে ল গেল।
---আমার হাতে আর একটি অস্ত্র আছে, সেটি ব্যর্থ হলে আর কিছু করার নেই স্যার। দাঁড়ান আমি আসছি একটু।
দুখিয়া বারান্দায় বলেছিল, তাকে ডেকে নিয়ে এল তার নিজের শোবার ঘরে।
---দুখিয়া বড় বিপদে পড়েছি রে। স্বয়ং বনমন্ত্রী, পি সি সি এফ, এঁরা সব এঁদের হাতে চিঠি দিয়ে বলে দিয়েছে ভুলকাগড় দেখিয়ে ি দতে। এরা সব গরমেন্টের লোক, যে কাজ করতে এসেছে, সে কাজ না করে ফিরে গেলে আমাদের নামে যা তা রিপোর্ট দিয়ে দেবে । গরমেন্টের কাজে বাধা দেবার জন্য আমাদের চাকরি তো যাবেই, জেলও হতে পারে। সরকারে যখন জানতে পারবে তোর বাপ ে জনেশুনে মিথ্যাকথা বলেছে গড় দেখিয়ে দেয়নি, তোর চাকরি যাবেকই। এখনও যদি বাঁচতে চাস, বাপকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি ক র। ভুলকাগড় দেখিয়ে দিতে বল, আর নইলে বাপ সোজা কথা তোকে বলে দিচ্ছি কাল থেকে আর কাজে আসিস না।
:
বাড়িতে গিয়ে বাপের সঙ্গে সারারাত ঝগড়া করেছে দুখিয়া। কি হবেক উটা দেখিয়ে দিলে। বনটা যদি সরকারের হয় তো সরকারে র জিনিস। কি আছে উটাতে ? সোনা রূপা কিছুই তো নাই। একটা পাথর আর তার তলায়একটা ফোকর, দেখাল তো কি হবেক। লড়াই করার জায়গা, ত-লড়াই করব কেনে? চাকরি করে খাচ্ছি, চাকরি করব। বিট বাবু বলেছে উটা তুই যদি না দেখাই দিস আ মার তা হলে কাল থেকে চাকরি নাই। তাহলে কি কইরব? জানি না যে চাষ করে খাব। পটা কে ইস্কুলে পাঠাতে হবেক, আর একটা আসছে, চাকরি গেলে এখন আমরা যাব কুথায়?
তুই কি চাস একটা লুকোবার জায়গার জন্য তোর বেটা বৌ লাতি ভিক্ষা করে খাবে ?
দুখিয়ার সঙ্গে সামনে সায় দিয়ে গেছে ওর বৌটাও। বলেছে তুই আর কদিন বাঁচবি। তুই মরে গেলে কেউ না কেউ উটা দেখিয়ে ি দবেকেই। আর তোর জন্য আমরা না খেয়ে মরব?
সারারাত তাদের এই ঝগড়াঝাটির জন্য ঘুমোতে পারেনি পটা। শুয়ে শুয়ে তাদের সব কথা শুনছে।
শেষ পর্যন্ত পারল না বুড়ো প্রতিরোধ করতে। বলল --- কাল সকালে যাব ভুলকাগড় দেখাই দিব। তাতে যদি তুদের ভাল হয় তাই হবেক।
।। পাঁচ ।।
গভীর অরণ্যের পথ ধরে চলেছে তারা। প্রথমে বাঘু মুর্মু, তার পিছনে বিট বাবু, কলকাতাআগত তিন প্রতিনিধি সবশেষে লাঠি হাে ত দুখিয়া।
সকালের নেমে আসা জমাট কুয়াশা এখনো গাছের ছায়ায় লুটিয়ে রয়েছে। গত রাতের শিশিরপাতে শুকনো পাতার ওপর পদধবি ন এখনও তেমন মুখরিত হচ্ছে না। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ভোরের আলো নেমে এসে পাখপাখালির ডাকের সঙ্গে মিলে মি

শ লাল রঙেরশক্ত মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঘু মুর্মু হাঁটছে যে স্বপ্নের ভিতর, যে তার নিজের শবযাত্রার হেঁটে যাচ্ছে সে।
বন ক্রমশঃ গভীরতর হচ্ছে, সামান্য এক চিলতে পায়ে হাঁটা পথ ছাড়া আর একটুও জমি দেখা যাচ্ছে না। এই উজ্জল সকালেও স মস্ত বনাঞ্চল যেন সন্ধ্যার প্রহেলিকায় ঢাকা।
বিটবাবু বলে উঠলেন বাপ রে! এতদিন জঙ্গলে আছি এই দিকটায় যে এত গভীর জঙ্গল কোনদিন জানতে পারতাম কিনা কে জানে ।
একটু দূরে লতাগুল্ম পরিকীর্ণ টিলার মত উঁচু জায়গা দেখা যাচ্ছে। সমস্ত টিলাটা ঘন আঁতাড়ি ঝোপে ঢাকা। সাদা সাদা আঁতাড়ি ফুলে আলো হয়ে আছে চুতর্দিক, সামনে ঘন প্রাচীন শালের ঠাস বুনুনি অরণ্য। তার সামনে খানিকটা নিকানো টকটকে লালমাটি, বড় বড় নুড়ি পাথরের স্তূপ চতুর্দিকে। সব মিলিয়ে যেন মায়া সভ্যতার হারানো অলীক।
দুখিয়া দৌড়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ফাঁকা জায়গাটার ওপর। কেউ খেয়াল করেনি সঙ্গে একট ছোট মুরগী এনে ছিল, এক টানে তার মুন্ডুটা ছিঁড়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ছড়িয়ে দিতে লাগলো চতুর্দিকে। আবার একটা গড় করে ফিরে এল দলে। বিট বাবু বললেন এটা সাঁওতালদের জাহীর থান।
বাঘু এইখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বলল -- বাবু, তোরা সব এইখানে দাঁড়া। কেউ এগুয়াস না, আমি ডাকলে তবে যাবি। দলের সবাই বুঝ এই সেই জায়গা। রিপোর্টাররা ক্যামেরা রেডি করার দিকে মন দিলেন। দু একটা ছবিও উঠতে লাগল অরণ্যের।
এগিয়ে গেল বাঘু। জাহীর থানের ফাঁকা চাতাল পেরিয়ে ও এখন ঢুকে যাচ্ছে ঘন অন্ধকার ঝোপের ভিত। হঠাৎ বাঘুর তীব্র আর্তনাদে চমকে উঠল সবাই। দুখিয়া ছুটলো তার খোঁজে সেই ঘন ঝোপের ভিতর। একটু পরেই বাঘুর শরীরটাকে কাঁধের ওপর ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে দুখিয়া। চিৎকার করছে সামনে। বাঘুর কপালে বিশাল ক্ষত। সারা কপালটা যেন ফেটে চৌচির। গোঁঙাতে গোঁঙাতে কোন মতে ক্ষতস্থান চেপে আছে বাঘু। অঝোরে রক্ত ঝরে পড়ছে। আতঙ্কে উত্তেজনায় সবাই স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে।
জাহীর থানে বাঘুকে শুইয়ে দিয়ে, কি একটা গাছের পাতা দুহাতের তালুতে দলে নিয়ে ক্ষতস্থানে লাগালদুখিয়া। নিজের পরণের পাঁচহাতি কাপড়টার বেশ খানিকটা ছিঁড়ে ফেলে বেঁধে দিল মাথায়, তারপর বাপকে কাঁধের ওপর তুলে ছুটতে লাগল অরণ্যপথ দিয়ে বলতে বলতে - বাপকে রাণীবাঁধেব হাসপাতালে লিয়ে যাচ্ছি সেলাই করতে হবেক।
মুহূর্তের মধ্যে আরম্ভ হল অঝোরে প্রস্তর বৃষ্টি, ঝাকে ঝাঁকে ছুটে আসা পাথরের আঘাতে আহত, বিমূঢ় হয়ে সবাই প্রাণপণে দুখিয়ার ফিরে যাওয়ার পথ অনুসরণ করে ছুঁটে চলল অরণ্যের বাইরে।
বিটবাবু চিৎকার করে ডাকলনে দুখিয়াকে - দুখিয়া দাঁড়া, জঙ্গলের জিপ নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে নইলে দেরি হয়ে যাবে অনেক।
হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে বাঘু। সতেরটা সেলাই পড়েছে, রক্ত দিতে হবে। জ্ঞান ফিরেছে বাঘুর। রিপোর্টাররা তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। কি কষ্ট হচ্ছে বাঘু?
---না বাবু, কোন কষ্ট নাই।
---আচ্ছা, তোমাকে এমন করে কে মারলে বলতো?
বাঘু চারদিক খুঁজে পটার মুখের দিকে তাকায় -- হাসে।
---মারেনি তো বাবু, লড়াই করেছে। ভুলুক রক্ষার লড়াই।

সুন্দরবনে বাঘ দেখা

ভগীরথ মিশ্র

পাখিরালা। তার পোশাকি নাম পাখিরালয়। অর্থাৎকিনা, পাখির আলয়। লঞ্চঘাটাতে কাঠের জেটি। জেটির দু-ধারে উঁচুরেলিং। জোটি পেরিয়ে উঁচু বাঁধ। বাঁধের ওপারে কাঁচা রাস্তা। ভার্মা সাহেবের পুরো দলটা বাঁধের ওপরদাঁড়িয়ে নদীটাকে দেখছিলেন। েজটির গায়ে ওঁদের সরকারি লঞ্চখানা দুলছিল। বিকেল গাড়িয়ে আসছে। চোখ ফেরালে দুরে দেখাযায় কালচেপানা সজনেখালি। ততক্ষণে আঁধার মাখতে শুরু করেছে সে। এই শীতের মরসুমে এই : অঞ্চলে ট্যুরিস্টদের ভিড় মন্দ হয় না। নদীর জলে ভার্মাসাে হবদের লঞ্চটার কাছাকাছি আরও কয়েকখানা লঞ্চ।

:

বাঁধের গা ঘেঁষে যে রাস্তাটা, তারদু-পাশে গজিয়ে উঠেছে কিছু পান - সিগারেট, চা- তেলেভাজার দোকান।নেহাতই মরসুমি দোকান ওগুলো। লঞ্চ থেকে নেমে ট্যুরিস্টদের দল : এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকল করছেবাচ্চারা, পাশের পান-সিগারেট, লজেন্স - বিস্কুটের দোকান থেকে ললিপপকিনছে। বয়স্করা চায়ের দোকানের কাঠের বেঞ্চিতে বসে চা-মামলেট খাচ্ছে।ভার্মা সাহেব : জানেন, এরা আরঅধিকক্ষণ থাকবে না। এদের একটা অংশ গিয়ে ডেরা পাতবে সজনেখালিরট্যুরিস্টলজে। বাকিরা যে-যার লঞ্চের মধ্যেই রাত কাটাবে কেবিনে। এসবলঞ্চে তেমন ব্যবস্থা থাকে।

ভার্মা সাহেব সঙ্গের মানুষগুলির দিকে তাকান।আপাত পরিতৃপ্ত মুখগুলির আড়ালে বুঝি সামান্য আশাভঙ্গের বিষাদ। অথচসকালে যখন শুরু হয়েছিল যাত্রা, প্রত্যেকের মুখ চক্‌চক্‌ করছিল খুশিতে।দুলতে দুলতে এগিয়ে চলছিল লঞ্চ। সারেঙয়ের কেবিনের সামনে কাঠেরপ্রশস্ত প্ল্যাটফর্মের ওপর জাজিম পাতা ছিল। তাকিয়াও : দু-তিনটে । তাতে এলিয়ে বসেছিলেন মিসেসভার্মা, মিসেস চতুর্বেদী, মিসেস পালও। দু-পাশের সারবন্দী গার্ডেন - চেয়ারেবসেছিলেন ভার্মা সাহেব, মিঃ অরবিন্দ চতুর্বেদী, দু-সাহেবের তিনটে ছেলেমেয়েগায়ত্রী, রিংকি আর ডন। পাল সাহেবের জন্যও নির্দিষ্ট ছিল চেয়ার, কিন্তুতিনি বসবার অবকাশ পাচ্ছিলেন না। অতিথিদের জন্য চা-কফি, প্রাতরাশেরবন্দোবস্ত করতে হিমসিম খাচ্ছিলেন তিনি। সিঁড়ি বেয়ে ঘনঘন ওঠা -নামাকরতে গিয়ে ঐ শীতের সকালে তাঁর কপালে, নাকের ডগায় বিন্দুবিন্দু : ঘাম.....। ভার্মা সাহেব সর্বসমক্ষে বারদু-তিন মিঃ পালের উদ্দেশে আজকের ট্রিপ আমাদের গার্জিয়ান এন্ডগাইড বলেসবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই ট্রিপের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার ঝক্কিতিনি অনুগ্রহ করে মিঃ পালের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আর, মিঃ পাল, রাজ্যসিভিল সার্ভিসের একজন বিশ বছরের সিনিয়রিটি সম্পান্ন অফিসার, সারাক্ষণচোখেমুখে এক ধরনের চৌকস ভাব ফোটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেচলেছেন। মিঃ ভার্মা যখন অতিথিদের সঙ্গে তাঁর ঘটা করে পরিচয় দিচ্ছিলেন,সেই মূহূর্তেই তিনি বুঝেছেন, আজ তাঁকে সমগ্র ব্যবস্থাপনাটি একেবারনিশ্ছিদ্র করে তুলতে হবে। কেন কি, মিঃ পাল থাকলে আর আমাদের কোনোইভাবনা নেই, উনি একাই একশ.....পিয়ন -চাপরাশিদের সামনে উচ্চারিতভার্মা সাহেবের স্তুতিবাক্যগুলি সারাক্ষণ চরকার মতো ভোঁ - ভোঁ আওয়াজতুলেছে মিঃ পালের মগজে. আর, তার ফলে, মিউজিক-সিস্টেমে মৃদু েসতারবাজতে শুরু করে রবিশঙ্করেব, উচ্চাঙ্গের প্রাতরাশ, ফিনফিনেপোসিলিনের প্লেটে,.....তৎসহ চা-কফি, কাজু,....., এবং েবলাসামান্য চড়তেই : মহিলা ও বাচ্চাদের জন্যপেপসি, এবং সাহেবদের জন্য দামি হুইস্কি। দেখতে দেখতে পুলকিত উচ্ছ্বসিতচতুর্বেদীর চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করে উঠেছে বারবার। আজ ধামাকাটা জমেযাবে ক্ক

:

ভার্মা সাহেব জিভ কেটে বলেন, ছিঃ, ধামাকা বলে না।এটা একটা ইমপর্ট্যান্ট ট্যুর। সুনডোরবোনের বাঁচা -মরা নির্ভর করছেএর ওপর।

প্রশ্পটা বাঁচা -মরার বলেই সম্ভবত মিঃচুতুর্বেদী সামান্য মনোযোগী হন, ব্যাপারটা একটুখানি বুঝিয়ে বল ইয়ার।

তখন কাজু সহযোগে হুইস্কি পান পলছিল। জাজিম -পাতাপ্ল্যাটফর্মের ওপর সুদৃশ্য ট্রে-তে হুইস্কির জোড়া - বোতল এবং মিনেরেল ওয়াটার, হাতে হাতে ফিনফিনে কাচের গ্লাসগুলি.....রোদ্দুর পড়েঝিলিক মারছিল ওদের শরীরে। আর, মিঃ পালের ব্যস্ততা ক্রমশ বেড়েই : যাচ্ছিল। লঞ্চের নিচের তলা থেকেপারসে মাছ ভাজবার সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল নোনা হাওয়ায়।
ভার্মা সাহেব মাঝেমাঝেই বলে উঠছিলেন, অ্যাতোছোটাছুটি করেছেন কেন, পাল ঞ্জ চেয়ারখালি রয়েছে, বসুন।
এনজয় করুন।
খুব গদগদ হাসিতে মুখ ভরিয়ে পাল বলে ওঠেন, এনজয়তো করছি স্যার।
মিঃ চুতর্বেদী খুব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকানমিঃ ভার্মার দিকে, সকলের এনজয় করবার ধরন তো একরকম নয় ইয়ার।
----না, না, সবাই তো আমরা এনজয় করতেইএসেছি.....। বলেই পরমূহূর্তে তা ভুলে গিয়ে মিঃ পালকে একটা ফরমাশকরে বসে ন মিঃ ভার্মা।
:
হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে ভার্মা সাহেব আজকেরট্যুরটার গুরুত্ব বোঝাতে থাকেন চতুর্বেদীকে। বলেন, এনটায়্যারসুনডোববোনেব . টোট্যাল রিসোর্সেস, তার ল্যান্ড ওয়াটার ফ্লোরা, ফোনা,তার একজিস্টিং : ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ...টেকেন টুগেদার.....একটাইনটিগে ট্রেড প্রোজেক্ট ফর টোট্যাল ডেভলপমেন্ট .....ভার্মাসাহেব আত্মপ্রসাদের : হাসি হাসেন,একটা মিটিং ডেকেছি সজনেখালির ট্যুরিস্টলজে। যেসব গম্মেন্টডিপার্টমেন্টগুলি এই এলাকায় কাজটাজ। আফটার ওল, একা-একা মানুষেরভালো করা যায় না। অ্যা সিঙ্গল স্প্যারো কান্ট ব্রিং দ্য স্প্রিং।
মিসেস ভার্মা আর মিসেস চতুর্বেদীর মন ছিল না ওসবে।কতক্ষণ আর ওইসব ভারী ভারী আলোচনা চালাবে বাপু ক্ক
মিসেস চতুর্বেদী বলে ওঠেন, মানুষের ভালোকরবার কথা বলছ, সুনডোরবোনে আবার মানুষও থাকে নাকি ঞ্জ
মিসেস পাল, বসেই রয়েছেন বটে, কিন্তু দুই মহিলাকেবল নিজেদের মধ্যেই গল্প চালিয়ে যাচ্ছেন সারাক্ষণ। মিসেস পালের সঙ্গে : কদাচিৎ কথা বলছেন। মিসেস পালচুপটি করে বসে বোবার মতো শুনছিলেন ওঁদের কথাবার্তা। মিসেস চতুর্বেদীরপ্রশ্নটা শুনে ক থা বলবার একটা সুযোগ পেয়ে যান বুঝি। বলেন, সে কী ক্ক সুন্দরবনে মানুষ থাকে
নাকি ঞ্জ
মিসেস চতুর্বেদী আকাশ থেকে পড়েন, আমরা তোচিরকাল শুনে আসছি, সুনডোরবোনে বাঘ থাকে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।
শোনামাত্রই বাচ্চাগুলোর গা ছমছম উচ্ছ্বাস, বাঘদেখতে পাব তো আঙ্কল ঞ্জ :
ভার্মা সাহেব মৃদু হেসে এড়িয়ে যেতে চানপ্রসঙ্গটা । তাই দেখে মহিলাকুল নাছোড়বান্দা। মিসেস ভার্মা ভ্রূসঙ্গমে অপরূপঢেউ তুলে বলেন, তুমি কিন্তু এদের কমিট করেছ। য়্যুপ্রমিস্ড..... ক্ক
:
অরবিন্দ চতুর্বেদী হলেন ভার্মা সাহেবের ছেলেবেলারবন্ধু। একসঙ্গে পড়াশোনা। একটা বিশাল প্রাইভেট কোম্পানির ভারিঅফিসার চতুর্বেদী। বছর দুয়েক আগে কোলকাতায় বদলি হয়ে আসায়দু-বন্ধুতে একেবারে নরক গুলজার। চতুর্বেদীর স্ত্রী গায়ত্রীও কবে কবে খুববন্ধু হয়ে গেছে মিসেস ভার্মার। সেই কারণেই জেলা সদরে বদলি হয়ে আসার পরথেকেই চতুর্বেদীকে তাড়া দিচ্ছিলেন ভার্মা সাহেব, চলে আয়, তোদেরসুনডোরবোন দেখাব। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। অ্যাতো দিনে সময় হল ওদের।
:
স্ত্রীর, মিষ্টি অনুযোগে খুব বিপাকে পড়ে যানভার্মা সাহেব। হ্যাঁ, কমিট তো করেইছি। আসলে, বাঘ দেখা, ইনফ্যাক্ট, অম্যাটার অব্ চান্স। আমি তো কম বার এলাম না...., বাট....।
----দেখেননি ঞ্জ বাঘ ঞ্জ মিসেস চতুর্বেদীর দু-চোখে ভরাট কৌতূহল,-----একবারও না ঞ্জ
ভার্মা সাহেবের চোখেমুখে চাপা অস্বস্তিস্মৃতিতে প্রাণপণ হাতড়াতে থাকেন,
-----একবার.....মনে হচ্ছে.....দেখেছিলাম...এক লহমারজন্য.....। চোখের ভুলও হতে পারে। আসলে, হোগলা -হেতালেরঝোপ গুলোতে এমন গা মিশিয়ে থাকে ওরা, ... ভুল হয়ে যায় দেখায়।
-----দেখিস নি ভাবছিস কেন ঞ্জ আলবৎদেখেছিস। অত পেসিমিস্টিক কেন তুই ঞ্জ সহসাচতুর্বেদী উত্তেজিত, ----না : দেখলেওভাব , দেখছিস । তুই কি জানিস, চোখের এই দেখা না দেখার মধ্যে কত রহস্যলুকিয়ে থাকে ঞ্জ আমাদের শাস্ত্র - পুরাণে তো বলেইছে ব্রহ্মসত্য, জগৎ নিথ্যা। এই চারপাশের যা - কিছু দেখছি আমরা, এই গাছ -গাছাল,হোগলা-হেতালের বন, এই নদী, আকাশ, তুহ , আমি, সবই নাকি অলীক মায়া।কিছুই নাকি বাস্তবে নেই।
-----তোর ঐ অলীক মায়ার তালিক ায় কি গায়ত্রীওরয়েছে ঞ্জ নাকি স্রেফ তোতে -আমাতেই তালিকা শেষ ঞ্জ
----না, না, ঠাট্টা নয়। চতুর্বেদী তিলমাত্র ঢিলেদিতে চান না। একেবারেই টানটান হয়ে থাকেন তিনি। ----ব্যাপারটা ভাবতেগেলে.. ...., সারা বিশ্বব্রহ্মান্ডজুড়ে এই যে.....।

----অ্যাই, অ্যাই অর্বিন্দ, তোর হলোটা কি ঞ্জ হঠাৎএমন দার্শনিক হয়ে উঠলি কেন ঞ্জ
----মাঝে মাঝে ওকে ফিলোসফিতে পায়। পাশ থেকেফুট কাটেন গায়ত্রী।
----ফিলোসফিতে পায় ঞ্জ চতুর্বেদীকেসহসা তর্কে পেয়ে বসে, ----ফিলোসফিটা খারাপ জিনিস ঞ্জ
-----খারাপ কে বললে ঞ্জ সোপেনআওয়ারেরসেই বিখ্যাত উক্তিটা ইয়াদ কর্, দর্শনচর্চা হল, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাত্রিতে একজন অন্ধলোকের এমন একটি কৃষ্ণকায়বেড়াল খোঁজা, যে বেড়ালের অস্তিত্ব বাস্তবে নেই।
----তাহলে তুই কি বলতে চাস যে, জীবনে দর্শনেরকোনোই মূল্য নেই ঞ্জ
----থাকলেও, এখানে, এই ঘোর সুনডোরবোনে, সবদর্শনই মূল্যহীন।
----ঠিক। এখানে ব্যাঘ্র - দর্শনই একমাত্র দর্শন। পাশথেকে পুনরায় ফুট কাটেন গায়ত্রী।
----রাইট, ভেরি রাইট। মিসেস ভার্মা সারাশরীর দুলিয়ে সায় দেন, ----তোমার মিটিং ক-টায় ঞ্জ
---ডেকেছি তো একটায়। ভার্মা সাহেব হাতঘড়িরদিকে এক ঝলক তাকিয়ে সময় দেখে নেন,
----বোধকরি পৌঁছতে পারব না।
---ওখানেই তো লাঞ্চ ঞ্জ
---হ্যাঁ, লাঞ্চ সেরেই মিটিংয়ে বসব। দুটো -আড়াইটে বাজবে।
লঞ্চ চলছিল ঢিমেতালে। হাওয়া বইছিল ফুরফুরিয়ে।চোখের সামনে দিয়ে ধীরলয়ে সরে সরে যাচ্ছিল প্রকৃতি। বাইনোকলারঘন ঘন হাত বদল হচ্ছিল। ক্যামেরায় সাটার টেপা টলছিল ঘনঘন। হুইস্কির বোতলটাখুলতে খুলতে চতুর্বেদী বলেছিলেন, রাতে কি লঞ্চেই থাকছি ঞ্জ
---সেটা কিঞ্চিৎ রিস্কি : আমার মতো। ভার্মা সাহেব বলেন, ---পাখিরালয় জেলা পরিষদেরবাংলো বুক করা রয়েছে। এবার তোমারই ডিসাইড কর, লঞ্চে নাকিবাংলোয়।
----বাঘ নাকি সাঁতরে সাঁতরে চলে আসে লঞ্চে ঞ্জ
----নিঃশব্দে তার নির্বাচন করা শিকারটিকে নাকিতুলে নিয়ে যায় ঞ্জ অন্যেরা নাকি জানতেই : পারে না ঞ্জ
----না বাববা....। খুব ভয় মেশানো আদুরে গলা মিসেসচতুর্বেদীর, --অত সাহস দেখিয়ে কাজ নেই। বাংলোই ভালো।
----অবশ্য লঞ্চে থাকলে রাতের বেলায় চাঁদেরআলোয় বাঘ দেখবার সুযোগ থাকত। চতুর্বেদী বলেন।
---চাঁদের আলো কই ঞ্জ ভার্মাসাহেবের চোখেমুখে টিটকিরি, ----কৃষ্ণপক্ষ চলছে। পূর্ণিমারঢের দেরি।
----ক-দিন অপেক্ষা করে পূর্ণিমার দিনে এলেইহত। নিসেস চতুর্বেদীর গলায় আক্ষেপ ।
---ওরেববস ক্ক চোখকপালে উঠে যায় ভার্মা সাহেবের, ----ঐ সময়ে লঞ্চ ফ্রি পাওয়া অসম্ভব।
---কেন ঞ্জ
---ঐ দিনগুলোতে ভি-ভি-আই -পিদের ট্যুরথাকে সুনডোরবোনে। তাদেরও তো এলাকার কিছু কিছু উন্নতি করতে সাধ : যায়, না কি ঞ্জ ভার্মাসাহেব হো-হো করে হসে ওঠেন ।
:
মিটিংটা যতখানি সময় নেবে বলে ভাবা গিয়েছিল,ততটা সময় নিল না। একে তো সজনেখালি পৌঁছতে দুটো বেজেগিয়েছিল..... সুধন্যখালির ওয়াচ-টাওয়ারে মহিলাকুল আর বাচ্চারা অনেকখানিসময় নিয়ে নিল, বাঘ না দেখে নামতেই চায় না কিছুতেই। বাঘ অবশ্য : দেখা দেয়নি শেষ অবধি। দুঃখী মুখ করে বনবিভাগের যেসব রক্ষীরা প্রায় লুকিয়ে বসেছিল ওয়াচ-টাওয়ারেরঘেরাটোপ, তাদের থেকেই তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালান মিসেস ভার্মাআর মিসেস চতুর্বেদী।
----তোমরা কি এখানেই থাকো ঞ্জ
----দিনের বেলায় এখানে, রাতের বেলায় লঞ্চে।
---রাতে বাড়ি ফেরো না ঞ্জ
লোকগুলোর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, তাওবিড়বিড় করে জানায়, তাদের বাড়ি : অনেক দূরে । : মুর্শিদাবাদে,কারো বা বীরভূমে কিংবা মেদিনীপুরে।
----বাড়ি যাও না ঞ্জ
----মাসে একবার যাই, মাইনে পেলে।
----এদের কী মজা ক্ক বাচ্চাগুলোকলকলিয়ে ওঠে, ----রোজ রোজ বাঘ দেখতে পায়। মিসেস চতুর্বেদী শুধোন, তা-ই ক্ক রোজই বাঘ দ্যাখ তোমরা ঞ্জ
লোকগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মিসেসচতুর্বেদীর দিকে। গলায় খুব উষ্মা ফুটিয়ে বলে, আমরা বাঘ দেখতেচাই নে।
----ও মা, কে-ন ঞ্জ বিস্ময়েদু-চোখ কপালে তোলেন মিসেস ভার্মা।
ওরা জবাব দেয় না। চুপ করে বসে থাকে। চোখে-মুখে বিদ্বেষ জমে।

ভার্মা সাহেব ইংরাজিতে প্রাঞ্জল করেনব্যাপারটা। আসলে, নিজের চাকরিটাকে খুব কম লোকই ভালোবাসতে পারে।এদের চাকরিই হল, বাঘ দেখা।

এক সময় ওদের একজন সামান্য অস্থির হয়ে ওঠে।বলে, বেশ আমরা বসেছিলাম চুপচাপ, আপনারা এসে সোরগোল তুললেন,.... ...বাঘেরা জেনে গেল, এই টাওয়ারের ওপর : মানুষ রয়েছে। আপনারা তো একটুন বাদে চলে যাবেন, আমাদেরবিপদ গেল বেড়।

বলতে বলতে লোকটা খুব দুঃখী - দুঃখী হাসল।

সজনেখালিতে পৌঁছতে পৌঁছতে লাঞ্চ প্রায়ঠান্ডা হওয়ার উপক্রম। কাজেই, লাঞ্চটা সেরে নিয়ে মিটিং শুরু করতেপ্রায় তিনটে বেজ গেল। ট্যুরিস্ট-লজের কোনো ঘরে একটুখানিগড়িয়ে নিতে চাইছিলেন মহিলারা, কিন্তু সে সময় আর পেলেন না, শীতের বেলা।সাড়ে-তিনটের মধ্যে বেরোতে না পারলে পাখিরালা পৌঁছতে অন্ধকার হয়েযাবে।

:

২.

জেলা পরিষদের বাংলোতে, গ্রিলঘেরাপ্রশস্ত বারান্দায় বেশ জুত করে বসেছেন সবাই। যে লোকটা ট্রে-তেকরে জল নিয়ে এল, ভার্মা সাহেব দেখে বোঝেন, কেয়ার -টেকার নয় সে।কেয়ার-টেকারকে চেনেন তিনি। ইতিমধ্যে দুচার বার এসে থেকেছেন এইবাংলোতে । জেরা করে বুঝতে পারেন, কেয়ার-টেকারের মাসতুতো ভাই।বাজিতপুরের দিকে বাড়ি। শীতের মরসুমে সাহেব -সুবোদের ভিড় বাড়েবাংলোতে। রান্নাবান্না, চা-জলখাবার, বিছানাপাতা, ফাই- ফরমায়েশ,----কেয়ার ---টেকার একা সামাল দিতে পারে না। মাসতুতো ভাইটিকেসেই কারণেই ডেকে নিয়েছে মাস -দুয়েকের তরে।

গ্লাসভর্তি ট্রে- খানা সেন্টার - টেবিলে সসম্ভ্রমেনাবিয়ে দিয়ে ধীরপায়ে চলে যায় লোকটি। একটুবাদে ট্রে-তে করে চায়েরকাপ আর কাজুর প্লেট নিয়ে পুনরায় হাজির হয়।

লোকটাকে খুব : নিবিষ্ট মনে দেখছিলেন ভার্মা সাহেব। খুব যান্ত্রিক হাতেপ্রত্যেকের সামনে চায়ের কাপ সাজিয়ে দিচ্ছিল সে। মুখের অসংখ্য জটিলরেখায় ভাঙচুর হচ্ছিল ঘনঘন। এই ধরনের মানুষেরা : খুবই মিস্টিরিয়াস হয়। আপাত ভাবলেশহীন মুখ দেখে ভতরের জোয়ার ভাঁটা আন্দাজ করা যায় না তিলমাত্র।

এক টুকরো কাজু প্লেট থেকে তুলে নিয়ে অলস : দাঁতে কাটতে কাটতে ভার্মা সাহেবশুধোন, নাম কি ঞ্জ

লোকটা জবাব দেয় না। কী যেন ভাবতে থাকে।এদিক-ওদিক তাকায়। এক সময় খুব : অস্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করে, রতিকান্ত।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাহেব-মেমসাহেবরা সমবেতভাবেঅট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। ভার্মা সহেব হাসেননি। অধস্তনদের সামনে এমন কথায়কথায় হেসে ওঠা তাঁকে মানায় না। বরং আচমকা এমন সমবেত খ্যা-খ্যা হাসিতেতাঁর সযত্নলালিত ব্যক্তিত্বের বলয়টিতে সামান্য টোল পড়ে বুঝি। এক ধরনেরঅস্বস্তি ফুটে ওঠে সারা মুখে।

নাম বলবার সঙ্গে সঙ্গেই হুজুরেরা অমন অট্টহাসিতে ফেটেপড়লেন কেন, রতিকান্তর মগজে তা ঢোকে না বুঝি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে। মনে মনে ভয় পেয়ে যায়।

----কত মাইনে পাও ঞ্জ চতুর্বেদীখুব তাচ্ছিল্য : সহকারে শুধোন।

সহসা খুব উদাস হয়ে যায় রতিকান্ত । খুবধীরলয়ে মাথা দোলাতে থাকে দুদিকে, মাইনা - টাইনা পাই না।

চতুর্বেদী প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করেন।সরকারি প্রশাসনের অন্ধিসন্ধিতাঁর একবোরেই অজানা। একটা লোক বিনেমাইনেতে কেন কাজ করে, সেটা তাঁর মাথায় ঢোকে না। বলেন মাইনে ছাড়াইকাজ কর তুমি ঞ্জ

ভার্মা সাহেবকে বাধ্য হয়েই নাক গলাতে হয় ইংরেজি ও হিন্দি সহযোগে তিনি চতুর্বেদীকে বুঝিয়ে দেন, কেমন করে মাইনেছাড়াও সরকারি প্রশাসনে কত কিসিমের : ইনসেনটিভ চালু রয়েছে : এদের জন্য। কেমন করে মাইনে না নিয়েও প্রায় সমপরিমাণ অর্থ : একজন মানুষকে পাইয়ে দেওয়া সম্ভব।কিন্তু চতুর্বেদীর মাথায় সহজে ঢুকতে চায় না সে অঙ্ক। ভার্মা সাহেবনাচার : হয়ে বলেন, ধর, এই যে আমরাচা খাব এখানে, এই লোকটাই বানাল, পরিবেশন করল। দশ কাপ চা, বাজার দরেদাম নেবে. লাভ রইল অর্ধেক। দব, রাত্তিরে এই বাংলোয় যারা থাকে, খায়,তাদের রান্নাবান্না করে দিল। মিলপিছু দর ধরলে বেশ কিছুটা নাফা থাকে।নিজের খাওয়াটাও ওই সঙ্গে হয়ে যায়। তারপর ধর, বাংলোর পর্দা, চাদর,তোয়ালে, লেপ-বালিশের ওয়াড়, ইত্যাদি কেচে, ধুয়ে ইস্ত্রি করে নিল এরাই,লন্ড্রির দরে বিল করল । বাংলোর ভেতরে ঝোপ -আগাছা সাফ করল,লনের ঘাস ছাঁটল, লেবার চার্জ বাজার দরে ওরাই পেল। এছাড়া, বখশিস বাবদ সদাসর্বদা টাকাটা সিকিটা তো রয়েছেই।

:

: আলোটনাটাপ্রায় গবেষণার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে দেখে বাদ : সাধেন নিসেস ভার্মা।-----

হয়েছে, হয়েছে, অফিসের কিস্যা থামাও। সারক্ষণশুধু অফিসের কথা ক্ক এমন কাজপাগল মানুষ জন্মেও দেখিনি

বাবা ক্ক বলতেবলতে আহ্লাদের - আহ্লাদে মাখো - মাখো হয়ে আসে মিসেস ভার্মার মুখ। বলেন, তারচেয়ে ওকে শুধোও না, এই এলাকায় বাঘ রয়েছে কিনা। এরা তো বারোমাসতিরিশ দিন থাকে, বলতে পারবে ঠিকঠিক।

ভার্মা সাহবে এক ঝলক দেখেন রতিকান্তকে।শুধোন, বাড়িতে কে কে আছে ঞ্জ
আবার ভাবতে বসে রতিকান্ত। চোখেমুখে এমনঅভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে, যেন এই প্রশ্নটার জবাবের জন্য তাকেস্মৃতিরভান্ডারটিকে হাতড়াতে হচ্ছে। একটুবাদে ফিসফিসিয়ে বলে,বউ.....বাচছা.....।
----জমি -জিরেত রয়েছে ঞ্জ
রতিকান্ত কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সাহায্যের আশায়চারপাশে আলুথালু তাকায়। শেষে সারা মুখে প্রায় নাক ঝাড়বার মুদ্রাফুটিয়ে বলে, নাহ্।
---চলে কেমন করে ঞ্জ
রতিকান্ত কেমন যেন ডুবে যেতে থাকে নিজেরমধ্যে। ডুবেই : থাকে অনেকক্ষণ।একসময় ভুস করে ভেসে ওঠে বলে, চলে : না।
বাংলোর আসল কেয়ার-টেকার হরিপদ। জলখাবারসাজিয়ে নিয়েহাজির হয় এতক্ষণে। সমবেত জেরার হাত থেকে ওই বাঁচায় : রতিকান্তকে। বলে, যাহ্, যাহ্মুরগিটা কেটে ফ্যাল্ দিনি।
রতিকান্ত ধীরপায়ে চলে যায়।
---আজ কী রাঁধবে, হরিপদ ঞ্জ
নিজের নামটা সাহেবের অমন ঠিকঠাক মনে আছে,এতই বুঝি কৃতার্থ হয়ে যায় : হরিপদ।গদগদ গলায় বলে, মুগের ডাল, পোটাটা চিপ, মটর - পনির , চিকেন,চিংড়ির মালাইকারি, আর স্যালাড, হুজুর। ভাত চাপাটি দুইই থাকবেনি।
হরিপদকে ভারী সাদামাটা লাগে সকলের। কোনোমারপ্যাঁচ নেই কথাবার্তায়, অভিব্যক্তিতে। কোনো মোচড় নেই গলার স্বরে ।অমন : মানুষের : প্রতি বড় একটা মনোযোগ দিতে চায়না কেউই। কাজেই, হরিপদকে ছেড়ে ধীরে ধীরে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়সবাই ।
শীতটা যতখানি পড়বে ভাবা গিয়েছিল, ততটাপড়েনি । খাওয়া-দাওয়ার পর সামনের গ্রিলঘেরা বারান্দায় প্রাক্-শয্যাগুলতানি। টুথপিক দিয়ে দাঁতের মধ্যেকার মাংসের কুচিগুলিকে নিপুণহাতে বের করে আনছিলেন ভার্মা সাহেব। এমনি সময়ে রতিকান্ত আসে ।
মিসেস চতুর্বেদীর ফরমায়েশ মতো জলের জাগ আরগ্লাস এনে সামনের সেন্টার -টেবিলে নাবিয়ে দেয়। চলে যেতে চাইছিল,চতুর্বেদীই থামান ওকে। ----রতিকান্ত, শোন।
রতিকান্ত থমকে দাঁড়ায়। তখন লোডশডিংচলছে। হ্যারিকেনের তেরচা আলো এসে পড়েছে ওর মুখের ডানদিকে।বঁ-দিকটায় নিকষ অন্ধকার। সব মিলিয়ে রতিকান্তর মুখখানাকে বড়ইরহস্যময় লাগে।
ভার্মা সাহেব আর চতুর্বেদী, সারা সন্ধে বেশিমাত্রায়পান করেছেন দু-জনেই। ওদের সসম্ভ্রমে সঙ্গ দিয়েছেন পাল : সাহেব। বাংলায় দ-খানা মাত্তর ঘর। কাজেই, পাল সাহেবের থাকবারব্যবস্থা লঞ্চে। রাতের খাওয়া সেরে পাল সাহেব সস্ত্রীকে চলে গিয়েছেন লঞ্চ।হরিপদ ওঁদের পৌঁছাতে গিয়েছে।
রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতটাও বাড়ছে। কনকনেহাওয়া বইছে। উত্তুরে হাওয়া। গ্রিলঘেরা বারান্দায় বসে ঢুলুঢুলু চোখেবাইরেটা দেখতে থাকেন চতুর্বেদী। বলেন, কী নির্জন লাগছে, তাই না ঞ্জ
ভার্মা সাহেব ঢুলুঢুলু হাসেন।
----এদিকে গ্রাম -ট্রাম নেই ঞ্জ লোকালয় ঞ্জ
----নাহ্। এই ঘোর জঙ্গলে আর গ্রাম কোথায় ঞ্জ ভার্মাসাহেব অনুমোদনের আশায় তাকান রতিকান্তর দিকে, ----কী হে, গ্রাম -ট্রাম আছে নাকি এদিকে ঞ্জ
----আছে ঞ্জ কটা ঞ্জ
----চারপাশেই রয়েছে হুজুর।
----তাতে মানুষ থাকে ঞ্জ
----থাকে বৈকি। অনেক মানুষ থাকে।
----কী বলছ ঞ্জ ভার্মাসাহেব রতিকান্তর প্রতি সামান্য বিরক্ত বুঝি, ----আমি তোকতবার এসেছি : এদিকটায়, একটা গ্রামওতো নজরে পড়েনি। খালি তো জঙ্গল। গ্রাম কই ঞ্জ মানুষকই ঞ্জ
রতিকান্তর সারা মুখে আলোআঁধারিছায়াখানি প্রকট হয়। চোখের মণিজোড়া সামান্য জ্বলে ওঠে। খুব চেরাগলায়বলে ওঠে, মানুষ কী করে দেখবেন, হুজুর ঞ্জ সুন্দরবনেতো কেউ মানুষ দেখতে আসে না। মানুষ দেখতে চায়ও না ।
----তবে ঞ্জ ভার্মাসাহেব ঢুলঢুল চোখে তাকান।
----সবাই বাঘ দেখতে আসেন, হুজুর । বাঘ।
বলতে বলতে দপ্ করে জ্বলে ওঠে রতিকান্তরচোখ। ক্ষণিকের তরে পশুর চোখের মতো নীলাভ হয় চোখের মণি।
এবং, ভার্মা সাহেবের মনে হয়, সুন্দরবনে এসে, বহুদিনবাদে, এই প্রথম, আচমকা বাঘ দেখে ফেলেছেন তিনি।

জীবন

রাজা

অ্যাই! নাম কিরে তোর?---

মোটা ফ্রেমের চশমা পরা, ঝাঁটার মত গোঁফওয়ালা, কোলাব্যাঙের মত মোটা, কালো ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন--- কি নাম? অ্যাঁ ---? এতক্ষণে বোঝা গেল ছেলেটা কথা বলতে পারে না। কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে অস্ফুট কয়েকটা শব্দ বের হয়।

নি:শব্দে, হাত পেতে ঘুরে ঘুরে, সকলের কাছে ভিক্ষা চাইছিল ছেলেটা। কেউ দিল, কেউ দিল না। সবার কাছে চাওয়া শেষ করে, সবাইকে অবাক করে দিয়ে জানালার ধারের একটা সিঙ্গল সীটে বসে পড়ল।

সেই সীটটাতে আগে থেকেই রঙ ওঠা নীল লুঙ্গী আর নতুন গোলাপী শার্ট পরা চিমড়ে চেহারার একজন বসেছিল। তাকে প্রতিবাদ করার কোনও সুযোগ না দিয়ে জানালার ধার ঘেঁষে বসে পড়ল ছেলেটা। বাইরের ছুটন্ত ছবি দেখতে লাগল।

ছোট বলেই হয়ত কিছু বলতে পারল না গোলাপী শার্ট। রিক্ত মুখে, যতটা সম্ভবত সরে বসে জায়গা করে দেয় বোবা ভিখারী বাচ্চা টাকে।

ঠিক দু-ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট দেরিতে ছুটছে ট্রেনটা। অনীক মনে মনে হিসাব করে নেয় হাতঘড়ি দেখতে দেখতে। বিরক্ত হয়ে কোনও লাভ নেই কারণ তাতে বিরক্ত হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। এই অসহ্য গরমে তাই,জায়গায় চুপচাপ বসে সিগারেট টানাই বুদ্ধমানের কাজ বলে ওর মনে হয়।

রামপুরহাট পর্যন্ত যাবে অনীক। এই গাড়িটাও। বর্ধমানে প্রায় পঞ্চাশ মিনি ট দাঁড়িয়েছিল। কেন? সে জানেনা। তবে এই ফাঁকে ও অবশ্য প্ল্যাটফর্মে নেমে খানিক পায়চারী করে একটানা বসে থাকার জড়তা কাটিয়ে নিয়েছিল।

একটা নামকরা ওষুধের কোম্পানীতে কাজ করে অনীক। এরিয়া সেল্‌স্‌ ম্যানেজার। মাইনেটা বেশ মোটাইপায়। তবে দায়িত্বও অনেক। বাবা-মা-র একমাত্র সন্তান সে। দমদম নাগের বাজারে নিজেদের বাড়ি। বাবা মানিক সেন আয়কর ভবনে বসেন। রিটায়ারমেন্টের এখনও কয়েক বছর দেরি আছে।

অনীক সামনের জুন মাসের এগারো তারিখে আটাশ বছর পূর্ণ করবে। সাড়ে তিন বছর আগে এই ফার্মে ঢুকেছিল সেল্‌স্‌ রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌ হয়ে। নিজের চেষ্টা আর যোগ্যতায় আজ ও উন্নতি করেছে। আরও করবে। অনেক উঁচুতে উঠতে হবে ওকে। ও তাই চায়। মা আবার এখন থেকেই মেয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। মাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

এই ট্রেনটা যে রোজই লেট করে অনীকের জানা ছিল। তবুও এই ট্রেনটাতেই উঠেছিল। আসলে, একটা চাপলে আর গাড়ি বদল করার ঝামেলা থাকে না। সরাসরি দমদম থেকে উঠে রামপুরহাট চলে যাওয়া যায়। বর্ধমান পর্যন্ত সাধারণত : ফাঁকাই যায় ট্রেনটা। বেশ হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে বসা যায়। তাছাড়া আজ কোনও তাড়া নেই। রামপুরহাটে একবার পৌঁছে গেলে স্টেশনথেকে সেজো পিসীর বাড়ি মাত্র সাড়ে চার মিনিটের হাঁটা পথ। চোখ বেঁধে দিলেও চলে যেতে পারবে। ছোটবেলা থেকে বহুবার এসেছে।

বর্ধমান থেকে ট্রেনটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে এসে লাফ দিয়েছিল ছেলেটা। নিজের সীটে বসে দেখেছিল অনীক। ছেলেটা বসে আছে তার উল্টো দিকের সিঙ্গল সীটে। গোলাপী শার্ট চিমড়ের সঙ্গে জায়গা ভাগাভাগি করে।জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

অনীক ভাল করে লক্ষ্য করে ছেলেটাকে। বয়েস --- তের- চোদ্দ হবে। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলে ধুলো লেগে খয়েরী রঙ ধরেছে। গায়ের রঙ--- আখরোটের খোলার মত। মুখে। নাকে পোষাকে যত্রতত্র লেগে রয়েছে কয়লার গুঁড়ো। কয়লার ওয়াগনে শুয়েছি

ল নাকি ? পরনের কাপড় দুটোর একটা যে ফুল্‌প্যান্ট, অন্যটা হাতকাটা স্যান্ডোগেঞ্জি, সেটা বুঝে নিতে এখনও ততটা কল্পনার দর কার হয় না। তবে আর কিছুদিন বাদেই হবে। ছেলেটার গলায় কালো সুতোয় বোনা একটা মালা। তা থেকে একটা মাদুলি আর এ কটা সেফ্‌টিপিন্‌ ঝুলছে।

---মাদুলিটা নিশ্চই ওর মা বেঁধে দিয়েছিল--- অনীক ভাবে। ---ওর মা এখন কোথায় ? সে কি আছে এখনও ? নাকি ছিল হয়ে গেছ ?--- অবান্তর প্রশ্ন। উত্তর জেনে বা না জেনে তার লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না। তাই ও নিয়ে আব ভাবে না অনীক।

বোবা ছেলেটা এবার ঘাড় ফেরায় কামরার ভেতরের দিকে। অনীক লক্ষ্য করে ছেলেটার চ্যাপটা নাক, মোটা মোটা ঠোঁট, বড়বড় চাখ আর তার চেয়েও বড়বড় চোখের পাতাগুলো। সে চোখে দীনতার লেশমাত্র নেই। একটু আগে ও যে ভিক্ষা চাইছিল সেটা যেন ওর দাবি ছিল। ওর খিদে ছিল। ওর খিদে পেয়েছিল তাই পয়সা চেয়েছিল। আবার খিদে পেলে আবার চাইবে। ওর স্বাভাবিক অধিকার যেন এটা। বোবা বাচচাটার চোখদুটো যেন সে কথাই বলছে।

মাছি তাড়ানোর মত , কাল্পনিক হাত নেড়ে অবান্তর ভাবনা-চিন্তাকে মন থেকে তাড়ায় অনীক। পাশে রাখাব্যাগ থেকে একটা সিনেমার পত্রিকা বের করে পাতা ওল্টাতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রূপোলী পর্দার রূপোয়মোড়া মানুষ মানুষীদের রূপ দেখতে আর তাদের হাঁড়ির খবর জানতে মগ্ন হয়ে পড়ে।

---ভিক্ষে দিয়ে এদের প্রশ্রয় দেওয়া হয় কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়--- নিখুঁত করে দাড়ি কামানো, মাঝখানে সিঁথি করা ঠেউ খেলানো চুল, বাটিকের পাঞ্জাবী পরা বছর পঁয়ত্রিশের একজন মন্তব্য করে। তার উল্টোদিকেবসা, সাদা তাঁতের শাড়ি পরা, একমাত্র সাদা চুলওলা বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করেই বাটিকের এই মন্তব্য। ভদ্রমহিলা বাচচাটাকে আটআনা দিয়েছিলেন অনীক দেখেছে। সে নিজেও দিয়েছিল আট আনা। আর একজন, বয়স্ক হিয়ারিং এইড লাগানো ভদ্রলোক দিয়েছিলেন তিরিশ পয়সা। আর কেউ কিছু দেয়নি। বাটিকের পাঞ্জাবীর মন্তব্যে সেই বৃদ্ধা নিরুত্তর থাকলেও মোটা, কালো ফ্রেমের চশমা পরা ঝাঁটাগুঁফো কিন্তু হাঁ হাঁ করে সায় দিয়ে উঠল। ---যা বলেচেন মশাই! এগুনোকে ভিক্কে দিয়ে দিয়ে ওবেবস খারাপ কারে দিচিচ আমরা। এরপর আর কাজ কোরে খাবার হচ্ছেই থাকবে না---

---আর বড় হলে যখন কেউ ভিক্ষে দেবেনা তখন চুরিছিনতাইপকেটমারি করে খাবে--- বাটিকের পাঞ্জাবী সিদ্ধান্তে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-চারজন সে মন্তব্যকে সমর্থন করে এবং অচিরেই, কিভাবে ভিক্ষে বা প্রশ্রয় না দিয়ে এইসব ভিখারি ছেলেগুলোকে কাজ জুতে দিয়ে একই সঙ্গে গরিবী হাঠানো এবং দেশের পার ক্যাপিটা ইন্‌কাম্‌ বাড়ানো যেতে পারে, আর তার ফলে দেশের গ্রস্‌ ন্যাশ্‌নাল্‌ ইন্‌কাম্‌ ও অনায়াসে বাড়িয়ে ফেলা সম্ভব, এই সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হয়ে যায় ছুটন্ত ট্রেনের শব্দকে ছাপিয়ে।

অস্ফুট শব্দ। বই থেকে চোখ তোলে অনীক। বোবা ছেলেটা ভিক্ষে করে পাওয়া আধুলি দুটো ঝাল - মুড়িওয়ালার সামনে নাটিয়ে অস্ফুট শব্দে আর ইঙ্গিতে তাকে ঝালমুড়ি বানাবার ফরমাশ করছে। ঝালমুড়ি বিক্রেতা কয়েন দুটো ভাল করে দেখেই--- হবে না--- বলে চলে যাচ্ছিল। বাটিকের পাঞ্জাবী তাকে ডেকে দু-টাকার দিতে বলল।

এরা যে একটাকার ঝালমুড়ি বিক্রি করে না অনীক জানে ! কমপক্ষে দু-টাকার নিতে হয়। একবার ভাবল দু-টাকা দিয়ে বাচচাটাকে একঠোঙা মুড়ি কিনে দেবে কিন্তু তারপরই মনে হল, সে তো পঞ্চাশ পয়সা দিয়েছে, আবার কি ? আরও তো অনেক লোক আছে এই কামরায়। তাদের তো কোনও দয়া নেই, ও একা কেন দরদ দেখাতে যাবে ?

বাটিকের পাঞ্জাবী ঝালমুড়ির ঠোঙায় মন দেয়। বাচচাটা মন দেয় বাটিকের খাওয়া দেখতে। অনীকও আবার রূপোলী জগতে ডুব মারে।

খানাতে এসে আবার দাঁড়িয়ে গেছে ট্রেনটা। পনের মিনিট হয়ে গেল। আর কতো ভোগাবে কে জানে। অগত্যা প্ল্যাট্‌ফর্মে নেমে পায়চারী। গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট থেকে একটা বের করে ধরায় অনীক। মোরেম বিছানো প্ল্যাট্‌ফর্ম্‌ ট্রেনের দরজা থেকে খানিকটা নিচে বাচচা ছেলেটা লাফ দিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে নামল।

স্টেশনের সীমানার পর থেকেই শুরু হয়ে গেছে ধানক্ষেত। এখন ধান কেটে নেওয়া হয়েছে। কাটা ধানগাথের গোড়াগুলো মাথা জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত ক্ষেতে। অনীকের চোখে পড়ে, বোবা ছেলেটা স্টেশনের টিউবওয়েল থেকে জল খাচ্ছে কলে মুখ লাগিয়ে। ভিখিরী গোছের অল্পবয়স্ক একটা মেয়ে টিউবওয়েল পাম্প করে দিচ্ছে।

---তবে হ্যা, সার্থক ফ্রীজ শটের কথা যদি বলতে হয় তো, নাইন্টিন ফিফটি নাইনে তোলা ক্রুফোর ফোরহান্ড্রেড্‌ ফোর হান্ড্রেড্‌ ব্লোজ্‌ ছবিটার কথা বলতেই হবে। তুমি দেখেছ ছবিটা ?---- গোল, সোনালী ফ্রেমের চশমা, হাঁটুর কাছে ছেঁড়া রঙ ওঠা নীল জীন্‌স্‌ আর রক্তলাল রঙ-এর গোলগলা টি শার্ট ছেলেটা। ফর্সা, বেঁটে একমাথা উস্কোখুস্কো চুল। গালে কয়েকদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ।

প্রশ্নটা যাকে করা হল, সেই মেয়েটার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে ঘন নীল জিনস্‌। গাঢ় সবুজ গোলগলাঢলা টি শার্ট। দু'জনের পায়েই ভোঁতামুখো, ফিতে বাঁধা বড় বড় জুতো। এরা শিয়ালদা থেকেই উঠেছিল বোধহয়। অনীক উঠে থেকেই এদের দেখছে। ছেলেটা তারই বয়েসী হবে। মেয়েটার কিছু কম। খুব সম্ভব বোলপুরে নামবে। ছেলেটা সমানে বক্‌বক্‌ করে চলেছে। সেই শুরু থেকেই, কুরোসাওয়াঘটকওজুপুদোভকিন--- রায়ফেলিনিরোনোয়াসেনআইজেনস্টাইনচ্যাপলিন্‌ চলছে। দুজনের সঙ্গে দুটো চামড়ার ব্যাক

প্যাক। পাশে রাখা ম্যাগ্‌নাম্‌ কোক্‌-এর বোতলচুমুক মারছে মাঝেমধ্যে ভাগাভাগি করে। ওদের গা থেকে বিলিতী পারফ্যুমের গন্ধ সারা কামরায় ছড়িয়ে পড়ছে থেকে থেকে। ওদের কথার মতন।

---ফোর্‌ হান্ড্রেড্‌ ব্লোজ্‌-এর প্রধান চরিত্র একটা বাচ্চা ছেলে--- হাঁটুছেঁড়ে জীন্‌স্‌ ঘননীল জীন্‌স্‌কে ব্যাখ্যা করতে থাকে হাতমাথা নেড়ে--- ছেলেটা, নাগরিক সভ্যতা, তথা পচনশীল সভ্যতার শিকার এখানে। রিফর্মেটরীতে ভর্তি করে দেওয়া হল তাকে শেষ পর্যন্ত। ছবির শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে ছেলেটা রিফর্মেটরী থেকে পালাচ্ছে। পালিয়েদৌড়াচ্ছে--- দৌড়াচ্ছে--- একসময় সে সমুদ্রের সামনে এসে পড়ে। সামনে আর পথ নেই। হতাশ ছেলেটা ঘুরে দাঁড়ায়। এই সমাজ, সভ্যতার মুখোমুখি। ঘুরে দাঁড়িয়ে ফের দৌড়ে আসছে ক্যামেরার দিকেই, অর্থাৎ যেখান থেকে সে পালাতে চেয়েছিল, সেদিকেই। তার দৌড়ের মাঝখানে, ঠিক এই জায়গায় ছবি শেষ হয়ে যায়। ফ্রীজশটে। --- ছেঁড়া জীন্‌স্‌ তার দুই হাতের বুড়ো আঙুল-এর সঙ্গে লম্বাভাবে সমকোণে অন্য আঙুলগুলোকে রেখে, বুড়ো আঙুল দুটোকে প্রায় মাথায় মাথায় ঠেকিয়ে পাক্কা চিত্রপরিচালকের ভঙ্গীতে হুউশ্‌ করে ঘননীল জীন্‌স্‌ের একদম মুখের সামনে নিয়ে যায় হাতদুটো। তাক বুঝে মুখ সরিয়ে না। নিলে নাকে গুঁতো খেত ঘননীল জীন্‌স্‌।

---জানো? স্বয়ং সত্যজিত রায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, এখানে ফ্রীজশটের ব্যবহার শুধু চমকপ্রদই নয়, গভীরভাবে অর্থপূর্ণও বটে। যাকে বলা যায় স্ট্রোক অফ্‌ জিনিয়াস্‌। ছেলেটার যাওয়ার আর কোনও পথ নেই। সুতুরাং যেযতই ছুটুক না কেন, সেটা থেমে থাকারই সামিল--- ছেঁড়া জীনস -এর ঠোঁটের কোণে ফ্যানা জমে ওঠে একসঙ্গে অনেক কথা বলতে বলতে। ---এখানে ছেলেটা যেন বলতে চাইছে, তোমরাই বলে দাও আমার মতন ছেলেদের সমস্যাকিভাবে? সত্যিই, ছবিটা দেখে, ছেলেটার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন--- কোক্‌ -এর বোতলে চুমুক মারে ছেঁড়াজীন্‌স্‌। ট্রেন ছুটে চলে.....

লেবু চা বিক্রি হয় এই লাইনের ট্রেনে। লেবু বাদ দিয়ে শুধু এককাপ লিকার কেনে অনীক। এককাপ দু-টাকা। বোবা বাচ্চাটাও অমনি আধুলি দুটো বের করে এগিয়ে দেয় চাওলার দিকে। একবার মুখের দিকে তাকিয়ে ওকেও আধকাপ চা ঢেলে দেয় চা-ওলা। প্লাস্টিকের চা-এর কাপটা দুহাতে ধরে, উজ্জ্বল চোখে সকলের দিকে তাকায় ছেলেটা। তারপর সোজা হয়ে বসে বুকের কাছে কাপটা ধরে ঘাড় বেঁকিয়ে মাথা নামিয়ে এনে অদ্ভুত ভঙ্গীতে চায়ে চুমুক দেয়। মাথা তুলে গর্বভরে তাকায় আবার, সকলের দিকে।

---এছেলে বড় হলে লিচয় পকেটমার হবে-- ছেলেটার সঙ্গে একই সীটে বসা গোলাপী শার্টের মন্তব্য। ভিখিরী বাচচার চা কিনে খাওয়া সহ্য করতে না পেরেই বোধহয় এই মন্তব্য করে গোলাপী শার্ট। তারপর সমর্থন পাবার জন্য সবার মুখের দিকে তাকায় একবার করে।

ঝাঁটাগুঁফো যথারীতি অগ্রণী ভূমিকা নেয় গোলাপী শার্টের সমর্থনে--- বড় হলে কি বলচেন? অ্যাকোনই পকেট কাটে হয়ত দেকুন গে! এগুনোকে কোনও বিশ্যেস আছে নাকি ?--- বলতে বলতে নিজের পকেটের ওপর একবার হাত বুলিয়ে দেখে নেয়। ---ও পকেটমার হবে না। আমরা ওকে পকেটমার বানাবো। বানিয়ে ছাড়বো, বুঝলেন?--- হিয়ারিং এইড্‌ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার মুখ খুললেন।

হিয়ারিং এইড-এর আচমকা প্রতিবাদে ঝাঁটাগুঁফো একটু থমমত খেয়ে যায় কিন্তু পরক্ষণেই--- তা কি করে বলচেন মশায়--- বলে তর্ক বাধাতে যায়। ---তুমি বেশি নাপ্‌তামো না মেরে এট্টু চুম্‌মেরে বসে দিনি! তোমাকে না পইপই করে বলিচি রাস্তাঘাটে বেশি কথা বল্‌বেনি?--- খ্যান্‌খ্যান ঝাঁঝালো গলা গুঁফোর বউ-এর । এতক্ষণ ছেলেকে ডিমসেদ্ধ খাওয়াচ্ছিল। এর আগে কলা খাইয়েছে দুটো। সেদ্ধ ডিমের টুকরো চারপাশে ছড়াচ্ছে ছেলেটা। বইয়েরধমক খেয়ে ভিজে মুড়ির মতন চুপসে যায় ঝাঁটাগুঁফো। হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গিয়েই বোধ হয়। ডানপাশের কাগজ পড়তে থাকা ভদ্রলোকের কাগজটা খামচে ধরে--- একটু নিচ্ছি--- বলে একটান মারে। কাগজের একটা টুকরো ছিঁড়েচলে আসে গুঁফোর হাতে।

ভদ্রলোকের জ্বলন্ত দৃষ্টি থেকে প্রাণপণে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে গুঁফো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। কিন্তু রেহাই নেই। বউ-এর আগুন চোখের সামনে এসে পড়ে সে। গুঁফোর খুব ঘুম পায় হঠাৎ। ঢুলতে থাকে বসে বসে।

প্লাস্টিকের চায়ের কাপটা দুমড়ে মুচড়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে আর একটা গোল্ডফ্লেক ধরায় অনীক। খানা স্টেশন থেকে ভিড় বেড়ে গেছে। ভীড়ের ঠ্যালায় লোকজন গায়ের ওপর এসে পড়ছে। অনীকের সীটে ভাগাভাগি করে বসে গেছে শিশু কোলে এক আদিবাসী রমণী। চিলতে মাত্র বসার জায়গা পেয়েই অনীকের দিকে পিঠ করেবাচ্চাকে মাই দিতে শুরু করে দিয়েছে। এরপর থেকে প্রতি স্টেশনেই এরকম আদিবাসী ক্ষেতমজুরদের দল ওঠানামাকরতে থাকবে।

বোবা ছেলেটার সঙ্গে যে একটা পলিব্যাগ ছিল অনীক খেয়াল করেনি। সীটের নিচে রেখে দিয়েছিল। বের করে আনল নিচু হয়ে। ব্যাগটাতে দুটো পাকা আম। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। একটা আম ব্যাগ থেকে বের করেছেলেটা। অনীক দেখল আমটার একদিক সম্পূর্ণ পচা। কালো হয়ে রস গড়াচ্ছে সেদিকটা থেকে। অন্যদিকটা অবশ্য ভালই মনে হচ্ছে। অন্য আমটারও নিশ্চয়ই একই দশা। না দেখেই অনুমান করে সে। কোনও ফলওলা বোধহয় দিয়েছে দয়া করে।

ছেলেটা আমের ভাল দিকটা বাগিয়ে ধরে মুখের কাছে নিতেই গোলাপী শার্ট হাঁ হাঁ করে তেড়ে ওঠে। --অ্যাই! খবদ্দার এখানে খাবি না। জামা কাপড়ে রস পড়বে। ঢুকিয়ে ফ্যাল্‌ শিগগীর! ---বোবা ছেলেটা একবার গোলাপী শার্টের দিকে, একবার অনীকের দিকে তাকায়। অনীক চোখ সরিয়ে নেয়। আমটাকে ব্যাগের ভেতর চালান করে ব্যাগটাকে ফের সীটের নিচে চালান করে দেয় ছেলেটা

। তারপর জানলায় থুতনি রেখে ছুটন্ত মাঠপুকুরক্ষেত গাছপালা রেললাইন টেলিগ্রাফের তার তারে বসা ফিঙে দেখতে থাকে এক মনে।
হঠাৎ ঘাড় ঘুড়িয়ে আবার, কামরার ভেতরের বসে দাড়িয়ে থাকা যাত্রীদের দিকে তাকায়। ফিক করে হাসে একবার। আপনমনে। আবার জানালার দিকে মুখ ফেরায়। অনীক লক্ষ্য করে ব্যাপারটা।
--কোথায় যাবে ছেলেটা? --কি নাম ওর? ---আসছেই বা কোথা থেকে? ---ও কি বাড়ি থেকে পালিয়েছে? ---বাড়ি কি আদৌ আছে ওর? ---শেষবার কখন খেয়েছে? ---আবার কখন পেট ভরে খেতে পাবে? --- হঠাৎ একগাদা প্রশ্ন ভীড় জমায় অনীকের মনে।
--মরুক গে যাক ! তার অত কিসের মাথাব্যাথা? এরকম বাচ্চা ছেলেমেয়ে কয়েককোটি ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দেশের রাস্তাঘাটে ট্রেনে বাসে আস্তাকুঁড়ে। সারা পৃথিবীতে অনেক অনেক বেশি। বড় হতে হতে এদের মধ্যে কেউ কেউ পেট বাঁচাতে কাজ জুটিয়ে নেবে যাদের সরকারী নাম হবে শিশু শ্রমিক আর বাকিরাও নানারকম কাজ জুটিয়ে নেবে পেট বাঁচাতে, তবে এদের সরকার স্বীকৃত নাম হবে শিশু অপরাধী বা শিশু যৌনকর্মী ইত্যাদি এবং এই শ্রেণীর শিশু অপরাধীরাই কাল দিনে পাকা অপরাধী হয়ে উঠবে কিন্তু এ সমস্যার কোনও সমাধান, অন্তত : এখনও নেই। ভবিষ্যতেও কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ । সুতরাং যে সমস্যার সমাধান নেই তা নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামাবার কোনও মানে হয় না।
শবীর ঘেমে চামড়া আর টি-শার্ট একাত্ম হয়ে আছে। পিসীর বাড়ি ঢুকেই কুয়োর ঠাণ্ডা জলে ভাল করে স্নান করতে হবে। অনীক মনে মনে পরবর্তী কর্মসূচী সাজাতে থাকে।
কিন্তু প্রশ্ন এড়াতে পারে না সে। --- ছেলেটা অমন করে হাসল কেন? ---ওর হাসিতে কি অনুকম্পা মেশানো ছিল? --বয়স্ক সমাজের প্রতি, বয়বৃদ্ধ সভ্যতার প্রতি অনুকম্পা? ফিরিয়ে আনে অনীক। ---না : ---কিছু ভাল্লাগছেনা--- কখন যে রামপুরহাট আসবে--- ট্রেনটা যে আর চলতে পারছে না--- ধুঁকতে ধুঁকতে কোনও রকমে এগোচ্ছে--- নেহাত না এগোল নয়, তাই---
সময় কাটানো এক সমস্যা এখন। বরং একটা খেলা যাক। এই খেলাটা আগেও অনেকবার খেলেছে অনীক। কোনও মানুষকে দেখে তার নাম কি হতে পারে সেটা কল্পনা করা। উদ্ভট এই খেলাটা একান্তই ওর নিজের সঙ্গে নিজের। তবে উদ্ভট হলেও, একা একা আসল মুহূর্ত কাটানোর পক্ষে দিব্যি খেলা একটা।
---ঐ চিমড়ে গোলাপী শার্টের নাম তো নির্ভুলভাবে ছিদাম--- আর ঐ বাবরি চুল বাটিকের পাঞ্জাবির নাম,হয় প্রণয় না হয় প্রাণনাথ হতে বাধ্য--- হিয়ারিং এইড্ এর নাম--- ম্‌ম্‌ম্ ওনার নাম নিশ্চই সন্তোষমোহন--- ঝাঁটাগুঁফোর বউ-এর নাম--- চামেলীবালা না হয়ে যায় না--- আর ঝাঁটাগুঁফোর নাম তো ডেফিনিট্‌লি গুরুগতি।
---আচ্ছা, এই বোবা ছেলেটার নাম কি হতে পারে? ---অনীক ভাবতে থাকে--- অপু? ---শালিক? ---জগ্নু? ---বুধন? --- রিচার্ড? ধনপত্ নাম হলে কেমন হয়? ---গরীব নাম হয় যদি?
নোআদার ঢাল। অদ্ভুত নাম স্টেশনের। এইসব ছোট ছোট স্টেশনেও চার - পাঁচ মিনিট করে দাঁড়াচ্ছে হতচ্ছাড়া ট্রেনটা। চা ওলা ডেকে আর এককাপ লিকার নিয়ে চুমুক মারে অনীক। ট্রেনটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় মিনিট তিনেক ধরে। হঠাৎ, বোবা বাচ্চাটা তার পলিব্যাগটা বগলে চেপে দরজার দিকে রওনা দেয়। যতদূর মনে হয়এটা ওর গন্তব্য ছিল না। ওর গন্তব্যের কোনও ঠিকই নেই হয়ত। এক্ষুনি হয়ত পাশের কামরায় উঠে ভিক্ষে করতে শুরু করবে। গন্তব্যজ্ঞানহীন ছেলেটাকে নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না। অনীকও না। স্টেশনের লোকজন আর তাদের ব্যস্ততা আর তাদের ব্যস্ততা দেখতে দেখতে অলস মুহূর্তগুলো পার করতে থাকে সে।
প্ল্যাটফর্ম যেখানে শেষ হয়েছে, তারপর থেকে কিছুটা ঢালু জমি নেমে গিয়ে সমতল ধানক্ষেতে মিশেছে। এইজন্যেই স্টেশনের নাম এর পেছনে ঢাল কথাটা রেখেছে কিনা কে জানে। স্টেশন থেকে নেমে যাওয়া এই ঢালটা বেশ খাড়া। জোয়ান লোককেও সাবধানে নামতে হবে, না হলে পা হড়কে যাবার সম্ভাবনা।
ঢালের শেষে আকাশমণি গাছের সারি স্টেশনের সীমারেখা এঁকে দিয়েছে। গাছের সারির ফাঁক দিয়ে যতদূর দেখা যায় ধানক্ষেত। এদিকের সব ক্ষেতের ফসল এখনও কাটা হয়নি। কাজ চলছে। হাওয়া এসে সোনালী ধানের শীষগুলোকে আদরে আদরে অস্থির করে তুলছে থেকে থেকে।
ধানক্ষেত আর আকাশ যেখানে মিশেছে, সেই দিগন্তরেখাকে কিছুটা আড়াল করে আছে কয়েকটা মাটির ঘর, তালগাছ আর অন্যান্য কয়েকটা বড় গাছ। ট্রেন থেকে দেখে আঁকা ছবি মনে হয়। একটা পুকুরও নিশ্চয়ই থাকবে ঐ ছোট্ট গ্রামটাতে। দিনের আলো ক্রমশ কমে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরেই গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যাবে এইসব ক্ষেত, গাছপালা শুধু গুটিকয় টিমটিমে আলো জ্বলবে স্টেশনে আর ঐ দূরের গ্রামটাতে। আর, এই দুইপ্রান্তের আলোর মধ্যবর্তী জমাট বিস্তীর্ণ অন্ধকারে সবুজ ছায়াপথ তৈরি করে মাঠে, গাছে গাছে উড়ে বেড়াবে অসংখ্য জোনাকি। ঝিঁঝির একটানা ডাকই হবে তখন একমাত্র পার্থিব শব্দ।
অনীকের চোখ চলে যায় স্টেশনের এক প্রান্তে। খুনখুনে এক বুড়ি, পরণে ময়লা থান, বগলে একটা কাপড়ের পুঁটলী। হাতে গাছের ডাল ভেঙে বানানো একটা লাঠি। বয়সের ভারে সামনে নুয়ে পড়েছে বুড়ি। স্টেশনের প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। একা একা নামতে পারছে না ঢালু পথটা। ভয় পাচ্ছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে অসহায় চোখে। লোকজন এমনিতেই কমে এই স্টেশনে। যারা আছে, তারাও নিজেদের মত যে যার দিকে চলে যাচ্ছে। কেউ ভ্রুক্ষেপ করছে না বুড়ির দিকে।

ট্রেন ছাড়ার বাঁশী বাজে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে দানব যন্ত্রসাপটা। অনীক জানালা দিয়ে দেখতে পায় হ
ঠাৎ, কোথা থেকে সেই বোবা ছেলেটা বুড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বুড়ির একটা হাত ধরে সাবধানে, আস্তে আস্তে পার করে দিচে
ছ ঢালু জমিটা। ছেলেটার অন্য হাতে ঝুলছে পলিব্যাগে দুটো আম। আধপচা। অনীক জানে।
প্রতি মুহুর্তে দূরে সরে যেতে থাকা সেই বালক, নুব্জ্যা বৃদ্ধা, দিগন্ত বিস্তারী ধানক্ষেত আর ক্রমশ : ম্লান হয়ে আসা দিনের আলোর ি
দকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অনীক। স্তব্ধ হয়ে।
--- ছেলেটার নাম হোক জীবন--- আপনমনে বিড়বিড় করে ওঠে সে।
প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিজের গতি বাড়িয়ে ছুটে চলে।
গন্তব্যের দিকে।

সমিরন

সৈয়দ শামসুল হক

গোলাম মোস্তফার কথার নাড়চড় কোনোদিন হয় না। মৃত্যুকালেও হয় নাই। জলেশ্বরী বাজারে তার শাড়ির দোকান। তাদের খদ্দের সকলে, টাউনের মানুষ সকল, পাড়াপড়শি, সকলেই জানে মোস্তফা এক কথার মানুষ। এই শাড়ি টাঙ্গাইলের তো টাঙ্গাইলেরই। এ ই শাড়ি পাঁচশো পঁচাত্তর তো পাঁচশো পঁচাত্তরই। মোস্তফার দোকানে কথাও পাকা, জিনিসও পাকা। দাম ও এক দাম। খদ্দের বুঝে বাকিও দেও সে। কিন্তু বাকি শোধ ঠিক টাইমে করা চাই। তাই বলে মন তার শক্ত নয়, যদিও বাইরে তার ভাবগম্ভীর লম্বা দাড়ি, শে াভন মুখ দেখে অচিরে তা ঠাহর হয় না। যদি শোনে মেয়ের জন্য প্রথম শাড়ি কিনতে এসেছে, বলার আগেই বিশ পঞ্চাশ টাকা কম রাখে। যদি দেখে, কোনো নারীর শাড়িটা পছন্দ খুব, কিন্তু টাকার টান! আমরা এমনও শুনেছি, শাড়িটা সে ওই টাকাতে দিয়েও দি য়েছে। আমরা যদি বলে উঠি, মুখের কথা বিশ্বাস করিলেন, চাচা? মোস্তফা বলে, জবান যদি কাঁইও খারাপ করে তো হিসাব দিবে ত াঁই হাশরে!

এক সময়ে মোস্তফার দোকানই ছিল জলেশ্বরীর একমাত্র শাড়ির দোকান। ঈদে পরবে ভালো শাড়ি খোঁজ করছেন? মোস্তফার দোক ান! বিবাহের বেনারসি চাই? মোস্তফার দোকানে চলো! হাতে টাকা নাই মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ি। বাকিতে শাড়ি পাওয়া যাবে ে মাস্তাফার কাছে! বাজারে এখন নতুন অনেক শাড়ির দোকান হয়েছে। সেসব দোকান আলোয়, আয়নায় ঝলমল করে। ফিটফাটযুব ক দোকানিরা নিজ দেহে শাড়ি জড়িয়ে ঢং করে দাঁড়ায়। কিন্তু মোস্তফার দোকান সেই সাবেক কালের। শান বাঁধা উঁচু মেঝে। তার ওপর ধবধবে সাদা চাদর পাতা। আর সকল দোকানের শোকেশে শাড়ি কাচের ঘেরে ঝরনার মতো শাড়ি ঝোলানো। মোস্তফার দো কানেবড়ো বড়ো ড্রায়ার - বন্দী শাড়ি। কী চাই, শুনে তবে শাড়ি বের করে মোস্তফা। শাড়ির পর শাড়ি মোস্তফাই মেলন করে ধরে চ াদরের ওপর। পুরুষ অঙ্গে শাড়ি জড়ানোর মতো বাচালতা তার কাছে নেই। শান বাঁধানো চত্তরটাই ফুলের বাগান হয়ে ওঠে শাড়ি তে শাড়িতে।

মোস্তফার দোকানে আগে জ্বলত হ্যাজাক, এখন ইলেকট্রিকের বাতি। কিন্তু আর সব দোকানের নতো সে আলো তেজি নয়। খদ্দেরে দের বসার জন্যে গদি - আঁটা বেঞ্চি বা চেয়ারও তার দোকানে নেই। চত্বরের ওপরেই থেবড়ে বসতে হয়। তবু তার দোকানে এখনে া সেই আগের মতোই ভিড়। মোস্তফার কথা, খরিদ্দার টানি আনে ইলেকট্রিকের লাইট নয়, শোকেসের ভুজুং ভাজাং নয়, খরিদ্দার আসে মহাজনের ব্যবহার দেখিয়া! মোস্তফার ভদ্র ব্যবহার কাক পক্ষীও জানে। এটা কাব্যকথা নয়! তার দোকানের সামনে ইলেকি ট্রিকের তারে নির্ভয়ে দলে দলে কাক বসে। মোস্তফা তাদের মুড়ি ছিটিয়ে দেয় দু-বেলা। তার সত্যবাদিতার কথাও টাউনের নারীসক ল জানে। ইন্ডিয়ার শাড়ি বলে বাংলাদেশের শাড়ি সে ঈশ্বরে বাজারে বিক্রি করে না।

মোস্তফার শাড়ির দোকান সেই পাকিস্তান আমলের। সেই সেবারের কথা, আমাদের তখন জন্মও হয় নাই। জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা নিল, মোস্তফাও শাড়ির দোকান দিল জলেশ্বরীর বাজারে। পাক শাড়িঘর। দোকানের মাঝখানে পাকা কাঠের থাম। সেইথাে ম ঝুলল আইয়ুব খানের ফটো। তারপর চান্দে চান্দে কত পূর্ণিমা অমাবস্যা যায়। বাংলাদেশ হয়। তখন কিছু নড়চড় হয়। দোকানের নাম বদল হয়। 'মুক্তি শাড়িঘর'! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মোস্তফা দেখে, নামটির ভেতরে যেন মুক্তিযুদ্ধের গন্ধ। শহরের কোনো কো নো মানুষ আর তার দোকানে আসে না। তখন সে আরো একবার নাম বদল ঘটায় দোকানের। 'নব শাড়িঘর'।

মোস্তফা বলে, নবই তো বাহে, নব কালে নব দোকান, নব শাড়িঘর। আমরা যদি বলি, মুক্তিযুদ্ধটা তবে আপনিও অস্বীকার করিলেন , চাচা? মোস্তফা বলে, রাজনীতির আলোচনা তোমরা করেন, হামাকে হামার দোকান করিবার দ্যান! কিন্তু এ-গল্প রাজনীতির নয়। মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে কে পক্ষে আর কে বিপক্ষে সে - অবতারণা এই গল্পে নয়। এই গল্প মোস্তফার মৃত্যুকালে তার একটি কথার সূত্রে এই গল্প শাড়ির মতো মেলন হবে আশা করি। শাড়ির অপর পিঠেনকশার মফস্বলটি থাকে আড়ালে। প্রকাশ্যে তা দেখার নয়। কিন্তু সেই নকশার অপর পিঠই থাকে অঙ্গের অধিক কাছে, একেবারে গাত্রস্পর্শ করে। শাড়ি যে পরে, সে শুধু বোঝে। এ- গল্পের সমাপ্তিও কেবল মোস্তফার কাছেই সত্য হয়ে থেকে যাবে। জগতের পৃষ্ঠএখনো আমরা যারা আছি, আমরা কেবল নকশার সদরটাই দেখি ।

আমরা দেখতে পাই, মৃত্যুকালেও মোস্তফার কথার নড়চড় নেই। সে যা বলেছিল তা-ই হয়। আমার আয়ু ঠিক ঠিক চাইর-কুড়ি বচ ছর! সাবেকি সেই কুড়ি হিসাবে মোস্তফা কখনো ভোলে নাই। দোকানের আয় আমদানি জমাখরচ হাজার কি লাখের হিসাবে সে ক রে বটে, মুখের কথায় কুড়ির হিসাব তার বড়ো স্বচ্ছন্দে ফোটে। চার কুড়ি বছরের অধিক সে বাঁচবে না, এই একথা তার মুখে আম রাও অনেকে শুনেছি। আমরা জানি, কুড়ির হিসাবে যারা সংখ্যা গোনে তারা চার কুড়ির অধিক হিসাব করতে পারে না। জলেশ্বরী তে এ আমরা এখনো বহু বুড়াবুড়ির ভেতরে দেখতে পাই। আমরা ধরে নিই, চার কুড়ি বছরই সে মাত্র বাঁচবে, মোস্তফার এ-কথাটি কুড়ির হিসাব চার পর্যন্ত বলেই। কিন্তু একদিন সত্যি নব শাড়িঘরের গোলাম মোস্তফা চার কুড়ি কিনা আশি বছর পুরো করেই এ-জগত থেকে বিদায় নেয়।

মৃত্যুকালে কোনো যন্ত্রণা হয় নাই তার। রোগভোগও এমন কিছুই নয়। তিনদিনের জ্বর শীতের কাল, বুড়া মানুষের জ্বরজারিহওয়া এ-সময়ে আশ্চর্য কিছু নয়। বাড়ির কেউ মোস্তফার জ্বরটাকে আমলেও আনে নাই। ভাতের বদলে চিনি দিয়ে রুটির ব্যবস্থা মাত্রহয়। শরীরও এমন কিছু টসকায় নাই। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও তার কাজ হয় নাই। ভরাভরতি সংসার তার। পাঁচ বেটা, তিন বেটি। দুইবেটা তো বাড়িতেই বাস করে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে। বেটিরাও কোনো দূরবর্তী টাউনেও নয়। জলেশ্বরীতেই তারা। জ্বর এতই সামান্য,বেটি আর জামাইদের খবর দেবার দরকাও কেউ মনে করে নাই। বেটারাও যে যার ধান্দায়। একজনের মনোহরি দোকান, একজনের আলুপটলের পাইকারি কারবার, একজন লেবারের সরদার, বাকি দুইজন বাপের নব শাড়িঘরেই কাজ করে।

মৃত্যুর আগের রাতে মোস্তফা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বেটাবেটির খোঁজ করে। তারা কই? কোন্ঠে তারা? মোর সময় যে আর নাই! এ-কথায় সকলেই মনে করে, বুড়ার মৃত্যুভয় ছাড়া আর কিছু নয়। সমান্যা শীতের জ্বরে কী মানুষের এন্তেকাল হয়? রাত বড়ো অস্থির তার ভেতর দিয়ে কাটে। এক কুড়ি বছর আগে মোস্তফার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। সে যদি বেঁচে থাকত, তবে সে নিশ্চয় টের পেত, স্বামীর এখন শেষ সময়। তার চেয়ে ভালো আর কে জানত যে মোস্তফার যে - কথা সেই কাজ। কতবার এর প্রমাণ সে পেয়েছে। হায়, আজ সেনাই!

তবে, বেটারা ফজর কালেই ছুটে আসে। ছোটো বেটা মজিদ গিয়ে প্রথম খবর দেয় বড়োভাই বশারকে। বশারের বাড়ির পাশেই বড়ো বোন পারুলের বাড়ি। পারুলকে নিয়ে সে বাপের কাছে আসে। আর সব বেটা বেটি জামাইরাও এসে যায়। তখনো ফজরের জামাতা বাজার মসজিদেও ভাঙে নাই। শয্যাগত গোলাম মোস্তফা বিস্ফারিত চোখ মেলে বেটাবেটি জামাই প্রত্যেকের মুখ দেখে। তারা সকলেই ঝুঁকে পড়ে বারবার বলে, বাপজান, কোন্ কষ্ট কন! এত কেনে উতলা হন? মোস্তফা এ - সব প্রশ্ন বা সান্ত্বনার কথা কানে ওনেয় না, জবাবও দেয় না। একটিও কথা সে বলে না। তখন বেটাবেটিদের ভয় হয়, এবার বিশ্বাস যেন হয়, মৃত্যু তার আসন্নই, জবান তাই বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রমে তার চোখ ছটফট করে ওঠে। একবার ঘরের ছাদের দিকে উলটে যায়, একবার দরোজায়। বেলা বাড়তে থাকে। ঘরের সাবেকি দেয়ালঘড়িতে সকাল আটটায় ঘন্টা বেজে ওঠে। অকস্মাৎ মোস্তফার স্বর ফোটে, ঘরঘর অস্পষ্ট সে - কথা। মৃত্যুপথগামী মানুষের চাপা বিকট সে স্বর। বালিশ থেকে ঈষৎ ব্যগ্রতায় মাথা তুলে মোস্তফা বলে ওঠে, মনে পোড়ায়! সমিরনকে খবর দিও!

তারপর তার মাথা ঢলে পড়ে। মুহূর্তের ভেতরে চোখ ঘোলা হয়ে আসে। বড়ো বেটা বশার বাপের চোখের পাতায় হাত রাখতেই চোখের পাতা পড়ে যায়। মোস্তফা তার কথা রাখে। চার কুড়ি বছর পুরো করে সে এ-জগত থেকে চলে যায়। বড়ো বেটি পারুল আছাড় খেয়ে বাপের বুকের ওপর ভেঙে পড়ে। আর বেটা বেটিরাও ডুকরে ওঠে। ঘরময় কান্না আছড়ে পড়ে। কিন্তু জামাইদের তরফ কোনো শব্দ ওঠে না। জামাইদের মুখে আমরা ঘোর ভ্রুকুটি লক্ষ করে উঠি।

এ এমন নয় যে, মানুষজনের সেই প্রচলিত কথা -- যম জামাই ভাগনা, এই তিন নয় আপনা! অতএব জামাইরা শ্বশুরের মৃত্যুতে কাঁদছে না! আসলে জামাই তিনটিই খুব ভালো পেয়েছিল মোস্তফা। বড়ো সম্মান করত তার শ্বশুরকে। কিন্তু তিন জামাইয়েরই মনে এখন অভিন্ন এক বিষম খটকা। বেটাবেটি না হয় বাপের সিথানে আজরাইলের ছায়া দেখে তরাসে কিছু ভালো করে শোনে নাই, তারা তো শুনেছে। এ কী শুনল তারা! মন পোড়ায়? মন পোড়ায় মনে কী? কার জন্যে পোড়ায়? সমিরণ? কে এই সমিরণ?

কিন্তু নগদ কাজ হাতে। এ - সকল কথার অবকাশ নাই। কাজও কী কম ? লাশের ঘোসল, কাফনের জোগাড়, জানাজা, দাফন। খবরও দিতে হয় বাজারে। গোসলের জন্যে মাতববর মানুষ খোঁজ করো। কুতুবুদ্দিনের মাজারের খাদেম সাহেবকে তালাশ করো, জানাজা তিনি পারবেন। এর ফাঁকে গোরস্তানে পছন্দ করা চাই। তারপরে আছে গোর খোদা। বাঁশের জোগাড়। আছরের আগেই মা

ট হওয়া চাই। লাশ বিলম্ব করা ঠিক নয়। বড়ো জামাই পারুলের স্বামী আকমল মোস্তফার বড়ো বেটা বশারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

তারপর ভালোভাবে সকলই শেষ হয়। জানাজাতেও বাজার ভেঙে মানুষ হয়। হো হো করে কাঁদে অনেকেই। মোস্তফার বিষয়ে ভালো ভালো কথা বলে প্রাচীনেরা। বাইরের মানুষ বড়ো আপশোস করে মানুষটার জন্যে। কিন্তু বাড়ির মানুষের কাছে ওই কথাটা শেষ হয় নাই। মন পোড়ায়! সমিরনকে খবর দিও!

গোরস্তান থেকে বাড়ি ফেরার পথেই বড়ো জামাই বলে ওঠে, আববা এ - কেন সমিরনের কথা কয়া গেইল হে! তার জন্যে বলে মন পোড়ায়! এ বড়ো কেমন কথা!

ছোটো জামাই শিমুলের স্বামী বলে, আরে নয় নয়! মুঁই ভাবিয়া দেখিছোঁ। সমিরণ নামে শাড়ি বাইর হইছিল ঢাকা হতে। নারী সকলের বড়ো পছন্দের শাড়ি। শাড়ির দোকানদার তো! সেই সমিরণ শাড়ির কথা আববাজান ভুলিবার পারে নাই?

মাঝের বেটি বকুলের স্বামী শ্বশুরের প্রতি বড়ো ভক্তিমান। অবসরে গল্পের বই কবিতার বই দু-একখানা পড়ে। সে বলে, হবার তো পারে! কিন্তু এ-কথা নিয়া আন্দোলন না করো। আর কী কইতে কী কইছে আববা, তারে বা ঠিক কী ? জগত হতে যাবার সময় মানুষের মন পোড়ায়, এটা কোনো আচচয্যের কথা নয়। সমিরন মানে হাওয়া বাতাস। এ - সব কথা বাতাসে ভাসিয়া যাওয়া ভালো!

যতই সে হাওয়া বাতাস বলুক, কথাটা মিলিয়ে যায় না অচিরে। বরং দিনে দিনে পাথরের মতো ভারী হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বড়ো বেটা বশারের মনে। সে অবাক হয়ে যায়, বাপের ওই শেষ সময়ে যদিও পরিবারের তারা ভিন্ন আর কেউ উপস্থিত ছিলো না, কথাটা কী করে বাজারে সবার কানে গেল! সব দোকানে, সব আড্ডায় ওই এক কথা। সমিরন! শাড়ির নতুন দোকানগুলোতে বিশেষ করে খুব হাসাহাসি কানাকানি চলছে। সমিরণ? আরে, খোঁজিয়া করি দ্যাখো, সমিরণ নামে রসের কেউ ছিল বুড়ার। বই তো কুড়ি বচ্ছর আগে কববরে গেইছে। তা বলিয়া বুড়ার রস তো আর মনের নাই। রস ঢালিবে কোথায়? দ্যাখো কাউকে খুঁজিয়া নিছে। তারে নাম সমিরন!

জামাই তিনজন বাড়িতে এই বিবরণ দেয়। বউদের তারা জিগ্যেস করে, বাপের কোনো অচাল-কুচাল কী তারা লক্ষ করে নাই? পারুল বকুল শিমুল মোস্তফার তিন বেটি শরমে মরে যায়। তারাও তো স্পষ্টই শুনেছে বাপের মুখে কাতর কিন্তু মায়া মাখানো সেই নামটির উচচারণ। সমিরন! হতভম্ব তারাও। কার কথা কয়া গেইলো রে বাপজান?

বড়ো বেটা বশার দোকানে গিয়ে ছোটো দুই ভাইকে ধরে। এ রে, হাশেম! সমিরণ বলি কাউকে চিনিস?

হামেশ মাথা নাড়ে। না, সে চেনে না। হামেশের ওপরের ভাই কাশেম, সেও বলে, না! সমিরন বলে কাওকে তো চেনোঁ না!

বশার ধমক দিয়ে ওঠে, দোকানে তোরা বাপজানের সাথে এতকাল! মনে পড়ে না নারী কোনো কী ঘুরি ঘুরি দোকানে আসিত?

দুই ভাই একসঙ্গে বলে উঠে নারী যারা আসিত তারা বাপজানের নাতির বয়স। নামও তাদের আপ টু ডেট। সমিরন নামটা তো তোমার আগিলা কালের নাম। এগুলো কথা পুছ করাও ঠিক নয়।

বশার বলে, তবে যে বাজারে এই নিয়া পাঁচ কথা হইচেছ, তার কী ? তোরা কিছু শুনিস নাই?

এ-কথার পিঠে জীবনযাত্রার এক ঘোর কথা বলে ওঠে কাশেম, কত লোকে কত কথায় তো কয়! বাজারের কথা কান দেওয়া ঠি নয়। তদুপরে চল্লিশ দিনও পার হয় নাই বাপজানের এন্তেকাল হইছে। এই সকল আন্দোলন যারা করে তারা মুখ নয়।

কিন্তু মানুষ তাই বলে চুপ করে থাকে না। ক্রমে কথাটা ঘন পল্লবিত হয়ে ওঠে। নান বিচিত্র কাহিনী ছড়ায় বাজারে।

কেউ বলে, সমিরন ছিল মোস্তফার গোপন প্রণয়ী।

কেউ বলে, শাড়ির নাম সমিরন।

সুপারির ব্যাপারী এক মহাপণ্ডিত বলে, সমিরনকে খবর দিয়ো নয়, কথাটা আসলে হইবে কমির অঙ্কে খবর দিয়ো। শাড়ি বিক্রির অঙ্গ কষি যদি দেখা যায় লাভের ভাগ কম, তবে সেই কমির খবর অবিলম্বে দিবার কইছে!

কেউ এক নতুন ব্যাখ্যা দেয়। আরে, তাজহাটের মহারাজার হাতির নাম ছিল সমিরন! সে হাতিত চড়ি তাঁর আল্লার দরবারে যাইবে বিল শখ! কথায় আছে না, গরিম আমি হরিণ খাই, হাতিত চড়ি হাইগতে যাই!

আমরাও নানা অনুমান শুনি। নানা কথা। কত কথা। এ বড়ো নষ্ট সময়। দুষ্ট কথার আলোচনায় মানুষের এখন বড়ো উৎসাহ। অতীত না বিচার, বর্তমান না বিশ্লেষণ, মানুষকে একবার কোনোমতে মাটিতে আছাড় দিলেই কী যে সুখ মানুষের! গোলাম মোস্তফার পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ তলিয়ে যায়, রমজানের তিরিশ রোজা তলিয়ে যায়, যাকাতের উসুল মানুষ ভুলে যায়, মঙ্গার সময়ে তার দানখয়রাতের কথা বিস্মরণে যায়। রঙিলা মোস্তফার উদয় ঘটে বাজারের দোকানে দোকানে। আমরা আমাদের জলেশ্বরী বাজারের ভেতরদিয়ে হাঁটি। আমরা যেন স্পষ্টই কানে শুনতে পাই গুঞ্জন, সমিরন! সমিরন! সমিরনকে খবর দিয়ো! মন পোড়ায় হে মন পোড়ায়! মোস্তফার মন পোড়ায়!

সমস্ত অনুমান, সকল গুজব আর বিপুল গল্পরাশি ভেদ করে এক নারীমূর্তি ওঠে। নাম তার সমিরন। নব শাড়িঘরের লাল শাড়ি তার পিন্ধনে। সেই নারীটি যে কে, তা কার জানা নাই। নির্ণয়ই নাই। তার চেহারাটিও স্থির কোনো মানুষের নয়। যে যার কল্পনায় গড়ে নেয় নারীটির মুখ। তারই আয়নায় যেন বাজারের গুজবে গল্পে তামাশায় ঠাট্টায় গোলাম মোস্তফা নতুন চেহারা পায়। তার শাদা

দাড়িতে কলপ পড়ে। সুতির শাদা পাঞ্জাবি রঙিন হয়ে ওঠে। মাথার কিশতি টুপি হাওয়ার উড়ে যায়। তাকে কালী মন্দিরের পাশে মাগিপাড়ার দিকে হাঁটতে দেখা যায়। সেখানে সমিরন নামে কোনো বেশ্যা আছে কী নাই, ছিল কী ছিল না, বাজারের কাছে সেটা কোনো বিষয় নয়। বাজার তাকে গলির ভেতরে সমিরনের কাছে পাঠায়। মসজিদে তারাবির নামাজের ছুতায় গোলাম মোস্তফা এখন লোকের মুখে মুখে সমিরন মকাগির কোলে মাথা রেখে তার বগলে সুরসুড়ি দেয়। সমিরনের খিলখিল হাসিতে ভেসে যায় জলেশ্বরীর বাজার।

এন্তেকালের চল্লিশ দিন পরে বিরাট ফতেহার আয়োজন করে গোলাম মোস্তফার পাঁচ বেটা তিন বেটির জামাই। আমরাও যাই। মৃত্যুর শোক থেকে বেরিয়ে আসবার উপায় তবে মহাভোজ! এই ভোজের অন্নগ্রহণ না করে আমরা জীবনের ভেতরে আবার প্রবেশ করতে পারি না। প্রবেশ করে বাজারের দোকানিরা, মহাজন সকল, প্রবেশ করে জগৎ। ফতেহায় গরুর ঝাল গোশত আর শাদা পোলাও, বুটের ডাল আর মিঠা দই, রগরগে রসালো করে তোলে আমাদের। এখন যদি নিষ্ক্রান্ত আমরা শোক থেকে, তবে আর এত ঢাকাঢাকি চাপাচাপি কেন হে? টিউবওয়েলের পানিতে খলবল করে হাত ধুতে ধুতে, হাতের আঠালো চর্বি সাবানে সরল করতে করতে মৌসুমি শাড়িঘরের যুবক মালিক সর্বজনের শোনার মতো করে বলে, আমার কাছে নিশ্চয় সম্বাদ আছে! কুড়ি বছর আগে বউ মমি যাবার পর বহুদিন হতেই মোস্তফা চাচা মাগিপাড়ায় যাইত সমিরনের ঘরে।

আমরা শুনেছি, চল্লিশ দিন পরে আত্মা এই জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। চল্লিশ দিন কবরের মাটির সিন্দুকে থাকে মানুষ। মুনকির নাকির তাকে উর্দুতে পুছ করে, বোল্ তেরা বর কৌন? বাসুল কৌন? বর আমার আল্লা, লা শরিক আল্লা, রাসুল আমার মোহাম্মদ মুস্তাফা। জবাব পেয়ে ঠাণ্ডা হয় মাটি। তারপর মাটির গোর সেই সিন্দুকের দরোজা খুলে যায়। বেহেশতের বাগান থেকে মিঠে হাওয়া আসে।

কাফন জড়ানো গোলাম মোস্তফা উঠে বসে। তার স্মরণ হয়, এক কুড়ি বছর আগে স্ত্রীকে সে এই তো পাশেই কবর দিয়েছিল। তার সেই মাটি সিন্দুকের দরোজা সে খোলা দেখতে পায়। সে পাশের কবরে হামাগুড়ি দিয়ে যায়। ঘুম থেকে ডেকে তোলে স্ত্রীকে। এক কুড়ি বচ্ছর হয়া গেইলো, ঘুম যান এলাও? তারপর খলখল করে হাসতে হাসতে চল্লিশ দিনের মুর্দা গোলাম মুস্তফা বলে, হা রে, বশারের মা, কাণ্ড কী দেখিছিস? বশার হইল বাদে তোকে সবায় বশারের মা বলিয়া ডাকে। পারুল হইল বাদে নারীরা তোকে পারুলের মা বলিয়া বোলায়। মুইও একবার বশারের মা একবার পারুলের মা বোলাইতে বোলাইতে তোর আসল নাম বিস্মরণ হয়া যাই। জগত যে বিস্মরণ হইবে ইয়াতে আর আচচয্য কী, সমিরন!

ছায়া - নৃত্য

অনুপম দত্ত

বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। অনেকদূরে দিগন্তের মত বনের কোলে আঁধার ছায়া জমছে। আর দিনের শেষ উজ্জ্বল রোদটি কাঁপছে গাছগুলির মগডালের পাতায় তখন যে যুবকটি মস্ত একটা গরুর পাল নিয়ে গাঁয়ে ঢুকছে তাররঙ কালো। তার টলমল চোখ দু'টি বেশ বড়। মুখখানির বাকি সব আদিবাসী চেহারার মিশেল। টাটকা সতেজ সুপুরুষ এই যুবকটিকে বেশ প্রশান্ত মনের মানুষ বলে মনে হয়। অবশ্য নামটি তার প্রশান্ত। প্রশান্ত বাদ্যকর। তার ড্রাইভিং লাইসেন্সে জাতের পরিচয়ে লেখা আছ মুচি। একদিন তার বাবা এই গাঁয়ের গো-রাখাল ছিল। বেশ গাঁট্টা - গোঁট্টা চেহারা। মা ছিল ছিপছিপে পাতলা। সুন্দরী। সাজলে জাতের গুমোর অনেক সুন্দরী মেয়ের চোখ আর ঠোঁটের হাঁবড়করে দিত। সই মা পাঁচবছরের তাকে আর সাতবছরের বোনটাকে ছেড়ে বাবুদের এক জোয়ান ছোকরার মোটরসাইকেলে চেপে কোথায় চলে গেল। বাবা জানতে পেরে গলায় দড়ি দিয়ে দিল।

এইসব কথা সে ঘনশ্যাম দাস বাউলকে শুনিয়ে দিল হড়হড় করে।

একটি মেটে ঘর, একফালি চালা, এক কোণে মাটির উনোন। উনোনের পাশে মাটির পাতল পোড়া কড়াই, একটি স্টিলের চকচকে থালা দুটি বাটি আর কেটলিটি। জলের পাত্র। এই সঙ্গে সে একা মানুষ - কতদিন। বোনটা ভাল ছিল পরের বছর গাঁ-যোল আনা মিলে তার বিয়ে দিল এক বিহারী যুবকের সঙ্গে। তার একটা খাটাল আছে দুর্গাপুরে। সেখানে শঙ্করী সুখে আছে। দু'টি বাচ্চা তার। তার হিন্দির সঙ্গে বাংলা মেশায়, বাংলার সঙ্গে হিন্দি। প্রশান্ত চোখে মুখে পরিতৃপ্ত হাসল। বাউল কোলের উপর দোতারাটির তারে খুব হাল্কা সুরে কোনও গান কি একটা গৎ বাজিয়ে যাচ্ছে। চালাঘরটির সামনে ফুটে আছে নীল সমুদ্রের মত আকাশ। নিচে চষা-অচষা মাটির সবুজ, কিছু গাছ-গাছালি। অনেকদূর হলেও স্পষ্ট ফুটে আছে এক ফালি তালবন। সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ঘনশ্যাম বাউল প্রশান্তর দিকে তাকাল। সে হাসি থামিয়ে বলল, 'একবার বিন্দাবন চলে গিয়েছিলাম।'

'জয় গুরু।'

'তো সেখানে একমাস ছিলাম।'

রাম - দুই - তিন - চার। রাম - দুই - তিন - চার... জোর শব্দে দ্রুত লয়ে একতারাটি বাজিয়ে 'রাম' সুরের ঝোঁকে তারের গায়ে বঁাকিয়ে তুলে আবার ধীর লয়ে তিন আঙুলে ধরা মোষের শিং থেকে তৈরী বাদন কাঠিটি চালাতে লাগল।

'তো বিন্দাবন ভাল লাগল না।'

'কেন?'

'গুরু, সেখানে কোনও বিন্দাবন নাই। সেখানে রাধাকিষ্ণ নাই।'

'বাহ্।'

'কিন্তু গাঁয়ে ফিরতে লাগল ছ-মাস।'

'বিন্দাবন থেকে আসতে।'

'না। সেখানে আলাপ হল এক পাঞ্জাবীর সঙ্গে। আমারই বয়েসী। বাংলা অল্পসল্প বোঝে। কিন্তু বলতে পারে না। সে আমাকে নিয়ে গেল চিত্তরঞ্জনে।'

'চিত্তরঞ্জন!' বাউল মাথার এক বোঝা চুল দুলিয়ে হাসল, সেখানে আমি গান গেয়ে এসেছি। ওখানের শ্রোতারা দশ টাকা নোটের পাঁচশ চাকার একটা মালা গেঁথে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল।

বাউল বিড়ির প্যাকেট বের করে প্রশান্তকে একটি দিয়ে নিজে ধরাল। তারপর দু-জনে খানিকক্ষণ ধোঁয়া টানাটানি করল। পাশে রা

খা দোতারার তারে একটা বড় নাল মাছি ঝপ্ করে বসে পড়তেই ঠিং করে সুর বেজে উঠল। মাছিটা উড়ে গেল। প্রশান্ত জানাল ি কষন সিং তার বন্ধুটির নাম। সে তার গান শুনে পাগল। বলে কি না সে এই গানের দাম দেবে। হাসল ঝকঝকে দাঁতে প্রশান্ত, তো, ে স আমাকে একটা মোটর গ্যারেজে ঢুকিয়ে, দুমাসে ড্রাইভিং-এ পাকা করে দিলে। বাকি আর চারটা মাস আমি দিনরাত ট্রাক - ট্যাি ক্স-ম্যাটাডোর চালিয়েছি। বুঝলেন কি না গুরু সমস্ত দিনরাত! ওই গাড়িতেই খেয়েছি। গাড়িতেই ঘুমিয়েছি। এক নম্বর মাল লোড্ করে দু-নম্বর গুদামে রেখেছি। আবার দু-নম্বর গুদাম থেকে বের করে এক নম্বরওলাদের ঘরে পৌঁছে দিয়েছি। হিহি হিহি....

বাউল নিরীক্ষার চোখে তাকিয়ে আছে তার নতুন শিষ্যটির দিকে।

বেশ কিছুদিন আগে একটি গানের আসর থেকে নামবার সময় পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল এই যুবক। রং জুলা সিনথেটিক কাপড়ের পাঞ্জাবীর সঙ্গে হাঁটুর কাছে কুঁচকে যাওয়া ক্ষয়াটে নীল প্যান্ট, ক্ষয়া হাওয়াই চটির ফিতেতে ফাট্ ধরেছে !

'আরে আরে 'তাকে দুহাতে তুলেছিল ঘনশ্যাম বাউল।'

'আপনার গান আমাকে পাগল করে দিল।'

'বাহ্। বেশ তো।'

'কোথা আপনার আশ্রম?'

'ঠিকানা বিনিময়ের পর প্রায় দেখাদেখি হচ্ছিল। একদিন বলল, আমাকে দোতারা শেখাবেন ?'

'শেখাবো । এসো!'

'না। আমাদের গাঁয়ে যেতে হবে। আমরা ক'জন মিলে শিখব। আপনার কত লাগবে?' তখনো ঘনশ্যামের জানা ছিল না প্রশান্তর জ ীবন-কথা। বলেছিল, 'আমি ছাত্র পিছু একশ টাকা নিই। মাসে চার দিন।'

দেবো। আরো কটা ছাত্র হবে।

ঠিক আছে। আস্য যাবার ভাড়া লাগলে।

সে আমি দেবো। আন্তরিক হাসল প্রশান্ত, সে আর কত। সাত সাত চোদ্দ টাকা। তারপর কথা দেওয়া দিনে যেতে পারল না ঘনশ্যাম বাউল। দশদিন পর যখন প্রশান্তর ঠিকানার গাঁটিতে পৌছল তখন দুপুর ফুরিয়ে গেছে।

প্রশান্ত তখন নদীটির ধারে গোঠের রাখাল। গরুগুলি আপনমনে চলছে। আর একটি গাছের তলায় বসে প্রশান্ত গলা ছেড়ে গান ধ রছে, ভাল করে সাজায়ে দে মা আমরা গোচারণে যাই---

তখন এক কিশোর ছুটতে ছুটতে এসে বলল, অ পেশান্ত দা, দেখ গা এক বাউল এসে তোমাকে খুঁজছে।

বাউল! কোথাকার বাউল?

কি জানি! কাঁধে দু-তারা।

আচ্ছা। ঠিক আছে। বল্ গা আমি যেছি।

আরও কিছুক্ষণ আলোর জোয়ার ছিল। কিছুক্ষণ গরুগুলি চারটি খেতে পারত। কিন্তু প্রশান্ত তাদের অবেলায় জড়ো করে পাচন-ল াঠির প্যাঁচ দেখিয়ে খেদাল। তারা ছুটল কাদা পথ, ভাঙা পথ পেরিয়ে গাঁ মুখি। গাঁয়ের পথটি লালধুলোয় গোধূলি রঙের ভরে গে ল। তার ভেতর প্রশান্ত গরুগুলিকে নিজের নিজের ঘরমুখো পৌঁছে দিয়ে ঘরে ফিরে দেখলো ঘনশ্যাম বাউল একচালার দাওয়াটির উপর বসে বিড়ি টানছে।

এভাবে দেখা হবার পর যে জীবনকথা আরম্ভ হয়েছে, তো সেই জীবন, তোমাকে কি বলব গুরু, নেশা। টাকা পেছি। মাল খেছি। বাে জ ফূর্তি করছি। আর থু থু ফেললে বুক থেকে গলা থেকে তেল- মবিল পোড়া কফ বেরুচ্ছে। সেই চারমাসে গুরু, তোমাকে কি বল ব জীবন আমার কয়লা হয়ে গেছে। বাঁশির সুর ভুলেছি। গুরু আমাকে বাঁচাও।

জয় গুরু। প্রশান্তর আত্মসমর্পণে ঘনশ্যাম বাউল মোহিত হল। বুঝল আধার আছে। এখন দরকার বাউল মনটির সঙ্গে পরিচয়। বা উল দোতারাটির সুরে বাজিয়ে দিল, খ্যাপা মনটি আমার... বলল, ভালই করেছিস ওই জীবন থেকে চলে এসে।

চলে আসা নয় গুরু, পালিয়ে এসেছি। সে তুমি বুঝবে না গুরু, ওখানকার মানুষের কত প্যাঁচ, জানতে পারলে এমন জড়িয়ে দিল ে য তুমি আর সুতোর ওড় খুঁজে পেতে না!

কিন্তু পেশান্ত, এখন তো অবস্থা যা দেখছি, ঘরে কেউ নাই, গরু চরাস... তো, চলে কি করে?

বোঝা গেল না হিসেবটা। হাত নামিয়ে বলল, গরু পিছু দশ টাকা। পালে আমার দু-শোটা গরু।

একলা মানুষের মাস গেলে নগদ দু-হাজার টাকা আয়। এর জন্যে পরিশ্রম? যাকে বলে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া! ঘনশ্যাম প্রীত হ ল। তারপর চা তৈরী আর খাওয়া শেষ প্রশান্ত হলে অন্যদের ডাকতে। ওরা গান শিখবে। প্রশান্তর দোতারা আকৃতি সে একটা যন্ত্র জোগাড় করে ফেলেছে। কাছাকাছি গাঁয়ের বৈষ্ণবটি দেহরক্ষা করলেন। বিধবা বৈষ্ণবী প্রকট অভাবে পড়ে বাবাজীর দোতারাখানি বিক্রি করতে চায়। ওটিকে ঘরে আনার সময় ওর মেয়ে বলেছিল, বাবার যন্ত্র তুমি নিয়ে যাচ্ছ। মান রেখো।

যুবতীটির দুই ঢাল কাঁধ থেকে বুকের চূড়ায় উঠে নাভির উপত্যকা বেয়ে দুই জানুর উপর থেমেছে!

দেখি!

তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল প্রশান্ত। তারপর চোখ নামিয়ে দেখেছিল হাতে ধরা দোতারাটিকে একটি তার ছেঁড়া বাকিগুলি জং ধরা। বসে গেছে চামড়ার ছাউনি। গুরুকে না দেখিয়ে কেনা যাবে না ভেবে আড়াইশ টাকা দামে রফা করে পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়ে ঘরে এনে ঝুলিয়ে রেখেছে। ঘনশ্যামের কাছে সেটা নামিয়ে সে যাদের খবরদিতে গেল তাদের একজন গেছে কুটুম ঘর, আর এক জনের ঘরে ল-সম্বন্ধ এসেছে। অন্যজন ঘরে নেই। পাড়ার দোকান থেকে চাল-ডাল-আলু আর হাঁসের দুটো ডিম কিনে ফিরে এল প্রশান্ত।

ঘনশ্যাম বাউল তখন নিজের দোতারাটির তারে সন্ধ্যাবেলার গুরুবন্দনার গানের সুর বাজাচ্ছে। প্রশান্ত নীরবে জিনিসপত্র রেখে লক্ষ্ম জ্বালাল। গো -চরণ থেকে আনা শুকনো কাঠকুটির গাদা থেকে জ্বালানি নিয়ে মাটির উনুন ধরাল। চা করল। আর একটু আঁচ ঠেলে দিয়ে মাটির পাতিলটায় ভাত বসাল। তার ভেতর থাকল আলু আর ডিমদুটি। কাজ করছে তার হাত দুটি। কিন্তু মন ডুবে আছে। বাজনায়! বাজনা থামল একটু পর। প্রশান্ত স্টিলের গেলাসে লাল চা, আর কাগজের প্যাকেটে আনা মুড়ি আর ছোলাভাজা বয়ে আনল গুরুর কাছে। দুজনে এসব খেতে আরম্ভ করলে প্রশান্ত বলল, কাউকে পাওয়া গেল না গুরু, আজ আমি একা আপনার শিষ্য। উঠে গিয়ে ঘরের কুলুঙ্গি থেকে গাঁজার পুরিয়া আর নতুন কল্কে এনে গুরু-দক্ষিণার প্রথম উপচার হিসেবে নামিয়ে রাখল তার সামনে। হাসল ঘনশ্যাম। খুব তরিবৎ করে গাঁজার মশলা বানান হল। টান দেবার আগে ঘনশ্যাম কল্কের মাথায় আগুনের বিঁড়ি, যা নাকি সুতলি ছেঁড়া পাকিয়ে বানানো, তাতে জ্বলন্ত তামাকের ভোগখানি শূন্যে তুলে হাঁকল, বোম্ ভোলা, আলবেলা---তারপর চোখ খুলে প্রশান্তর দিকে তাকিয়ে মন্ত্রপাঠের সুরে বলল, গুরু করে সেবা, মস্ত্ রহে চেলা। তারপর কল্কেঠোঁটের কাছে নামিয়ে চরম টানে শুষে নিল। দশ আঙুল বাঁধা কল্কে ঠোঁট থেকে নামবার মুহূর্তে যেন আধিজাগতিককোনও বাতাস ছিঁড়ে নেবার মত শব্দ উঠল। কল্কেখানি এগিয়ে ধরল প্রশান্তর দিকে। ডান হাতের কনুইয়ের তলায় বাঁ-হাতের পাতা রেখে খুব শ্রদ্ধা আর বিনয়ের ভঙ্গিতে প্রসাদ গ্রহণ করল প্রশান্ত। কল্কে বার কয়েক হাত ফেরৎ হয়ে সব তামাক পুড়ে গেল। ধোঁয়ার নেশা ক্রমে দুজনের মাথার ভেতর জমতে শুরু করল। সন্ধে ফুরিয়ে যাওয়া রাতের আকাশ আর সবুজ অসবুজ মাটির পার্থিব একটা অংশ কোন অপ্রকৃতিক দৃশ্যে ফুটে থাকল। সেখান থেকে ঝিঁঝিঁ আর তক্ষকদের কিংবা আরও কোনও অচেনা প্রাণীদের অদ্ভুত বাদনধ্বনি আরম্ভ হয়েছে !

প্রশান্ত কথা বলল, আমি ভেবেছিলাম গুরু, তুমি আর এলে না!

হাসল ঘনশ্যাম। লম্ফের আলো ছায়ার সেই হাসিটার ভাব গভীর হয়ে ফুটল।

কিন্তু এমন অসময়ে এলে যে কাউকে পাওয়া গেল না। খ্যাপা, গুরুকে অসময়েই আসতে হয়। আর গোপন তত্ত্ব একা ছাড়া জানা হয় না। আজ তুই একা আমার শিষ্য হবি। আমি তোকে দীক্ষা দেব খ্যাপা।

জয়গুরু!

বাউল-বৈষ্ণব সমাজের হৃদয়ের কথাটি মুখ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ, যা এতদিন কখনও কারও কাছে করেনি বা করতে হয়নি, সে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে গুরুর পায়ের উপর সে নিজেকে ফেলে দিল। আবার ঘনশ্যাম দু-হাতে তাকে তুলে বুকে জড়ালো। সামনে বসিয়ে বলল, বাবা পেশান্ত আয়, আগে তোকে বৈষ্ণব মন্ত্র দিই। ঘনশ্যাম দাসবাউল দোতারা বাজাতে শুরু করে গাইল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে---, থেমে বলল, গা আমার সাথে। আবার গাইতে শুরু করতেই প্রশান্ত সুরেলা গলায় আরম্ভ করল। গান চালিয়ে যেতে ঘনশ্যাম তার ঝোলা থেকেবের করল এক থোকা ঘুঙুর আর একজোড়া খঞ্জনি। প্রশান্ত হাত বাড়িয়ে নিল খঞ্জনি দুটি। ঘনশ্যাম নিজের ডানপায়ের বুড়ো আঙুলে জড়িয়ে নিল ঘুঙুর গোছার দড়ি। কৃষ্ণ ভজনার গানের সঙ্গে মিশে খঞ্জনি, ঘুঙুর আর দোতারার সুর, একটি কুটিরের চালা থেকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এত যেন জ্যোৎস্না আর্যও প্রখর হয়ে একটা পাখিকে বিভ্রান্তকরে আকাশের এদিক থেকে ওদিকে একটানা ডেকে যেতে মগ্ন করল। কিন্তু সেটা সামান্য সময়।

হরে কৃষ্ণ গানের সাধনার মধ্যে গুরু হঠাৎ বলতে আরম্ভ করলেন, রাম দুই তিন চার, রাম দুই তিন চার... দোতারা বেজে চলল। থেমে গেল প্রশান্তর গলার স্বর আর খঞ্জনি নাচানো হাতের শব্দ!

গুরু ওই রাম দুই.... সংখ্যা পর্যায় একই সুরে দোতারার তারে তারে বার কয়েক বাজিয়ে বললেন, এই হচ্ছে মন্ত্র। বাবা পেশান্ত, দোতারা শিখবার মন্ত্রটি আমি তোকে দিলাম। বাজা!

যে আমাকে তার অতীত জীবনের গল্প শোনাচ্ছিল, সে হচ্ছে একজন ট্রাক ড্রাইভার। আমদের পাড়ার একটি খড়ো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। তার বউ যেন একটা ফাটা কাঁসা! সবসময় চেঁচায়। তিনটি বাচ্চা সব সময় নিজেদেরমধ্যে মারামারি করে আর কাঁদে। ট্রাকের চাকরি, তাই ঘরে সে প্রায় দিন থাকে না। কিন্তু যে কটা দিন থাকে থালাবাটি বালতি মগ ছোঁড়াছুঁড়ি চলে। সঙ্গে চলে বউয়ের চিৎকার! আর তিনটে বাচ্চার সবসময় হুটোপুটি, মারামারি, সব শেষে সমবেত কান্নার শব্দ পাড়ার অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ! বোঝা যায় একটি অসুখী পরিবার এখানে বাস করে।

কিন্তু দু-এক সময় অনেক রাতে খালি গলায় গাওয়া কিছু বাউল-গান খুব পরিষ্কার আর সুরেলা শব্দে শোনা যায়।

একদিন তাকে সামনে পেয়ে শুধিয়েছি, আচ্ছা, মাঝে মাঝে যে গান শুনতে পাই, সেটা কি আপনি করেন?

প্রশান্ত মৃদু হেসে বলছে, ওই আর কি। যখন একা হতে পারি, তখন সব মনে পড়ে।

সেদিন শুধোই নি, সব মনে পড়ে বলতে কি আপনি বোঝাচ্ছেন? তবে কিভাবে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেছে। আজ আমরা একটা

চায়ের দোকানের ভেতর বসেছি। দোকানের মালিক নেই। উনুন নেভানো। মালপত্তর একটা ঘরে তালাবন্ধ। বসবার মাটির ধারি শূন্য পড়ে আছে। সেই বিকেল থেকে অঝোর ধারে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সামনের পথটিতে বইছে কাদাজলের স্রোত। অন্য দোকানগুলির ঝাঁপ প্রায় বন্ধ হয়ে পথটি একেবারে নির্জন। একইভাবে বিকেল ফুরিয়ে যেতেই একটু দূরে পথের মোড়ে জ্বলে উঠল ষ্ট্রিট লাইটের হ্যালোজেন বাল্ব। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোর ভেতর বৃষ্টি ঝরার পরিবেশ কোন এক রহস্যমাত্রায় চলে গেল। আমরা দোকানের ধারিতে পাশাপাশি বসে বিড়ি টানছি। প্রশান্ত মাঝে মাঝে কথা বলছে। চুপ করে থাকা সময়গুলোতে তীব্র হয়ে উঠছে দোকানের পেছনদিকে জলকাদার নর্দমায় ব্যাঙেদের কোরাস। মাঝে মাঝে জানেন, ওই জীবনে ছুটে যেতে খুব ইচ্ছে করে। মনে হয়, আবার গরু চরাই, বাঁশি বাজাই। কৃষ্ণ সাজি।

কৃষ্ণ সাজি! মানে?

এক সাঁওতালের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম একটা ময়ূরপাখা। বিড়ি টানল বার কয়েক । চুপ করে থাকল আরও কিছুক্ষণ। বাবার ছিল কেষ্টযাত্রার দল।

ও-ও।

একটা ঝুলিতে ছিল পাউডার সিঁদুর কাজল। আর ছিল ছোট আয়না, ছোটবড় কটা তুলি। ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল।

বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে ব্যাঙেদের গান!

তো একটা সময়, সেই ঝুলিটা নিয়ে, হ্যাঁ, একটা বাশিঁও পেয়েছিলাম। মনে হয়, বাবার কেষ্টযাত্রা দলের।

আবার বিড়ি ধরাল। আগুন শিখার আলো ছিট্‌কে পড়ল প্রশান্তর মুখের উপর একটু সময়।

এক পাল গরু হাঁকিয়ে চলে আসতাম নদীর ধারের গো-চারণ মাঠে। বসে যেতাম জলের ধারে একটি শিরীষ গাছ তলায়।

অতীত ছবির মত ফুটে উঠল। মাঝে মাঝে বিড়ি টেনে চলা ছায়ামূর্তি এক কথকের দিকে তাকিয়ে থাকলেও আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল এক সদ্য যুবক। কাঠের ফ্রেমে আটকানো ছোট আয়নাখানির ঝাপ্‌সা কাচে মুখের ছবি ফেলে রঙ মেখে কৃষ্ণ সেজে নিল। নদীর ধারের এক গোছা ঘাসলতা ছিঁড়ে ময়ুরপাখাটি বেঁধে মুকুট পরে নিল। কানে জড়িয়ে নিল লতাঘাসের কুণ্ডল। তারপর কাজল আঁকা বড়বড় চোখের দৃষ্টি নদী জলে ফেলে ঠোঁটেরউপর আড়াবাঁশটি তুলে বাজাতে শরু করল। সেই সুরে বুঝি নদীর জল নীল হয়ে গেল। ওপারের দিগন্ত রেখার ঘনসবুজ ঢেউটি হয়ে গেল বৃন্দাবনের তমাল কুঞ্জ।

আর বললে বিশ্বাস করবেন না, কোথা থেকে সাতটা টিয়ে পাখি নদীর ওধারের গাছটির ডালে ডালে বসে প্রতিদিন আমার বাঁশি শুনতো। এটা আমার সামনে কিছুতেই দৃশ্য হল না। শুনে চললাম, আমার ছোট বেলাতেই বাবা মরে গেল। কেষ্টযাত্রা দলের কথা আমার তেমন মনে পড়ে না। ওই দলের কোনও গান আমার জানা নেই। তবু জানেন, কি জানি, কি করে সেইসব গানের সুর আমার বাঁশিতে বেজে যেতো।

এখান বাঁশি বাজাও?

না। বুকের ভেতর সে হাওয়া নাই। একটু থামল। তারপর যেন আনমনে বলল,

তেল-কালি আর মবিলপোড়া ধুঁয়োর বাতাসে বাঁশি আর বাজবে না। তো, আপনাকে যেটা বলছি, আমাকে টেনে নিল বাউলগান আর দোতারার বাজনা। আমার দিকে সে ঝুঁকে এল, আপনি শুনে দেখবেন, পূববাংলার যন্ত্র দোতারা বীরভূমের বাউলের হাতে অন্য একটা আলাদা সুরে বাজে।

মন দিয়ে ঠিক শুনিনি।

শুনলে বুঝবেন, এই বাজনা কিভাবে আপনার বুকের ভেতর পর্যন্ত মুচড়ে দিচ্ছে। আর তার সুর আপনার মাথার ভেতর ঢুকতে যত ময়লা জঞ্জাল আর পচাকাদা সাফ করে দিচ্ছে।

একদিন শোনাবে তোমার বাজনা ?

ব্যাঙেদের সুর বাহারের মধ্যে এই চালাটির কোন্, ফাটলে ঢুকে থাকা এক ঝিঁঝিঁর ডানা বাদনের শব্দ মিশে বৃষ্টির অর্কেষ্ট্রা বেজে চলল! একটু চুপ থেকে প্রশান্ত ধীর স্বরে বলল, আমার দোতারার গল্পটা আমি আপনাকে শোনাতে চাইছি দত্তবাবু।

ও-ও। আচ্ছা আচ্ছা, বল।

তো গুরু আমাকে যে মন্ত্র শেখালেন, তাতে চিটিয়ে লেগে থাকলাম। সেই বিধবা বৈষ্ণবীর কাছ থেকে আনা যন্ত্রখানি গুরু সারিয়ে, নতুন তার লাগিয়ে এনে দিয়েছেন। আমি বাকি টাকাটা, জানেন, যেদিন সব টাকা মিটিয়ে দিতে গেলাম সেদিন মা আর মেয়ে এতো কেঁদেছিল যে তাদের আঁচল ভিজে গিয়েছিল। চোখ মুছছে আবার দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। তবে আমি ওদের বলেছিলাম, এ যন্ত্রের মান আমি রাখবো। বিড়ি দিন।

এরপর লাইটারের চকিত আলোয় একে অন্যের মুখ দেখাদেখি হল। চুপ থেকে খানিকক্ষণ বুকের ভেতর ধোঁয়া রেখে ভিজে বাতাসে বিলিয়ে দেওয়া হল। আর মনে হল, যতক্ষণ এই পরাণ কথা শেষ না হবে ততখন বৃষ্টির পর্দা থাকবে। থাকবে বাইরে আলো-অন্ধকারের অনৈসর্গিক মায়া আর এই একচালাটির ভেতর আমাদের দুই ছায়া।

কৃষ্ণ সাজা টাজা বাদ। বাঁশি রেখে দিয়েছি চালের বাতার পাঁকে। এখন গরুর পালকে মাঠে ছেড়ে গাছতলায় বসে কেবল দোতারা

সাধি। এই করতে করতে গুরুর কৃপায় কিছু গান তুলে ফেললাম। গুরুন্দনা আর আত্মাতত্ত্বের কটা গানও বাজাচ্ছি। গুরু খুব খুশী। একদিন বললেন, আমি আর্শীবাদ করছি, তুই একদিন বড় শিল্পী হবি। কিন্তুকি হল? যাক্ সে কথা, আপনি জানতে চাইলেন, তাই সব বেরিয়ে আসছে। এরপর গুরু আমাকে দেহতত্ত্বের কিছু গান দিতে চাইলেন। কিন্তু বললেন, / এসব হচ্ছে গৃহ্যতত্ত্ব। শুধু গান গাইলেই হবে না। বেটা। এ গানের মর্ম বুঝতেহলে করে দেখাতে হবে। বুঝতে হবে চারিচন্দ্র ভেদ কি, দ্বিদল পদ্ম কাকে বলে! দেহতত্ত্বর জন্যে তাই নারী চাই বেটা সাধন সঙ্গিনী। না হলে কিছু বোঝা যাবে না। এসব হচ্ছে গিয়ে বোবার কথা বলা, কালার শুনতে পাওয়া। আর কানার রঙ্গ দেখা। বুঝতে পারছেন দত্তবাবু?

না। একদম না।

পারবেন না বুঝতে। আমিও পারি নাই।

অনেক দূরে একধরনের ঝম্‌ঝম্ শব্দ বেজে চলেছে। শহরের এদিকে একজোড়া লাইনের উপর সন্ধ্যারাতে ট্রেনখানি আসছে। এবার শুনুন আমার জীবনের ঘটনা। একদিন বুঝলেন, হঠাৎ দেখলাম সামনে একটা যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে।কখন এল, কোথা থেকে এল একেবারে বুঝতে পারিনি। বাজনা থামিয়ে ফেললাম। কিন্তু কি হল জানেন, মেয়েটি ঝপ্ করে আমার সামনে বসে পড়ল। গরু গুলি মাঠে। দুপুরের নদীজলে রোদকুচি নেমে চলেছে। শিরীষ গাছটির ছায়ামাখা বাতাস মেয়েটির গা থেকে সুগন্ধ তুলে বুঝি এক মোহে জড়িয়ে ধরল প্রশান্তকে।

মেয়েটি বলল, থামলে কেন? বাজাও শুনি।

প্রশান্ত খানিকটা বিমূঢ়। মেয়েটি একদৃষ্টে তার চোখের ভেতর তাকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু চেনা যাচ্ছে না কোনওভাবে এ কে, কোথায় দেখেছে !

আচ্ছা, তুমি আর বাঁশি বাজাও না?

নীবরে মাথা নাড়ল প্রশান্ত।

তোমার বাঁশি আমি শুনেছি। তবে দোতারাটা তুমি খুব সুন্দর বাজাচ্ছে।

তুমি কে ?

খিল্ খিল্ হাসির শব্দ যেন নদীর স্রোতে ছিটকে পড়ল।

চিনতে পারলে না? আমি রাধা। হঠাৎ চোখ নামাল মেয়েটি, তুমি আগে কিষ্ণ সাজতে না?

প্রশান্ত হতভম্ব!

আমি সব জানি। চোখ তুলল মেয়েটি। মুখ ভার করে বলল, তোমার কিছু মনে থাকে না। এটা আমার বাবার দোতারা। তুমি এটা কিনেছ। আমি তোমাকে ভালবাসি কিষ্ণ।

সেই নির্জন নদীর ধারে মেয়েটি হঠাৎ প্রশান্তর কোলে উপুড় হয়ে পড়ে তার কোমর দুহাতে জাপ্টে ধরল।

বুঝতে পারছেন আমার অবস্থা? অনুভব করতে পারছেন দত্তবাবু?

আঁঅ্, হ্যাঁ, বলে যাও... শুনছি।

এক নাগাড়ে বৃষ্টি ঝরছে। পথের জলস্রোতের উপর আলো কাঁপছে। ব্যাঙ আর ঝিঁঝির আবহ শব্দে দূরের লাইনে ট্রেনের চাকার আওয়াজ মিশে রয়েছে।

সেই রাধা এখন আমার বউ।

আঁঅ্।

হ্যাঁ। শুনে যান।

গড়ে উঠল অগাধ প্রেম। নদীর ধারে, খোলা আকাশের নীচে দুটি হৃদয়ের অপরূপ বৃন্দাবন। সব কিছু জেনে গুরু প্রশান্তকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে রাধার সঙ্গে একদিন মালা - চন্দন ঘটিয়ে দিলেন। রাথা তার ধর্মপথের আর সঙ্গীতে জগতের সাধন- সঙ্গিনী হল। বিবরণ শেষে প্রশান্ত হঠাৎ গেয়ে উঠল, গুরু দিলেন সাধন সঙ্গী, এমনি আমি অর্বাচীন, ক্ষিদের জ্বালায় পদ্মকে ফুলকপি ভেবে মারছি কামড় রাত্রদিন.... থেমে গিয়ে বলল, আমারই অপরাধে তিনটি সন্তান জন্মাল। গরুবাগলী ছেড়ে দিয়েছি কবে। কখনও গরুর সঙ্গ কখনও অন্যদের আসরে গান গাই, দোতারা বাজাই। এই করে সংসার চলে। তাতে ধরুন, অভাব না। আর অভাবী সংসারে যা হয়--- জানেনই তো সব। এরপর প্রশান্ত একটু বেশিক্ষণ চুপথাকল। আবহ শব্দে ট্রেনের আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমার কাছে খানিকটা গাঁজা আছে। বানাবো?

কিসে খাবে ?

কল্কে নেই। বিড়িতে ভরি।

তাকিয়ে থাকলাম কোনও এক ছায়া-নৃত্যের মত তার হাত দুটির দিকে। দুটি বিড়ির ভেতর মশলা ঢোকান হল। একটি এগিয়ে দিল আমার দিকে। এই বৃষ্টিঝরা ভিজে হাওয়ার রাতে আমরা একান্ত মনে বেশ খানিকটা ধাঁয়া ফুসফুসে ভরে ছেড়ে দিলাম জলকণাদের সামনে। শেষটানে এসে মাথার ভেতরের অনাহুত কিছু স্নায়ু যেন জেগে উঠল। ঘিরে ধরল অদ্ভুত এক নিবিড় ঘনত্ব যাতে সব শব্দ

আর পরিবেশ ডুবে গেল। শুধু থাকলাম আমরা দুজন। পরস্পরের কাছে ছায়ামূর্তি।
কিন্তু ওই জীবনের কথা আমি ভাবতে চাই না। মনে এলে দুরে সরিয়ে দিই। শুধু, আজ আপনি শুনতে চাইলেন, তাই---
বলতে তোমার কষ্ট হচ্ছে?
না না। কষ্ট আর কি ! বলছি তো, বলেই যাচ্ছি।
ইচ্ছে না করলে---
একবার একটা দলের সঙ্গে আমি সুইডেনে গান গাইতে গিয়েছিলাম।
তুমি বিদেশ গিয়েছিলে।
কিন্তু আমার উচচকিত বিস্ময়কে ডুবিয়ে দিয়ে ট্রেনটা মাঝে মাঝে তীব্র শব্দের বাঁশি বাজিয়ে লাইনে চাকারজোর শব্দ দুলে চলে যেত লাগল। চারপাশ এই শব্দে ভরে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর সে শব্দ সরে গেলেও আমাদের কথকতা আরম্ভ হল না। আমরা আরও কিছু সময় চুপ থাকলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাঙ আর ঝিঁঝির সঙ্গে শুরু করা একটা পোকার কাঠ কেটে যাবার শব্দের মিশেল ঘটল। একসময় প্রশান্ত নিচু সুরে গান শুরু করল, যে দেশে নাই জন্ম মৃত্যু , আমার মন টেনেছে সেই দেশে, গুরু গো... আমায় নিয়ে চল--- কিন্তু সে গান থামিয়ে কথায় এলো, ফ্রান্স আর সুইডেনে কয়েকটা স্টেজে গান গেয়ে আমার খুব নাম হল। সাহেব মেমরা আমাকে অনেক উপহার দিল। আমাদের দেশের পাঁচ হাজার টাকা দামের একটা চেক ওরা আমাকে ছিল। বুঝলেন, খুব আনন্দ। কিন্তু দেখাবার মত মানুষ আমার ছিল না দত্তবাবা।
কেন? রাধা? তোমার সাধন-সঙ্গিনী!
একরকম ভেবেছিলাম দত্তবাবু। কিন্তু সাধন - সঙ্গিনী হয়েগেল আমার বউ। আর বউ হচ্ছে কেবল তার ছেলেপিলের মা! একসময় সে তার পুরুষের আর কেউ নয়। বরং পুরুষটির উপর তার আক্রোশ, রাগ। আমার বিশে যাত্রার সময়. রাধা মুখ গোমড়া করেছিল। একটা কথাও বলেনি। তো, বুঝলেন, উপহার আর টাকা পেয়ে আমি ওসবআর মনে রাখিনি। ভেবেছিলাম ওর মুখে হাসি ফুটবে। আমার আদর নেবার জন্যে বুকে মাথা রাখবে। কিন্তু কি হলজানেন, ঘরে পা দিতেই সে চিৎকার করে বলল, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। এখানে আমাদের ফেলে বিদেশে ফূর্তি করতে তোমার লজ্জা করে না! ওকে আমি বোঝাতে চাইলাম। ওর সামনে বের করে ধরলাম সেই চেকের কাগজটা! কিন্তু ও কি করল জানেন, আমার হাত থেকে ওটা কেড়ে নিয়ে যত অকথ্য কুকথা ভাষা শুনিয়ে যেতে লাগল। আমাকে লম্পট চুয়াড় বলে গালাগালি আরম্ভ করল। তারপর চেকের কাগজটা কুটিকুটিকরে ছিঁড়ে ফেলে আরও একটা সাংঘাতিক কাজ করল।
আমার রুদ্ধশ্বাস স্বর বেরুল কি ?
ও হঠাৎ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর কাঁধ থেকে দোতারাটা কেড়ে নিল। ওটার গায়ে ছিল ভেলভেটের একটা ঢাকনা। উপহার দিয়েছিল এলিয়ে। সে আমাকে একটা চুমু খেয়েছিল। আপনি হাসলেন?
না। দেখতে পাচ্ছি।
তাহলে আরও দেখুন---
আমি প্রশান্তর কথন অনুসরণ করে দেখলাম, বাঁধা দোতারার গা থেকে সেই ঢাকনা যেন চামড়া ছাড়ানোরমত টেনে খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। চিৎকার করে বলল, আমার বাবার দোতারা। এটা আমি কোনও নোংরা কাজে, কোনও চরিত্রহীনের হাতে থাকতে দেব না। তারপর সে যন্ত্রটির ময়ুরপাখনার মাথার দিকটা দুহাতে ধরে মাথার উপর তুলল। আর তুলেই চোখের পলকে আছড়ে ফেলল মাটিতে। কোনও মাথার খুলি ফাটার একটা আওয়াজের সঙ্গে সুরে বাঁধা চারটি তারের ছিঁড়ে যাবার শব্দ মিশে গেল!
তারপর বুঝতে পারছেন, আমার আর কি করার থাকে। বউকে ধরে বেদম পেটালাম। মদ খেলাম। আরও মদ খেলাম। সব ছেড়ে হলাম ট্রাক ড্রাইভার। এই একটা বীজন---
পথে নেমে দেখি জলের সূক্ষ্ম কণারা ঝরছে। আমাদের পাড়া অনেকটা দূরে। মাথা ভিজে যাবে, জামা প্যান্টের অনেকটাই শুকনো থাকবে না। কিন্তু আমরা কেয়ার করলাম না।
যেতে যেতে প্রশান্ত বলল, অতীত এমন একটা বস্তু দত্তবাবু, সে আপনারই, আপনার সামনে সে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু আপনি তাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে পারবেন না। ছুঁতে পারবেন না!
পাশাপাশি চুপচাপ চলা হতে লাগল।

প্রয়োজনীয় কিছু কথোপকথন

গৌর বৈরাগী

হাতের ধাক্কায় ঘুম ভাঙল তারাপদর। নীল মশারির বাইরে টিউবের সাদা আলোয় মিনতিকে দেখলেন। দেওয়ালে ইলেকট্রনিক ঘড়ির ব্রাশের পেণ্ডুলাম দুলছে। ঘড়িতে বারোটা পঁয়ত্রিশ। কোনো কোনো রাতের দু-একটা জরুরি ফোন আসে। তখন মিনতিই তাকে ডেকে দেয়। রাত ন-টা থেকে সাড়ে ন-টার মধ্যে তারাপদ বিছানায় যান। তার আগে রাতের খাবারের সঙ্গে পরিমিত পানীয় তাঁর বরাদ্দ। আজও সাড়ে ন-টায় শুয়েছেন। শোবার পর ঘুম। এই বিলাসিতাটুকু তাঁর নিজস্ব। ভালোমন্দ কিছু খাওয়া - দাওয়া সামান্য পানীয় আর একটি নিটোল ঘুম।

কী হল, ওঠো! মিনতি তাড়া দিল, শ্যামলদা ধরে আছেন।

কোন শ্যামল, ধরতে পারলেন না। ফিনান্সের শ্যামল নাগ কি? ওর কাছেই তথ্য দফতরের নোটটা যাবে। আগেভাগেই বলেরেখেছেন তিনি। সেই ব্যাপারেই কি কোনো কথা বলবেন শ্যামল নাগ?

মশারি তুলে বাইরে বেরোলেন তারাপদ। নভেম্বর চলছে। বাতাসে মৃদু শীত। এসময় গায়ে পাতলা গেঞ্জি থাকে একটা। শরীরটা ক্রমশ ভারী হয়ে যাচ্ছে। হালকা হবার কোনো মেডইজি কি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে? পায়ে হাওয়াই চটি গলিয়ে হেলান দিলেন তারাপদ। পাশেই ফোনস্ট্যান্ডে রিসিভার নামিয়ে রাখা।

হ্যালো। আস্তে উচ্চারণ করলেন উনি।

তারাপদ, আমি শ্যামল বলছি।

প্রথমে শ্যামল নামটিকে চিনতে পারেননি। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই চিনলেন। ওই কণ্ঠস্বর তাঁর বহু চেনা। শ্যামলের কণ্ঠস্বরের একটা নিজস্ব মডুলেশন আছে। কিন্তু মাত্র মুহূর্ত হলেও সেই দ্বিধাটুকু ওপ্রান্তে ঠিক ঠিক পৌঁছেছে। বিস্তারিত হবার আগেই ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল, আমি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বলছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ চিনেছি। কিন্তু এত রাতে, কী ব্যাপার শ্যামল?

একটা জরুরি কথা আছে।

বোধহয় ফোনটা হাতবদল করছেন শ্যামল। সামান্য বিরতি। কী এমন জরুরি কথা তার সঙ্গে। শ্যামল বরাবরই খেয়ালি টাইপের। তারাপদর সঙ্গে যদিও সম্পর্ক তেমন নিবিড় নয়। না হলে ওর তেমন তেমন কোনো বন্ধু বা কোনো অনুজ লেখকের কাছে রাত এক টা দুটোয় ফোনে উপস্থিত হওয়া কোনো ব্যাপার নয়। আবার কখনো ফোনের বদলে রাত দশটা থেকে বারোটা রেঞ্জের মধ্যে সশরীরে দরজায় করাঘাত -- আজ আমি তোর সঙ্গে এক বিছানায় শোবো, তুই রাগ করবি না তো!

তারাপদ কিছু দূরের। তাঁর সঙ্গে ফোনে অবশ্য তেমন ব্যবহার আশা করেন না। তাহলে কী জন্যে এই রাতে ফোন! কী দরকার!

তুমি শুনছ তারাপদ?

হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছি। ঘুমের ক্লান্তিটুকু গলা থেকে ঝেড়ে ফেলেন তারাপদ। পাশের রাস্তা দিয়ে এখনও এক আধটা গাড়ি যাচ্ছে। হেড লাইটের তীব্র আলো সার্শি পাল্লা ছুয়ে যাচ্ছে। শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

হ্যাঁ শুনছি। বলো তোমার কথা।
আমার মণি পিসিমা, এখন সত্তর - টত্তর হবে। কথার শেষে শ্যামলের গলা থেকে ওঠা হিক্কার শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেলেন তারাপদ। সামনে বোতল গ্লাস সব কি সাজানো? অথচ কণ্ঠস্বর জড়তাহীন।
পিসিমা গোবরডাঙার বিপ্লবী সুধীর হাজরা রোডে একা থাকেন। পিসেমশাই বছর ছয়েক হল ম্যাসিভ অ্যাটাকে পরলোক গমন করেছেন। তারাপদ শুনছ?
হ্যাঁ হ্যাঁ শুনছি। তারপর...?
তারাপদ যেন একটু দ্রুততাই আশা করলেন। তিনি জরুরি দরকারটায় দ্রুত যেতে চাইছেন। তাঁর প্রিয় ভালোলাগার একটি হল ঘুম। তারাতাড়ি দরকার সেরে আবার ঘুমে যেতে চান তিনি। তারাপদ বললেন, তারপর...?
পিসিমার নাম ললিতা। বয়েস সেভেনটি। পিসিমার বড়ো ছেলে বুড়োদা আমেরিকায়, মেজ পলু ক্যানাডায়। গোবরডাঙার বাড়িতে পিসিমা একা থাকেন। আমি একবার গেছি। একতলা বাড়ি। সামনে তরকারি বাগান। ফণি হাজরা বাগান দেখাশোনা করে। রাতের বেলা একা পিসিমা। অবশ্য ঠিক একা বলা যায় না। গোটা চারেক বেড়াল আছে। যদিক না মাদিটা এর মধ্যে আরও কটা বিইয়ে থাকে। বেড়াল ছাড়া দুটো কুকুরও আছে।
রিসিভার কানবদল করলেন তারাপদ। চোখ গেল ঘড়ির দিকে। পৌনে একটা। এসময় গাঢ় ঘুমে শরীর জড়িয়ে থাকার কথা। তার বদলে বেড়াল আর কুকুর পরিবৃত পিসিমা প্রসঙ্গ খুবই অপ্রাসঙ্গিক। অথচ কিছু করার নেই। কুবেরের বিষয় আশয় -এর লেখক এমনই। স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখী গৃহকোণ তার জন্যে নয়। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ভেঙেছেন ওই লেখক। স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে একবার ইচ্ছে হল,চম্পাহাটিতে ধানজমি কিনে নিজে হাতে চাষ করবেন। এইরকম জীবনপাগল মানুষটিকে সামান্য দূরত্ব রেখেই দেখেছেন তারাপদ।ঘনিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায় তাদের মধ্যে সেরকম কিছু নেই। হয়তো দুজনের প্রকৃতিই বিপরীত মেরুর। তাই আজ হঠাৎ এই মধ্যরাতের ফোনের ভেতর পিসিমার প্রসঙ্গে খানিক বিহ্বল হলেও তারাপদ স্বাভাবিক ভাবে বললেন, তারপর...?
শ্যামল বলে যাচ্ছেন, কুকুর বেড়ালরা পিসিমাকে খুব ভালোবাসে কিন্তু পিসিমার লোয়ার অ্যাবডোমিনে ম্যালিগ্যান্ট, সেকেন্ড স্টেজ। ওরা কী করে হাসপাতালে শিফ্‌ট করবে পিসিমাকে?
তারাপদ বললেন, এই ব্যাপার! কথাটা হয়তো নিজেকেও জানালেন। এবার যেন কিছুটা আন্দাজ করা যাচ্ছে। সরকারি দফতরে উঁচু পদে থাকার কারণে এমন অনুরোধ মাঝে মাঝে আসে। হয়তো তেমনটাই স্বাভাবিক। এই যেমন শ্যামলের কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হেল্‌থ সেক্রেটারির নাম্বারটা মনে পড়ল প্রথমে। তাঁর একটা ফোনেই পিসিমাকে হাসপাতালে ভর্তির সমস্যাটা মিটে যেতে পারে।
তারাপদ বললেন, ঠিক আছে শ্যামল, আমি কথা বলে সকালেই তোমাকে ফোন ব্যাক করছি।
আমার কথাটা তো এখনও শেষই হল না তারাপদ। বেশ ধীরে আর শান্ত কণ্ঠস্বর শ্যামলের। উচ্চারণ মোটেই অ্যালকোহলিক নয়। জরুরি দরকারটা শোনো। ফোনের ও প্রান্তে শ্যামল বলে উঠলেন। ব্রহ্মপুত্র খালের ধারে বাঁশের খুঁটি, মুলি বাঁশের বেনা, মাথায় টালি অজয় সাহার বাড়ি। রিসেন্টলি লেবার থেকে রাজমিস্ত্রি হয়েছে। একশো টাকা রোজ তার থেকে হেড মিস্ত্রি কুড়ি টাকা কমিশন খায়। অজয় সাহার তিন মেয়ে বউ আর বুড়ি মা। মনে রেখো রোজ আশি টাকা। তাও সারা মাস কাজ পায় না।
এবার অস্বস্তি হচ্ছে তারাপদর। নভেম্বরের বাতাসে কিছু শৈত্য। তবু ঘরের ভেতর গুমোট ভাব। মিনতি বিছানায় শুয়েছে। হয়তো আর একটু পরেই ঘুমের গাঢ় নিঃশ্বাস শোনা যাবে।
তারাপদ শুনছ?
হ্যাঁ শুনছি।
অজয় সাহার বড়ো মেয়ের নাম শ্যামলী। গলা খাঁকারি দিয়ে কণ্ঠস্বরের জড়তা পরিষ্কার করলেন শ্যামল। মেয়েটা মাধ্যমিকেফেল করেছে। তা -ও চার বছর হয়ে গেল। আর পরীক্ষা দেয়নি। বেশ কালো, রোগা, সামনের দাঁত উঁচু। অজয় সাহা ফি সপ্তায় অ্যাভারেজ দুটো করে সম্বন্ধ আনে। বাজারওলা, গুমটিওলা, ভ্যানওলা, দুজন রাজমিস্ত্রির লেবারও আছে।
শুনতে শুনতে তারাপদর মনে হল, ওই শ্যামলী মেয়েটা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্যারেক্টার। নাম বদলে, ঠিকানা বদলে শ্যামলেরই আগামী কোনা গল্পে দেখা দেবে। এই টিপিক্যাল চরিত্রগুলো শ্যামলের নিজস্ব। কিন্তু এসবে তারাপদর কী প্রয়োজন!
তাঁর ঘাম হচ্ছে। পাতলা গেঞ্জির ভেতর ঘাম জমছে। শ্যামলকে কোনো ভাবেই ফিট করা যাচ্ছে না। ওর কেস হেলথে রেফার করা যাবে কি! কিন্তু শ্যামলীর তো কোনো রোগ নেই। কুশ্রীতা কোনো রোগ নয়। হঠাৎ পদবিটার দিকে মন গেল তাঁর। কোনো কোনো 'সাহা'-রা এস সি। তা যদি হয়, তাহলে ... এস এন বিশ্বাসের কথাটা মনে পড়ল তারাপদর। তফসিলি জাতি উন্নয়ন পরিষদের ডেপুটি সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। উনি নিজেও একজন কবি। সেই সূত্রে তারাপদর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা। তিনি বললে সমরেন্দ্র নিজেই উদ্যোগী হয়ে একটা বিশ ত্রিশ হাজারের এস এস আই স্কিম করে দেওয়া কী আর এমন। শ্যামলী ছোটোখাটো ব্যবসা করতে পারবে। স্বাধীনভাবে উপার্জন করবে। বিয়ে করতে হবে, কে মাথায় দিব্যি দিয়েছে!
তারাপদ বললেন, বুঝেছি। শ্যামল তুমি একটা হাতচিঠি দিয়ে শ্যামলীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। তারপর...

আহা, আগে সবটা শোনো। যেন দূর থেকে হাত তুলে তারাপদর উদ্যোগে জল ঢাললেন শ্যামল। আমার কথাটা এখনও শেষ হয়নি।
কিন্তু কথাটা কী শ্যামল?
সেটা বলব বলেই তো এই রাতের ফোন করছি। কটা বাজল বলতে পারো?
রাত একটা বেজে গেছে।
আমার হাতে আজ ঘড়ি নেই। এই বুথেও কোনো ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি না।
বুথ!
হ্যাঁ, খিদিরপুরের এই বুথটা থেকেই ফোন করছি তোমাকে।
খিদিরপুর কেন!
প্রথমে আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। শ্যামল যেন হাসলেন, ও প্রান্তে। গেছলাম মুর্শিদের বাড়ি। ওর বাড়িটা মেদিনিপুরে। ভালো গল্প লিখছে। হয়তো পড়ে থাকবে। ওখানে নেমতন্ন ছিল। বলেছিলুম খাওয়াবি তো মুর্শিদ। মাংসটা ভালো রেঁধেছিল মুর্শিদের বউ। ওখানেই লাট্টুর সঙ্গে দেখা।
কে লাট্টু!
ওই সফিকুল। রাত দশটা নাগাদ একটা ছেলে এল। হাড্ডিসার চেহারা। চোয়াড়ে মুখ। উস্কোখুস্কো চুল।। ডান হাতে ব্যান্ডেজ। এসে থপ করে মেঝেয় পড়ল। আমি অবাক তাকিয়ে আছি। হঠাৎ দেখি পেছনে আর একজন। তেলচিটে নোংরা শালোয়ার কামিজ,পায়ে হাওয়াই চটি, রোগা সাদাটে চাউনি। কোলে একটা বছর খানেকের বাচ্চা।
মুর্শিদকে বলল, দুলাভাই, ওর গায়ে তিন জ্বর। হাসপাতালে নিতে বলেছে ডাক্তার।
মুর্শিদ আমার দিকে তাকিয়েছিল। এ হল সফিফুল শ্যামলদা।
আমি ছেলেটার দিকে তাকিয়েছিলুম তারাপদ। জ্বরো শরীরে একটু একটু বোধহয় কাঁপছিল। একশো তিন মানে তো বাড়াবাড়ি রকমের। হাতে কী হয়েছে তোমার!
হয়েছে স্যার।
হয়তো সেপটিক হয়ে গেছে শ্যামলদা। তাই হাসপাতালে দিতে বলেছে ডাক্তার। কথা বলে মুর্শিদ উঠে গেল।
দেখলুম আমার সামনেই গল্পের নায়ক। বাঁ হাতের আঙুলে ঘা। ঘা দিয়ে পুঁজ রক্ত রস গড়িয়ে ব্যান্ডেজ ভিজিয়ে দিচ্ছে। চমৎকার একটা পচা গন্ধ পাচ্ছি। চব্বিশ বছরের একটা তাজা যৌবন থেকে উঠে আসছে ঘায়ের গন্ধ। এবার বায়োডাটা দরকার। ছেলেটার বদলে ওর বউকে বললাম, কী করে হল এমন!
বউটা কিছু বলার আগেই ডুকরে কেঁদে ফেলল। কোলের ছেলেটাও কাঁদল। মেটিয়াবুরুজের বস্তির বউ কাঁদছে। তারাপদ, তখন আমার সামনে আধগেলাস মদ, ডিসে চিকেন পকোড়া। গেলাসটা তুলে সবটা গলায় ঢালতেই বউটার কান্না গেল ভেতরে।
রাত বারোটায় মোমিনপুরের ডায়ামন্ডহারবার রোড ধূ ধূ ফাঁকা। বাসফাস নেই। মুর্শিদকে বললুম তুই যা, আমি এখান থেকে ট্যাক্সি ধরে নোব।
মুর্শিদকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি। ট্যাক্সি নেই। শুধু হেঁটে যাচ্ছি। আমার ভেতরে তখন সফিকুল। মেটিয়াবুরুজে কোহিনুর টেলারিং শপে পঞ্চাশটা মেসিনে ডেলি শ'দুয়েক জামা তৈরি হয়। দুশো জামার পনেরো থেকে ষোলোশো বোতামঘর তৈরি করে। ঘরে বোতাম বসায় সফিকুলের সঙ্গে আরও চারজন। পার বোতাম ছত্রিশ পয়সা। তার মানে তিনটে বোতামে এক কাপচা হয় সফিকুলের। ছ'টা হলে চায়ের সঙ্গে বিস্কুট। পার ডে দুশোটা বোতাম বস্তিবাড়ির ভাড়া মিটিয়ে ছ-জনের ডালভাত গোস্ত। এই হায়ারকি নিড মেটাতেই সফিকুলকে দুশোটা বোতাম ঘর বসাতেই হয়। বাঁ হাতের তর্জনীতে পেতলের আঙুলস্থানা লাগানো থাকলে অপটিমাম প্রোডাকশনে পৌঁছোনো যায় না। ফলে হয় কী, টোপি না-লাগানো আঙুলে সরু পাতলা ছুঁচ বার বার ক্ষত করে দেয়। তা থেকে ওই ঘা। ওটা বোধহয় গ্যাংগ্রিনে টার্ন নেবে। তারাপদ শুনছ!
তারাপদ আস্তে করে, হ্যাঁ বলেন। শুধু শোনা নয়। এবার ভাবনাটা একটা কংক্রিট শেপএ আসছে। ইট্স এ সিম্পল কেস রিলেটেড টু হেল্থ ডিপার্টমেন্ট। হেল্থ সেক্রেটারি এ সরকারকে সকালেই ফোন করে দেওয়া যায়।
শ্যামল বললেন, হ্যালো!
তারাপদ বললেন, হ্যাঁ শুনছি।
তোমার কি ঘুম পাচ্ছে তারাপদ!
না ঘুম পায়নি, ভাবছি।
কী ভাবছ?
ওই ছেলেটার কথা। ওই সফিকুল আর কি। ও কি ভর্তি হতে পেরেছে! যদি না হয় তাহলে...
তারাপদ শোনো, আমার দরকারি কথাটা এখনও শেষ হয়নি কিন্তু।

তারাপদ বুঝতে পারলেন না। ঘরের বাতাস আরও গুমোট লাগল। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল কপালে গালে। আজ কি অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু অতিরিক্ত হলেও কোনোদিন মাতাল হতে দেখেনি শ্যামলকে। উলটো পালটা যা কিছু তার ভেতরেও মনস্ক এক সচেতনতা থাকে।

তারাপদ বললেন, হ্যালো।

হ্যাঁ বলছি।

শ্যামল, তুমি সত্যি করে বলো কোথা থেকে ফোন করছ!

কাশীপুর ছোটো মেয়ের বাড়ি থেকে। শ্যামল হেসে উঠলেন।

তাহলে খিদিরপুরের বুথ থেকে নয়।

না কেন? তখন আমি খিদিরপুর থেকেই ফোন করেছি। আর এখন কাশীপুর মেয়ের বাড়িতে। শ্যামল তার গল্পের মতোই যেন রহস্যময়। কথা বলছেন। আমার সামনে খোলা জানালার ওপারে পশ্চিম আকাশে বাঁকা চাঁদের আলো খুব ম্লান হয়ে গঙ্গার ওপর কিরণ দিচ্ছে। ওদিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়াও আসছে একটু একটু। আজ বিকেলে ইতিকে নিয়ে এখানে এসেছি। অনেকগুলো চিকেন পকোড়া খেয়েছি। সঙ্গে এক ডিস স্যালাড। এখন এখানেই কদিন থাকব। আজ সন্ধেবেলা রিপোর্ট নিয়ে এল।

কিসের রিপোর্ট!

উত্তরে অন্য প্রান্ত থেকে হাসি ভেসে এল। এই বিরতির মধ্যবর্তী অন্তরায় তারাপদ দ্বিতীয়বার বললেন, কার রিপোর্ট শ্যামল?

ধরো বিমল হাজরার রিপোর্ট।

বিমল হাজরা!

হাঁ আমাকে মেসোমশাই বলে ডাকে বিমল। আঠাশ তিরিশের যুবক। যৌবনের ওজন মেরেকেটে পঁয়তাল্লিশ কিলো। গ্রাজুয়েট। কাশীপুরে গঙ্গার ধারে পৈতৃক বাড়ি ওদের। নিট আর বিল গেটস্ থেকে জব লিঙ্কড্ এই কোর্সের পরই চাকরি দেড় হাজার টাকার সকাল নটা থেকে রাত নটা। প্রথম মাসের মাইনে তিন তারিখে, দ্বিতীয় মাসে বারো তারখে, তৃতীয় মাসে গুপ্তা অন লাইন সার্ভিসের মালিক টাকা দিতে ভুলে গেলে চাকরিটা ছেড়ে দেড় বিমল। এই ছাড়ার খবরটা সবাই জানে। কিন্তু তিরিশ বছর ধরে একটু একটু করেজমানো টাকারা পি এফ অ্যাকাউন্ট থেকে বিল গেটস্ কিংবা ইনফোসিস চলে যাচ্ছে একথা শঙ্কর হাজরা ছাড়া আর কেউ জানতে পারছে না।

শ্যামল বোধহয় হাঁফাচ্ছিলেন। একসঙ্গে অনেকগুলো কথা ননস্টপ বলার পর হয়তো দমে ঘাটতি হয়েছে। শ্বাসের একটা চাপা কষ্ট শুনতে পেলেন তারাপদ। শ্যামল কি ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত। দূর থেকে তা বোঝা যায় না। বিমল হাজরাকে চিনতে পারছেন কিন্তু তাকে নিয়ে কী করবেন তিনি।

ফোনের ভেতর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস শুনলেন তারাপদ। শ্যামলের কি শরীর খারাপ! শ্যামল আজ তোমার শরীরটা কি ভালো নেই।

শ্যামল ও প্রান্তে হাসলেন। ঠিকই ধরছে তারাপদ। রিপোর্টটা শোনার পর থেকে, যদিও মেয়ে সবটা বলেনি আমায়।

চমকে উঠে তারাপদ বললেন, কিসের রিপোর্ট, কী আছে রিপোর্টে!

খারাপ খবরই আছে। শ্যামল হাসলেন। তবে ও নিয়ে ভাবছি না ভাবছি বিমল হাজরার কথা। যারা বিগত দশ বারো বছরে হাজার কোটি টাকা কোর্স ফি খাতে খরচা করে ফেলেছে। ইতিহাসটা তেমন করে লেখা হল না আমার।

ইতিহাসের কথায় শাহাজাদা দরাশুকো নামটা মনে এল। শ্যামলের অন্যতম সেরা উপন্যাস। ইতিহাসের নতুন করে উন্মোচন। বিস্মৃত অবহেলিত দারাকে প্রায় চারশো বছর বাদে আবার নতুন করে জন্ম দিলেন একজন লেখক।

তারাপদ নিমগ্ন গলায় বললেন, দূর থেকে তোমাকে একটা প্রণাম করছি শ্যামল।

কেন!

তুমি শাহাজাদা দারাশুকো-র লেখক।

তোমার ভালো লেগেছে তারাপদ।

শুধু ভালো নয়। অমন একটা লেখা লিখতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যেতে আমার।

শ্যামল হাসলেন। আমিও তাই ভেবেছিলুম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আরও কিছু ইতিহাস না লেখা রয়ে গেল।

শ্যামলের গলা কেমন যেন বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়ে যেতে শুনলেন তারাপদ। ঘড়ির কাঁটা দেড়টা পেরিয়ে গেছে কখন। ঘুমও চলে গেল শরীর ছেড়ে। বাইরে মধ্যরাত ক্রমশ ঢলে পড়ছে পরবর্তী দিনের দিকে। আকাশের ফালি চাঁদ আরও ম্লান হয়ে পাড়ি দিচ্ছে পশ্চিমে। নীচের রাস্তা জনহীন। পুলিশের প্যাট্রল ভ্যানের শব্দও নেই। দূরে শুধু কটা কুকুর ডেকে উঠল। মিনতির নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে হঠাৎ জলতেষ্টা পেল তাঁর। হাত বাড়িয়ে জলের বোতলটা তুলে নিয়ে গলায় ঢাললেন তিনি।

তারাপদ শুনছ। শ্যামল আবার কথা বললেন, এটা শোনো।

কা আ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ।।
তারাপদ আস্তে বললেন, মনে হচ্ছে চর্যাপদের লাইন।
আর একটা শোনা --
নগর বাহিরে ডোম্বী তোহেরি কুড়িয়া।
ছোই ছোই জাই সো বামভন নাড়িয়া।।
প্রথম পঙ্‌ক্তিতে দর্শনের কথা। দ্বিতীয়টাতেও দর্শন। তবে এ দর্শন সমাজদর্শন, সত্যদর্শন। ফড়েরা যে ইতিহাস লেখে তাতেসত্য থাকে এক আনা, পনেরো আনা ভেজাল। খাঁটি ইতিহাস লেখা থাকে একরোখা কবির কবিতায়, আর সক্ষম গল্পকারের গল্পে। 'নগর বাহিরিরে ডোম্বী তোহেরি কুড়িয়া ...' হাজার বছর আগের এক কবির প্রতিবাদী উচ্চারণ, 'ছোই ছোই জাহ সো বামভন নাড়িয়া ।' নিজের প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ উচ্চশ্রেণির এই স্খলনের চিত্র কবি রেখে দিয়েছেন আমাদের জন্যে। এ হল নির্মম সত্যভাষণ।
তারাপদ! আবার দম নেন শ্যামল। বড়ো করে শ্বাস ফেলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের এমন চক্রান্ত আর হীনতার কথা চর্যাপদে ধরা আছে। সান্ধ্যভাষার রহস্যময়তার ভেতর ছড়িয়ে আছে অত্যাচারের গোপন ইতিহাস। লেখক কবি তাদের রচনায় এই কাজটিই করে যান।
আশ্চর্য শ্যামলের এই নিমগ্ন কথাগুলির কারণ বুঝতে পারেন না তারাপদ। এক কঠিন নীরবতা যেন চারপাশ জুড়ে নেমে আসে। স্তব্ধতায় বাকরুদ্ধ হয়ে যান তারাপদ। তার মাথার ভেতর সব জট পাকিয়ে নেমে আসে। তখন আস্তে বলে ওঠেন, শ্যামল।
হ্যাঁ বলো তারাপদ।
শ্যামল তুমি আমাকে ফোন করেছিলে---
বাক্যটি অসমাপ্ত রেখে অপেক্ষা করেন তারাপদ। ও প্রান্ত থেকে আলগা হাসি ভেসে আসে। হাসি শেষ হলে কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে রিসিভারে।
শুধু তোমাকে নয়, তোমার আগে ফোন করি স্বপ্নময়কে। আমাদের পরে একজন খুব সম্ভাবনাময় লেখক। তুমি চেনো নিশ্চয়ই।
হ্যাঁ চিনি।
ওকেও বললুম, মণি মাসি, শ্যামলী, সফিকুলের কথা। ওর পর আর একজনকে ধরলুম, কে কিন্নর। একেবারে অন্যরকম লেখক। ওকেও বললুম।
ওদের কী বললে শ্যামল! উত্তেজনায় গলাটা কেঁপে গেল তারাপদর।
শ্যামল শান্ত গলায় বললেন, আমার রিপোর্টের কথা বললুম ওদের। ছোটো মেয়ে বাড়ি ফিরতেই দেখলুম মুখটা ভারী আর থমথমে। মুখে দুঃখ লেগে আছে। ও আমার রিপোর্ট আনল আজ।
কিসের রিপোর্ট?
ফাইনাল জাজমেন্ট দেবার আগে গলাটা বুঝি পরিষ্কার করে নিলেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর আস্তে ধীরে বললেন, আমার মাথার ভেতর কর্কট রোগ বাসা বেঁধেছে তারাপদ। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার।
বিদ্যুৎ চমকের মতো শিহরণ খেলে গেল শরীরে। এটা কি ঠাট্টা না সত্যি! থরথর শরীর কাঁপল। আমাদের সময়ে সবচেয়ে সেরা লেখক শ্যামল। দারুণ উত্তেজনায় ফোনের এ প্রান্তে তারাপদ চিৎকার করে ডাকলেন, শ্যামল।
আশ্চর্য কোনো শব্দ নেই।
আবার ডাকলেন, শ্যামল আমি তারাপদ বলছি।
এবারেও বড়ো শান্ত চারপাশ। ফোনে ও প্রান্ত শব্দহীন। চারপাশ জুড়ে এক মিহিন স্তব্ধতায় ক্রমশ শীতল হয়ে যেতে লাগলেন তারাপদ রায়।
:

ভাঙাচোরা মানুষ

নির্ঝর সেন

:

... সন্দীপের হঠাৎ মনে হয় সে নিজেও একটা গাছ হয়ে গেছে, মাটির গভীরে তার শিকড়, পাতায় পাতায় তার মর্মর ধ্বনির শিহর ণ...

।। ১ ।।

সকালবেলা সন্দীপ ছাড়া পেল হাসপাতাল থেকে।

তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ডাক্তার সোম বললেন --- এখন তো দিব্যি ভাল আছো ! তবু একটু সাবধানে থাকবে।

সন্দীপ প্রশ্ন করল --- আমি কি সেরে গেছি ?

ডাক্তার সোমের ঠোঁটদুটো হঠাৎ যেন অদ্ভুত ভাবে নড়তে থাকে ঃ অনেকটা ভুল ক্ল্যাপ্‌স্টিক দেওয়া ফিল্মের সংলাপের মতো।

----নিশ্চয়ই (একি সারবার) ! একদম ফিট্ (আসতেই হবে আবার) !

পরস্পর বিরোধী এই বিশ্রী, গোলমেলে কথাগুলো, হতচকিত করে দেয় সন্দীপকে। কোন্‌টা ডাক্তারের ঠিক কথা? প্রথম টুক্‌রোটা ? নাকি, পরের বার যেটা শুনলো ? সে কি শুনতে ভুল করেছে ? না কি এটা কোন অসুখের লক্ষণ ? সে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের দিকে।

----ঠিক বুঝলাম না, স্যার ! আমি কি সত্যিই সেরে গেছি

----দ্ধান্দ্বব্দ, ছনপ্পন্ধাপ্সব্দব্দনস্তুন্দ্বগ্ন

জুতোর শব্দ তুলে, ডাক্তারবাবু মসমসিয়ে চলে যান এমারজেন্সির দিকে।

বোকার মতো সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সন্দীপ।

:

হাসপাতালের গেটের বিশাল একাট কৃষ্ণচূড়া গাছ। তার বিবর্ণ ডাল, পাতাগুলো দমকা হাওয়ায় দুলতে দুলতে, ফিস ফিস করে ব লে উঠলো ---- আর একজন --- আর একজন --- !

একপা বাড়িয়েই আবার থমকায় সন্দীপ । এ-সবের মানে কি ? গাছেও কি কথা বলতে পারে ? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে প্রায় নি জের মনেই বলল--- কে, আর একজন ?

----তুমি । আমার - ই-মতো!

সন্দীপ এতক্ষণে বেশ বুঝতে পারে , সে আদৌ সুস্থ হয় নি। তা না হলে, ডাক্তার সোমের কথাগুলোই বা এমন গোলমেলে লাগল কেন ? তাছাড়া, গাছেরা কি কথা বলে ? সে কি সাধু, না জগদীশচন্দ্র !

:

শীতের নিঃশব্দ ধূসরতা ছড়িয়ে পড়েছে বিজ্ঞাপনে - মোড়া শহরের পথে। বিবর্ণ, বিষণ্ন গাছের সারি, ট্রামের ঘন্টারশব্দ, ফুটপাতে ফেরিওয়ালার চিৎকার, কলেজের রঙিন ছাত্রীরা নিবিড় গল্প করতে করতে চলে যাচ্ছে। চারপাশের এই সাধারণ দৃশ্যগুলি দেখে

ত দেখতে, অনেকদিন পর, আজ হঠাৎ সন্দীপের নতুন করে বেঁচে থাকার ইচ্ছে হয়। আঃ, কতদিন পর ? কতদিন সে ওই মানসিক - হাসপাতালের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে ছিল ? কি হয়েছিল তার ? সিজোফ্রেনিয়া ? প্যারানেইয়া ? না অন্যকিছু ? এমন কিছু, যা হয়ত বইতে লেখা নেই। এতটুকু মস্তিকের মধ্যে কি যে আছে মানুযের ? সীমাহীন, অন্ধকার অতল সমুদ্র ? কিছুই তো বুঝি না।

:

ফুটপাতের পাশে একটা চায়ের দোকানে গলাটা ভিজিয়ে নিতে বসে সে।

চায়ের কাপে সবেমাত্র একটা চুমুক দিয়েছে, দোকানদার বললে --- একটা বিস্কুট দিই তোকে ?

এ আবার কি কথা !

চেকলুঙ্গি, গেঞ্জি পরা, বেঁটেখাঁট চেহারার এই গোমড়ামুখো লোকটা এভাবে কথা বললো কেন ? একটু অবাক হয়ে তাকাতেই, লোকটা এবার ফিক্ করে হেসে ফেলে --- শালা, পবনকে ভুলে গেছিস ? গরিব বলে ? সুরেন্দ্রনাথে তিন বছর একসাথে রগড়ালাম,

---এর মধ্যেই সব ভুলে গেছে ?

সন্দীপ তবুও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। ভাল করে শোনার চেষ্টা কলে, এর ভেতরেও কোন লুকোনো কথা আছে কিনা।

---সত্যিই চিনতে পারিস নি ?

----পারব না ?

---তবু ভাল ! নে, বিষ্কুট খা।

ফুটপাতের ওপর একটা টেবিল পেতে, চায়ের দোকান বসিয়েছেন পবন। নিচে একপাশে, স্টোভে চায়ের জল ফুটছে।

কেট্‌লির চা কাপে ঢালতে ঢালতে পবন বলে --- চাকরি - বাকরি তো আর হল না ! তাই একটা দোকানই দিলাম শেষ পর্যন্ত। চলে যাচ্ছে মোটামুটি।

---ভাল করেছিস।

---তারপর, তোর খবর কি ?

সন্দীপ মাথা নেড়ে বললো ---তেমন কিছু না। একটা অফিসে কাজ করতাম। চার বছর হল, বসিয়ে দিয়েছে।

---সে কি রে ! ত্রখন কি করছিস, তাহলে ?

---কিচ্চু না ! এই তো আজ সকালে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম।

পবন এবার অবাক হয়ে যায়।

----কেন, কি হয়েছিল

এর ভেতরে সত্যিই কোন লুকানো কথা নেই। একে বলা যায়।

সন্দীপ বলল --- তেমন কিছু না। এই একটু মাথার গোলমাল। চলি রে-- ! কত যেন হল তোর ?

পয়সা নিতে চাইল না পবন। সে শুকনো মুখে বলল --- কাছেই তো থাকি, চল না----।

সন্দীপ বলল --- না রে, অন্যদিন হবে। আজ দু-একজনের সঙ্গে একটু দেখা করতেই হবে। তারপর যাব হালিশহরে, বয়স হয়েছে মা -য়ের, অনেকদিন দেখি নি।

:

।। ২।।

সন্দীপ ভেবে দেখেছে, যে ও অভি -নেতা, ---এই দুইয়ের মধ্যে অনেক দিক থেকেই বেশ একটা মিল আছে !

দুজনকেই কণ্ঠস্বরের যত্ন নিতে হয় ; অভিনয় দক্ষতার সাথে সাথে, দুজনেরই চাই কণ্ঠস্বরের প্পস্সত্ত্বপ্তব্ধনঙ্ক, আর সংজ স্বাভাবিক ভাবে, যে কোন বিষয়কে নাটকীয় ভঙ্গীতে উপস্থাপনা করবার প্রতিভা, ----হোক না তা
আগাগোড়া মিথ্যে !

:

সন্দীপের বন্ধহয়ে যাওয়া অফিসের ইউনিয়ান - সেক্রেটারি বিমান বাঁডুজ্জের নেতা বলে বেশ একটা খ্যাতি আছে।এমন কি অফিসের ইউনিয়ানের বাইরেও। কোনো একটি তথাকথিত মার্ক্সবাদী দলের ও মাঝারি মাপের নেতা সে, কিন্তু তার মুখোমুখি হলে, সন্দীপরে প্রথমেই একটা কথা মনে হয়, যে লোকটা এ লাইনে না এসে, যদি অভিনয়ে আসত, তাহলে দেশ সত্যিই অনেক কিছু পেত।

মানিকতলায় একটা ছিমছাম ফ্ল্যাটে থাকে বিমান। এর আগেও কয়েকবার এখানে এসেছে সে; কিন্তু আজ ঢোকার মুখেই বাধা পেল সন্দীপ। গেটের সামনে টুলে বসে আছে এক নেপালি দারোয়ান। সে বললে --- কে কাকে চাই ?

সন্দীপ বোঝে, যে বিমান ইতিমধ্যেই আরো বড় হয়ে গেছে ; আজকাল সে দারোয়ান ও পুযছে।

সে সংক্ষেপে বলল --- বিমান বাঁড়ুজ্জেকে ডাক্ । বল্ সন্দীপ এসেছে। ঠিক চলে আসবে।
---সাহেব খুব ব্যস্ত।
সন্দীপ এবার মেজাজটা ঠিক রাখতে পারে না। চিৎকার করে বলে। তুই ডাকবি, না আমিই যাব? স্টাফদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মেরে দিয়ে, সাহেব হয়েছে শালা !
কথা কাটাকাটির শব্দে বিমান একটা ছোট্ট ভুল করে বসে। সে নিজেই এবার বেরিয়ে আসে ঘরের পর্দা সরিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা সাদা হয়ে যায়।
---তুই!
---চিনতে পেরেছিস তাহলে? এটাকে সরতে বল্ কথা আছে তোর সাথে।
---ভাই আজ তোকে সময় দিতে পারব না (শালা মারবে না তো !) এক্ষুনি রাইটার্সে যেতে হবে।
আবার একটা ধাপ্পা।
---তুই গেট খুলবি কি - না ? আমার হিসাব চাই, বুঝিয়ে দে।
---(এ বাবা, সে তো কবেই তামাদি) শোন্ ভাইটি, এই বিষয়েই আজ অর্থমন্ত্রীর সাথে বসছি আমরা. (আর কত মরব ?) সঙ্গে পালদা যাচ্ছে, সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ান নেতা, কমরেড অমুকচন্দ্র তমুক ---
:
বিমানের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে, ওর অনর্গল অর্থহীন, স্ববিরোধী, মিথ্যে কথাগুলো শুনতেশুনতে, শুধু ঘৃণা নয়, হাসি নয়,---হঠাৎ একটা করুণা অনুভব করে সন্দীপ । তীব্র যন্ত্রনায় তার মুখটা বিকৃত হয়েযায় । তবু সে শান্তভাবে বলে --- আজ সকালেই আমি পাগলাগারদ থেকে ছাড়া পেয়েছি বিমান । জায়গাটা খালি আছে। তোর জন্য । তোদের জন্য । যেতে হবে তোদেরও। আজ, না হয় কাল । বাঁচবি না। তোরাও বাঁচবি না।
।। ৩ ।।
উত্তর কলকাতার এই পুরোনো গলিটা সন্দীপের কত কালের চেনা। সোঁদা গন্ধে ভরা এই ঝাঁঝালো দুপুর, শালিকের ডাক, সুতৃপ্তির মিষ্টি দইয়ের ঠান্ডা স্বাদ --- মমতা, এখনো তোমার মনে আছে ?
কত বছর হয়ে গেল ? সেই যখন বিবেকানন্দ টিউটোরিয়ালে বসতাম পাশাপাশি ? দুর্গাপুজোর রাত জেগে প্রতিমা দেখা; বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গল্পে বিভোর হয়ে থাকা সেই বিকেলগুলো, ---মমতা, তোমার মনে পড়ে ?
:
গাঢ় নীল রঙের কাটের দরজার ওপর, সাদা রঙ দিয়ে বেশ বড় বড় করে লেখা ঃ ২৪১- এ, হরিশ দত্ত লেন। এইতো সেই বাড়ি। কত মধ্য দুপুর, বিকেল আর সন্ধ্যা কেটেছে এর নির্জন চিলেকোঠায়। দরজার ওপরে কলিং বেল বাজিয়ে একটু অপেক্ষা করে সন্দীপ। একটু পরে দরজা খোলে। হ্যাঁ, মমতা -ই তো!
সেই এক রকম -ই আছে। ছিপছিপে, সুন্দর, নীল সুতির আটপৌরে চমৎকার মানিয়েছে।
----একি, তুমি!
মমতাকে দেখে মনে হল, যেন সে ভূত দেখছে চোখের সামনে।
----হ্যাঁ। আজকেই ছেড়ে দিল কি - না ! খেতে বসেছিলে বুঝি ?
মমতার এঁটো হাতে তখনো লেগে আছে ভাত - ডাল - তরকারির স্নিগ্ধ সুবাস।
কতদিন, ---কতদিন হয়ে গেল মমতা, তোমার আজ বোধহয় মনেই পড়ে না ; এমনি এক ভরা দুপুরবেলা, তুমি আমায় নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছিলে। আজও বড় ক্ষিদে পেয়েছে মমতা ; কিছু খেতে দেবে ? খাইয়ে দিতে দিতে না পারো, ফিরিয়ে দিও না! বলতে ইচ্ছে করে এইসব । বলা যায় না।
:
মমতা একটু ইতঃস্তত করে আড়ষ্টভাবে বলল --- তুমি কি এখন ভেতরে আসবে নাকি ?বাড়িতে দাদা - বৌদি কেউনেই কিন্তু।
হাসি পায় সন্দীপের । এ কথাটাও কি জিজ্ঞাসা করতে হয় ? না- সম্পর্ক এমন -ই ? একদিন, অনাদরে সে কোথায়যে পড়ে থাকে মনেও পড়ে না। তোমার ওই চোখের ভাষা বলে দিচ্ছে মমতা, যে আমরা এখন অনেক দূরের !
সন্দীপ তবু মৃদু স্বরে বলে --- তেষ্টা পেয়েছে খুব । একটু জল হবে?
---এসো তাহলে ভেতরে (অসহ্য) !
শেষের টুকরো কথাটা অবশ্যই তার ঠোঁটে ছিল না কিন্তু সেই মৃদু ফিস্‌ফিসানি, ডাবিং - করা সংলাপের মতো উচচারণ স্পষ্টই শুনতে পায় সন্দীপ । তার বুকের ভেতরটা স্তব্ধ, হিম হয়ে আসে। নাঃ, আর কোথাও তার যাবার নেই।
বারান্দায় একটা ছোট টুলের ওপর বসে সন্দীপ।
----হালিশহর গিয়েছিলে ?

জলের গ্লাশ এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে মমতা।
----কই আর গেলাম ! বললাম যে আজই সকালে ওরা রিলিজ করে দিয়েছে আমাকে ---।
---ও ঃ!
মমতা দরজার পাশে ; সারা শরীরে কেমন অস্বস্তি নিয়ে , চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন! এই বিশ্রী চেহারা, রুক্ষচুল, মুখে এক রাশ কাঁচা পাকা দাড়ি) !
ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে সন্দীপ শুধু তাকিয়ে থাকে মমতার মুখের দিকে। মমতা আবার জিজ্ঞাসা করে...
----কিছু বলছ না যে ?
----কোন কথাটার উত্তর দেব ? তোমার মুখের ? না, পরেরটা ? যেটা তোমার ভেতরের ?
মমতা হতচকিত হয়ে যায়।
---তার মানে ? (এ তো একই রকম আছে দেখছি ! কিংবা, আরও খারাপ)
---ঠিকই ধরেছ মমতা। আমি পুরোপুরি সারিনি বোধহয়। কেননা মানুষের ভেতরের সব কথাই আমি শুনতে পাই। এমন কি, বোধহয় গাছপালার কথাও --- ! আমি জানিনা, কি ভাবে এটা হচ্ছে ; আর তবুও ওরা আমাকে ছেড়ে দিলে। আমি কি করব ?
আবার মমতা ঠোঁট নাড়ে। কিন্তু শুধু ওর ডাবিং করা সংলাপটুকুই শোনে সন্দীপ।
--(কি চায় লোকটা ? পুরোনো প্রেমের কাসুন্দি ঘাঁটতে চায় নতুন করে ? কিন্তু তমাল যদি জানতে পারে ?)
জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নড়বড় করে উঠে দাঁড়ায় সন্দীপ । তরপর খুব মৃদুস্বরে বলে ---না ---না, তমাল কিছুজানবে না। তমাল কেন, পৃথিবীর কেউ কিচ্ছু জানবে না। কিন্তু, আমি কোন দাবী নিয়ে তো তোমার কাছে আসিনি মমতা ! শুধু একটু দেখতে এসেছিলাম তোমায়। কারণ, একদিন আমিও তো ভালবেসেছিলাম ----। চলি, তুমি ভাল থেকো।
।। ৪ ।।
শিয়ালদা থেকে শান্তিপুর - লোকালে নৈহাটি। সেখান থেকে হালিশহর, যেখানে সন্দীপ বড় হয়ে উঠেছে --- যার নিবিড় শান্ত ছায়ার মধ্যে সে একদিন দেখেছিল শান্তির স্বপ্ন, সুখ আর ভালবাসার আশ্রয়।
দু - পাশে ছাড়িয়ে থাকা বিষন্ন গাছপালা । ধূসর শীতের সন্ধ্যায় তখন দোকানগুলিতে একে একে আলো জ্বলে উঠছিল।
আজকাল আর তেমন ক্ষুধাতৃষ্ণা বুঝতে পারে না সন্দীপ। সময়ে না খেলে, হয়ত মরে-ই যায় ক্ষিদে - টা । তবু সে বসে গিয়ে একটা খাবার দেকানে।
এই দোকানদার তার অনেকদিনের চেনা ; এক পাড়াতেই কাছাকাছি বাড়ি। ডিম- পাঁউরুটির অর্ডার দিয়ে, একটা বিড়ি ধরায় সে। টেবিলের ওপর সকালের বাসি খবরের কাগজ ; আস্তে আস্তে চোখ বোলচ্ছিল। দোকানী বলল --- আজই এলে বুঝি ?
----হ্যাঁ।
----মায়ের মৃত্যু - সংবাদটা পেয়েছো তাহলে ?
পাঁউরুটির টুকরোটা হাতের মধ্যেই থেকে যায়। হঠাৎ পাথরের মতো শুদ্ধ, নিস্পন্দ হয়ে যায় সন্দীপ।
ধূসর হিম সন্ধ্যার বাতাস, বুকের হলুদ ঝরা - পাতাগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।
মা নেই ?
।। ৫ ।।
ঘরের চাবিটা দিতে দিতে রাঙা - পিসিমা বলল ---- সেই যখন এলি বাবা, আর কটা দিন আগে আসতে পারলি না ? মরার আগে ছেলের হাতের জলটুকুও পেল না বুটি ! তারপর সেই পাড়ার লোকেরা ---
ঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করে না। তবুও একবার দরজা খোলে। শূন্য ঘর ; শূন্য বিছানা। পায়ে পায়ে সে বেরিয়ে আসে বারান্দায়; তার পর উঠোনে। লতিয়ে উঠেছে বুনো লতাপাত। দু - চারটে ফল - ফুলের গাছ। তারই মধ্যে দিয়ে, বিষন্ন মৃদু মর্মর ধবনি তুলে , বয়ে যাচ্ছে সান্ধ্য বাতাস।
কি বলছে সে ? কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে সন্দীপ।
----নেই, কেউ নেই !
উঠোনের এক কোনে কতকালের সেই চাঁপা গাছটা । মায়ের নিজের হাতে বসানো একসময় প্রচুর ফুল ফুটতো গাছটায়। আজকাল আর ফোটেকি ?
নিবিড় মমতায় গাছটায় হাত রাখে সে।
স্পষ্ট একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পায়। ঠিক মায়ের মতো।
----কেমন আছিস?
----কেমন দেখছো ?
----ভালো না।

----তবে জিজ্ঞেস করছো কেন ? তুমি কেমন আছো ?
----আমি তো ভালই থাকতে চাই ; কিন্তু তোকে দেখতে পাই না যে !
সন্দীপ মৃদু হাসে।
----আমি ভাল নেই। আমাকে সবাই ভুলে গেছে।
----আমি তোকে ভুলিনি সন্দীপ । বড্ড রোগা হয়ে গেছিস তুই।
:
চাঁপা গাছটার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, সন্দীপের হঠাৎ মনে হয় সে নিজেও একটা গাছ হয়ে গেছে ; মাটির গভীরে ত ার শিকড় ; পাতায় পাতায় তার মর্মর ধবনির শিহরণ !
----আসলে, আমাকে আর কেউ চায় না !
----আমি চাই।
----আমি ঠিক কারু কথা বুঝতে পারি না। আমার কথাও কেউ বোঝে না।
----আমি বুঝি। তুই সব কথা আমাকে বলবি।
----বলব।
----তুই আমাকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না। আমার আর কোথাও যাবার নেই ! কেউ নেই আমার।
তাদের এইসব অর্থহীন, অসংলগ্ন কথার ভিতর দিয়ে অবিরল বয়ে যাচ্ছিল সন্ধ্যার ধূসর বাতাস, আর ঝরে যাওয়া হলুদ পাতার ি বষন্ন মর্মরধবনি।

একটা অন্ধকার সম্মেলন, তার আলো

বিশ্বজিৎ অধিকারী

অন্যান্য আর পাঁচটা দিন যেমন হয় আজও তেমনই। ভাঙা বেড়া টপকে চক্কোত্তি- ভিটেতে পা দিতেই - গাটা ছমছম করে উঠল শঙ্কর। জল-কালা নিয়ে দু-আড়াই বিঘের আবাড়। ছোট বড় তিনটে পুকুর পিছন দিকে, বলতে গেলে জলে মাছে সমান। তারপর আম-জাম-সবেদা-কাঁঠালের বাগান। তারও দক্ষিণে প্রশস্ত খামার, টিনের ছাওয়া মস্ত ধানের মরাই, আর নিস্তব্ধ কোঠা বাড়ি। খামারের একপাশে সার সার ধানের গাদা। বাড়ির সামনের দিকে আরও একটি পরিষ্কার বড় পুকুর। তবে শঙ্করের আনাগোণা ভিটের পিছন দিকে তিনটে পুকুরেই।

সমস্ত সমৃদ্ধ আয়োজন এই, মাত্র দ্বিতীয় প্রহরের আঁধারেই একটান ঝিঁ ঝিঁ ডাকের ভিতর ঝিম মেরে আছে। তাই খুব সাহসী লোকেরও এ সময় এখানে এসে ভয় পাওয়া লজ্জার নয়। শঙ্কর দোলাই পোড় খাওয়া মানুষ। অন্ধাকারের চোখ মুখ তার চেনা। বিপদের ঘ্রাণ আগাম এসে তার নাকে ঝাপটা মেরে যায়। সেই তারও বুকটা কেমন কেঁপে ওঠে, গায়ের রোমগুলো খাড়া হয়ে যায় এখানে এলেই।

পুকুরের চারপাশে জ্বালানির গাছ। বড় বড় শিরীষ, অর্জুন হিজল। আর হাওয়া গলে না এমনই ঘন ভালকি কাঁটা এবং তরল বাঁশের ঝাড়। দিনের বেলাতেই মাটিতে রোদ পড়ে না। এখন গাঢ় অন্ধকার লেপটে আছে। সন্ধ্যের আগে বৃষ্টি হয়েছিল খানিকক্ষণ ঝিম্ ঝিম্ করে। ঝরা পাতার নিচে প্যাচপ্যাচে কাদা। একটা অদ্ভুত অন্ধ যেন থম মেরে আছে। তাতে মিশে আছে পচা পাতার গন্ধ, ভেজা মাটির গন্ধ আর পুকুর থেকে উঠে আসা পুরনো আঁশটেগন্ধ।

সুত মানে তিরিশ চল্লিশ হাত লম্বা, সরু অথচ শক্ত নাইলনের সুতো। তার এক প্রান্তে দশ বারোটা কাঁটা স্প্রিং দিয়ে সাজানো। স্প্রিং- এর চাপে কাঁটাগুলো ছড়িয়ে থাকে ফুলের পাপড়ির মত। অন্য প্রান্ত একটা তরলবাঁশের চোঙের গায়ে গোটানো। চঙের ভেতর একটা শক্ত কাঠি। মাছের পছন্দ সই চার আঠালো করে মেখে থোকা কাঁটাঢেকে গোলা পাকাতে হয়। সেই গোলা ছুঁড়ে দিতে হয় গভীর জলে। কাঠিটা পুঁতে দিতে হয় পাড়ে। আলগা সুরকি -বাঁধন থাকে কাঠির মাথায়। অল্প টানেই সে সুরকি খুলে যায়। তারপর সুতোর টানে বাঁশের চোঙ ঘর ঘর শব্দ তুলে ঘুরতে থাকে। তখনই বুঝতে হয় চারে মাছ লেগেছে। অব্যর্থ কাঁটা গুচ্ছ, নিঃশব্দ শিকার।

তিনটি পুকুরের জন্য তিনটে সুত আর মাছের চার সমেত ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় শঙ্কর। টানের চোটে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা লাল আলো করতলের আড়ালে ঢেকে সে বিড়ি খায় এবং এই অবসরে চারপাশেরপরিবেশটা বুঝে নেওয়ার জন্য উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া বিশেষ ইন্দ্রিয়কে সচল করে। তারপর ধূমপান শেষ হলে তিনটি পুকুরে তিনটে সুত ফেলে দিয়ে আঁধারে আঁধার হয়ে অপেক্ষায় থাকে।

সে বেড়ালের পায়ে হেঁটে যায় এ পাহাড় থেকে সে পাড়। ঝোপের কটাশ, ভাম, উদ্‌বেড়াল তাকে চেনে। প্রতিটি গাছের শাখাপ্রশাখা, ঝুঁকে থাকা বাঁশ, বিছুটি বন, কানকুলের কাঁটাময় ঝোপ সব- তার জানা। যেহেতু মাসের পর মাস গেলেও রাতে দূরের কথা, দিনের বেলাতেও সহসা এদিকটা কেউ মাড়ায় না। তাই এই এঁদো বনবাদাড়, শুকনো ঝরা পাতা, পুকুর, পুকুরের মাছ সবাই তাকে মালিক বলে মেনে নিয়েছে। গাছের বাকলে বাকলে লেগে আছে তার হাতের স্পর্শ, পুকুরের কাদায় ফুটে আছে তার অসতর্ক পায়ের ছাপ, হাওয়ায় মিশে আছে তার শ্বাস - প্রশ্বাস।

মাছ ধরার আসল ব্যাপার হল ধৈর্য। তা সে জিনিসটা শঙ্করের ভালই আছে। কারণ এ হল তার সাতপুরুষের বিদ্যে। তার দাদু বন মালী দোলাই, ফিসফিস করে নয়, পড়শী জানান দিয়েই শোনাত তার নিশি জেগে মাছ ধরার আজব বেত্তান্ত। এমনকি সে নাকি রাতের অন্ধকারে মাছের নেশায় পাঁচ - সাত মাইল দূরের পুকুরেও হানা দিয়েছে। নিশ্চুপ বসে থেকেছে শেষ রাত পর্যন্ত। খরিশের বিষ দাঁত, চোর ডাকাতের ছোরা, বল্লম, ভূত প্রেতের ছম ছম ছায়াকে পাশ কাটিয়ে সে কতবার তুলে এনেছে দশ পনের সেরি প্রাচীন রুই কাতলা মৃগেল। শঙ্কর বলত, দাদু ভূত দ্যাখ্‌ছো ঞ্জ বনমালী হেলায় উত্তর দিত, কত ক্ক দাদুর নেশা শঙ্করেও শিরায় শিরায়। তবে অশরীরী ছায়া কখনও তার চোখে পড়ে নি। অবশ্য কিছুই যে সে টের পায় নি তাও তো নয়। কোথাও কোথাও বন - বাদাড়ের ভেতর অদ্ভুত হাওয়া বয়। কখনও একটা পাখি ডেকে ওঠে হঠাৎ, খুব বিচ্ছিরি স্বরে, যে পাখির ডাক সে আগে কখনও শোনেই নি। আবার কখনও খোঁটা ঠোকবার মত শব্দ সোনা যায় বার কয়েক, তারপর সব চুপচাপ। হঠাৎ কোন বন-বাদাড়ের পথে অহেতুক গায়ে কাঁটা দেয়। ভয় পেয়ে যায়শঙ্কর। তবু এই বুক কাঁপানো ভয়ের ভিতর দাঁড়িয়ে থাকবার যে কি মজা তা সে অন্য কাউকে বোঝাতে পারবে না।

অন্ধকারে চরাচর ডুবে আছে। ফিস ফিস কথাবার্তা বলছে কারা। শিরীষ - অর্জুনের শাখায় শাখায় সারি সারি মৃত্যুর পাখি বসে আছে। তাদের খ্যারখেরে ডাক। সে ডাকে বুক চিরে যায়। অন্ধকার ঠেসে ধরে আছে। মৃত্যুর ভিড়ের ভেতর একা সজীব শঙ্কর, চার ফলে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়। কার গরম চওড়া জিভে তার বুক পিঠ চেটে দিয়ে যাচ্ছে। কার রিন রিন ডাক বাজছে কানের কাছ। তবু শঙ্কর সে ডাকে সাড়া দেবে না। পালিয়ে যাবে না। শীত -সদৃশ গাঢ় এই ভয়ের আয়োজনের ভিতর দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয় অন্ধকার জল থেকে তার চারে লাগা মাছ সে তুলবেই।

চক্কোত্তি বাড়ির কেউ মরলে তাকে ভিটের মধ্যে পোড়ানোই রীতি। কত - বামনির শেষ শয্যা পাতা আছে এখানে। অন্ধকারে সেই সব মাটির বিছানা শঙ্করকে মাড়িয়ে যেতে হয়। চক্কোত্তিরা ছিল হাড় কিপটে। সাতপুরুষের টিপে টিপে জমানো টাকায় এ বিপুল সম্পত্তি জমে উঠেছে আজ। অনেকে বলে মরেও না কি মানুষগুলোর স্বভাব যায় নি। কত শুকনো কাঠকুটো জমে খত হচ্ছে, কত লম্বা লম্বা বাঁশ পেকে শুকনো হয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। তবু একটুতে কারও হাত দেবার জো নেই। পরাণ মাহালি তাঁত বুনে খায়, সে কটা তরল বাঁশ কাটবে বলে ঢুকেছিল। সেশুনেছে। শুকনো কাঠ ভাঙতে এসে শুনেছে ঘড়াই বুড়িও। হঠাৎ কেউ ধারানো খ্যাব . খ্যারে গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে। দূর দূর করে তাড়ায়। তারা নাকি চিনতেও পেরেছে তাকে। অবিকল নাকি ষষ্ঠীচরণের প্রথম পক্ষ দুর্গা ঠাকরণের গলা।

শঙ্কর অবশ্য গভীর রাতের আগন্তুক হয়েও এ যাবৎ কোনও বাধা পায় নি। ঐ সব গল্পগুলো মনে পড়লে গা টা ছমছম করে অবশ্য, তার বেশী কিছু নয়। সে বরং এই বিপুল সম্পত্তির ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে মনে হাসে।এতকাল ধরে জমানো বৈভব ভোগ করার জন্য কে রইল? প্রথম পক্ষ বাঁজা বলে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল ষষ্ঠীচরণ। সেই দ্বিতীয় পক্ষও এখন রোগশয্যায়। তিরিশ পার হওয়া ছোট মেয়েকে নিয়ে বিশাল মন্দিরে একটি টিমটিমে প্রদীপের আলোর মত করে বেঁচে আছে। বড় মেয়ে মারা গেছে বছর দুই আগ। এখন কমলা বামুনির দু-চোখ বুজলেই রাজকন্যা সহ বড় সাম্রাজ্য একেবারে আগল হারা। চতুর্দিকে শেয়াল শকুনেরা সব ছোঁক ছোঁক করছে।

তবে শঙ্করের তেমন পাপ মন নয়। লোভ আছে, তবে বউ - ছেলে - পুলে নিয়ে সে ঘোরতর সংসারী। ধর্মভীরু শঙ্কর টেনে রেখেছে একটা সীমাও। আর যেখানে যে যা পারে করুক শুধু বনবাদাড় যেরা এই তিনটে পুকুর, সারাদিনও নয় খালি ক-ঘন্টা গাঢ় অন্ধকারে . র সময় তার মালিকানায় থাক, এইটুকুই সে চায়। এর দক্ষিণে সেএগোতে চায় না। আসলে শঙ্করের নেশা। ক-দিন পরপর ঘুমিয়ে রাত কাটালেই তার মনট কেমন ফস ফস করে। রাতের অন্ধক ার আর অন্ধকার জলের নিচের রূপলী জীবগুলো তাকে জাগায়। তারপর দশ বিঘের বন্দে নাড়া ফটফটিয়ে বা বর্ষার দিনে কাদা চটকিয়ে টেনে নিয়ে আসে এখানে।

ভয়ঙ্কর মশার আক্রমণ চলেছে অবিরত। সশব্দে চাপড়ে মারার উপায় নেই। কেবল অবিরাম দুই হাত ঘসেযেতে হয় সর্বাঙ্গে। মাঝে মাঝে ঘুরে দেখে আসতে হয় কাঠিগুলো। আজ এই তৃতীয় বার শিরীষ তলায় ছেঁড়া চটেরআসন ছেড়ে শঙ্কর ওঠে। এবং উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ কেন যেন তার হৃৎযন্ত্র একটু ধড়ফড় করে ওঠে। তবু অভ্যাস বসত শঙ্কর এগোয়।

পা টিপে টিপে প্রথম কাঠির কাছে যায়। কাঠির মাথায় হাত বুলিয়ে দেখে যেমন সুরকি তেমনই আছে। দ্বিতীয় সুতেরও একই অবস্থা। এক এক দিন জলের নিচের অবোধ মাছও কেমন ছলনাময়ী হয়ে ওঠে। অমন সুস্বাদু চারেও মুখ লাগায় না। রাত কাবার করে শূন্য হাতে ফিরতে হল শঙ্করকে। আজও কি তেমনই একটা দিন?

বড় পুকুরটায় যেতে হলে ছোট দুটো পুকুরের মাঝখানের সরু পাড় দিয়ে যেতে হয়। সেই পথে এগোতে গিয়েও কেন যেন আজ শঙ্করের পা আর উঠতে চায় না। যেন পেরেক দিয়ে পা দুটো মাটির সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে কেউ। গায়ে কাঁটা দেয়। অদূরে ঝোপের মধ্যে হুয়া হুয়া ডাক শোনা যায়। বুকটা কেঁপে ওঠে। খুব চেনা হলেওপ্রতিবারই শেয়ালের ডাকে কেমন একটা ভয়ের সুর মেশানো থাকে যেন। আর তার আলোয় সামনের সরু পথটার দিকে তাকিয়ে শঙ্করের হৃদস্পন্দন যেন একেবার বন্ধ হয়ে যায়। কে যেন বসে আছে পাড়ের উপর। কে ঞ্জ তার মত কেউ ঞ্জ না, তাই বা কি করে হবে ?

বজ্রপাতের চকিত আলোর পর আবার গাঢ় অন্ধকার চরাচরে সমস্ত দৃশ্য নিয়েছে। সেই ক্ষণিক আলোরস্মৃতি আর কল্পনায় মাখামাি

খ হয়ে যায়। শঙ্করের মনে হয় লোকটা ধুতি পরা, খালি গা। তবে কি ষষ্ঠীচরণ চক্কোত্তি, নাতারও আগের কোনও পুরুষ? নিজের অ
জান্তেই ঘন অন্ধকারের ভেতর এক এক পা করে পিছু হঠতে থাকে শঙ্কর। তারপর হঠাৎ পিছন ফিরে দৌড়। বাঁশ বাগান, ফলবাগা
ন, বুনোলতার তৈরী ঘন জাল, কাঁটাঝোপ ভেদ করে জীবনপণ দৌড় শেষ হয় ফাঁকা খামার এসে।
খামারে অন্ধকার ঈষৎ পাতলা। অপেক্ষাকৃত অগভীর সেই আঁধারে যেন বুকে একটু সাহস ফিরে যায় শঙ্কর। কিন্তু এও টের পায় যে
সে ভয়ানক বিপদে পড়ে গেছে। এখন সে এখান থেকে বেরোবে কোন দিক দিয়ে ! আলো না ফুটলে পিছন দিক দিয়ে যাওয়া অসম্ভ
ব। আর সামনের দিকে জমজমাট বামুন পাড়া। জড়ানো লতারমত অলিগলি পথ। পথে এক হাঁটু কাদা, দুপাশে কাঁটা বাঁশের ঘন ে
বড়া। শঙ্কর জাত চোর নয়। এই অন্ধকারে ঐসব পথের ঠাঁই ঠিকানা খুঁজে বার করা তার পক্ষে অসম্ভব। তাই তাকে খামারে দাঁড়িে
য় দম নিতে নিতে ভাবতেহয়। একবার ভাবে যা হয় হোক, পরিচিত পুরানো পথেই ফিরে যাবে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। যদিও সে
বনমালী দলাই-এ নাতি তবু দাদুর মতন বুকের পাটা তার নয়। তাই শ্বাসের বেগ কমে এলেও দুশ্চিন্তায় তার শরীরের ঘাম শুকোয়
না। আর এমন সময় খড়ের গাদার দিকে চোখ পড়তেই তার বুকের রক্ত আরও একবার চলকে ওঠে।
গাদার আবছা অবয়বের পাশ থেকে বেরিয়ে অসছে আরও ঘন অন্ধকার একটা মূর্তি, তারই দিকে. এবার কোন দিকে যাবে শঙ্কর?
পিছনের দিকে দৌড়বে?কিন্তু সে দিকেও তো পথ আগলানো। গলা শুকিয়ে কাঠ। হাত পা অবশ। মূর্তি আরও এগিয়ে আসে। তার
পর হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে সেই বিভীষিকা।
শঙ্করের শ্বাস পড়ে না। ভয়ঙ্কর একটা কিছুর জন্য সে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। ভীষণ কয়েকটা মিনিট কেটে যায়। তারপর একসময়
অন্ধকার মূর্তি ভয় মেশানো গলায় জিজ্ঞাসা করে কে? শঙ্কর উত্তর দিয়ে ফেলতে গিয়েও নিজেকে সামলায়। কাঁপা কাঁপা গলায় সে
ও পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়--তুমি কে? আবার সব চুপচাপ। কেউই আগে উত্তর দিতে চায় না।
আবার নিঃশব্দ অস্বস্তিকর কয়েকটা মিনিট। তারপর হঠাৎ টর্চের তীব্র আলো এসে পড়ে শঙ্করের মুখে। সেও মরিয়া হয়ে টর্চ জ্বালে
।
--- শঙ্কর! এত রাতে কোথা যাবি ? চাপা গলায় প্রশ্ন আসে।
--- তুমি বা এত রাতে এখেনে কেন বিনয় দা?
--- আমি অ্যাদের চাষবাস দেখেশুনে দি, সবাই জানে।
শঙ্কর কোনদিনই কথায় তেমন পটু নয়। তবু কে যেন আজ তার গলায় কূট কথার যোগান দিয়ে যায়। সে বলে, আমি যে মাছ চোর
এও তো গ্রামের সবাই জানে। কিন্তু এত রাতে কুতা আবার তুমার চাষের কাজ করল?
এ কথার কোনও উত্তর আসে না। শঙ্করের ভয় কেটে গেছে। এখন সে মরীয়া হয়ে যেন একটা যুদ্ধের মুখোমুখি। তার সামনে বিনয়
বেরা। বিনয় বেরাকে গ্রামের লোক সম্মান করে চলে। তার পুকুরে জাল দেবার জন্যমাঝে মাঝে ডাক পড়ে শঙ্করেরও। এমন প্রতি
পক্ষের কাছে হেরে গেলে অপযশ নেই। বরং জিততে পারলে পৌরুষ বাড়ে। শঙ্কর প্রস্তুত।
আবার কয়েকটা মিনিট কাটে। বিনয় বুঝতে পারে, এই অন্ধকারের কেচছা প্রকাশিত হয়ে পড়লে শঙ্করের চেয়ে তারই ক্ষতি হয়ে যাে
ব বেশি। তাই সে পরিস্থিতি বুঝে ভেঙে পড়বার আগেই মাথা নোয়ায়। আগের মত ই ফিসফিসে গলায় বলে, বাদ দে। ঘর যা।
প্রস্তাবে রাজি হয় শঙ্কর। কিন্তু ফিরে যাবার কথা ভাবতে গিয়েও তাকে থমকে যেতে হয়। অদূরে বাড়ির ভিতর থেকে ভীত নারীকণ্ঠে
র কথাবার্তা ভেসে আসছে। এতক্ষণ এখানকার উত্তেজনায় বোধ হয় তা আড়াল হয়ে ছিল। এত রাতে কারওজেগে থাকার কথা ন
য়। শঙ্কর বলে, ঘরের ভিতরে কি গোল হচ্ছে মনে হয়। কিছু কি বিপদ আপদ হল?
বিনয়ও শুনতে পেয়েছে। এদের বাড়ির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা শঙ্করের চেয়ে অনেকই বেশি। সে বলে, বলতো দেখি কি হল এত রাতে?
জেঠীরই ঠিক বাড়াবাড়ি কিছু---
শঙ্কর দিনের বেলাতেও সহসা এ বাড়িতে কেন এ পাড়াতেই আসে না। তাই তার সঙ্কোচ হয়। বলে, এত রাতে যাবে, যদি কিছু খারা
প ভাবে?
তোর ভয় নাই। আমার সঙ্গে আয় না। যদি কিছু খারাপই হয়? আর তাছাড়া--- খানিক থেমে, গলা নামিয়ে বিনয় বলে --- আমরা
তো খারাপই। ভালো লোক কি রাতের বেলাকুনোদিন কারো গাঁদালে কাঁদালে ঘুরে বেড়ায় বল?
বিনয়ের গলায় ফাঁসা খোলের বোলের মত স্বর। সেই স্বর শুনে শঙ্করও লজ্জা পায়। সেই লজ্জাকে ঢেকে রাখে অন্ধকারের চাদর।
তবে যেহেতু মনের ভিতরে কোন দেয়াল নেই তাই তো কাঁটার মত খচখচ করে শঙ্করের বুকের কাছে। এতখানি বয়েস পার করে এ
সে আজ হঠাৎ নিজেকে খুব ছোট মনে হয় তার। বর্ষা দিনের একটা রাত যেন একটা বিশাল আয়না হয়ে দাঁড়িয়েছে সামনে।
পাশ না করলেও কলেজ ছোঁয়া মানুষ বিনয়। মধ্য চল্লিশ। বোদ্ধা ও বিবেকবান হিসেবে গ্রামে তার অনেক সম্মান। গ্রাম্য বিচার - ব
ন্দোবস্তে পক্ককেশ বৃদ্ধদের সঙ্গে সেও পায় মাথার মর্যাদা। আজ সেই তাকেও মেছুয়ার বাচচাশঙ্করের সঙ্গে সন্ধির জন্য ফর্সা হাত বাি
ড়য়ে দিতে হল অন্ধকাবে!
ষষ্ঠীচরণ ছিলেন বিনয়দের কুলপুরোহিত। তাই তাঁর মৃত্যুর পর গ্রামের কয়েকজনের প্রস্তাবে এবং নিজেরও বিবেকের সম্মতিতে অ
সহায় বিধবার সম্পত্তি সামলানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেয় বিনয়। বিনয়ের মা, প্রচলিত ধারণায় যার স্বভাব পেয়েই বিনয় আজ

এমন দয়ালু ও পরোপকারী তাঁরও বিশেষ উৎসাহ ছিল এ বিষয়ে।
তারপর গ্রামে যে চিরাচরিত সমুদ্র সদৃশ গল্প মন্থনের প্রথা তাতে এই নতুন কাহিনীও সংযোজিত হয়। বেশকিছুদিন সেই মন্থনের ফলে বিনয়ের জন্য একচেটিয়া প্রশংসা ও আশীর্বাদ উঠে আসবার পর একদিন কি যেন একটুনীলবর্ণ জিনিস আবিষ্কৃত হয়। এবং তা অবিলম্বে হাওয়ার আগে প্রচারিত হয়ে পড়ে। বাপ - ঠাকুদ্দার উপর চোখেরস্বভাব নাকি সম্প্রতি বিনয়েরে মধ্যেও দেখা যেতে শুরু করেছে।
এই তৃতীয় নয়ন প্রসঙ্গে বাপ-ঠাকুদ্দার অনেক বৃত্তান্তই আবছা শোনা আছে বিনয়ের। বাপের মৃত্যুর পরসে সব বৃত্তান্ত অনেকদিন মরেই পড়েছিল। আজ আবার তারা বেঁচে ওঠায় পূর্বপুরুষের বিশেষ রূপটি বিনয় দেখতে পায়। তার মা এই এতগুলো বছর পক্ষী-জননীর প্রসারিত ডানার মত আঁচলের আড়ালে নিজের মনের মতকরে মানুষ করেছিল তাকে। তার সব ভুলে যাবারই কথা। কিন্তু কতদিনই বা ভুলে থাকা সম্ভব ?
এত বয়স পর্যন্ত মোটামুটি নিষ্কলঙ্ক বিনয় তার সম্পর্কে প্রচারিত কাহিনী শুনে প্রথম ক-দিন সুতীব্র রাগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর মায়ের কানেও এসব যেতে পারে, এই আশঙ্কায় তার মনে গভীর দুঃখের ছায়া পড়ে। তারও কদিন পর এই ছায়া ক্রমে ক্রমে কবে যে গাঢ় অন্ধকার হল তা তার ঠিক মনে নেই।
এতদিন অবহেলা করে এলেও উড়ে বেড়ানো গল্প শোনবার পর একদিন তার চোখে রাণী মানে ষষ্ঠীচরণের ছোট মেয়ের উৎকৃষ্ট গড়ন আবিস্কৃত হল। মনে পড়ল ঘরের খেয়ে পরের বাড়িতে নিঃস্বার্থ শ্রমের কথা, নিজেকে মনে হল খুব বোকা। তাছাড়া কোনও মানুষের জীবনে পূর্বপুরুষের প্রভাব পড়াও অস্বাভাবিক নয়। এইসবভাবতে ভাবতে একদিন সত্যি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়ল বিনয়। একটা সবেবানাশী খাদ তাকে নিচের দিকে টানছেযেন। এখন পতনই য়েন তার ভবিতব্য। এই টান এড়িয়ে যাবার শক্তি য়েন তার নেই।
আজ পঞ্চম দিন। রাণী তাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে নিজের দাদার মত। সেই সম্পর্ক তুচ্ছ করে এর আগেও চারদিন বেরা পাড়া থেকে এতখানি অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে এই বামুন পাড়ায় এসে হানা দিয়েছে বিনয়। কিন্তু প্রতিবারই তাকে দরজার কাছে থেকে ফিরেও যেতে হয়েছে। দরজার কাছে কেউ যেন তার পথ আগলে দাঁড়ায়। বার বার বলে, ফিরে যা, ফিরে যা একটা সুন্দর সম্পর্কের গায়ে কালি ছেটাস না, পালা পালা। আজও বিনয় নিঃশব্দে ফিরে যাচ্ছিল। সামনে পড়ে গেল শঙ্কর। যাক এ একরকম ভালোই, বিনয় ভাবে।
নিশ্চুপ দুটো অন্ধকার অবয়ব নিয়ে সারিবদ্ধ ঘড়ের গাদার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলে বিনয় আর শঙ্কর। টিনের ছাওয়া হামার ঘরের সামনে এসে বিনয় হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। ডাক দেয়, এই শালা মদনা, বেরি আয় বলছি।
শঙ্কর এমন হাঁকড়ান শুনে অবাক হয়। তবে কেউই কোথাও থেকে বেরিয়ে আসে না। তখন স্থান কালভুলে গলা তুলতে হয় বিনয়কে। ভাল হবে নি মদনা, জানে মরবি, বেরি আয়। আমার চোখকে ফাঁকি দিবি তুই?
এবারে কে যেন হামারের দরজা খুলে দৌড়ে এসে বিনয়ের পায়ের উপর পড়ে। চাপা স্বরে কাঁদতে বলে, বাঁচাও বাবু। প্রাণে মেরো নি। বউ ছ্যানা সব না খেয়ে মরবে। গরীব লোক, অভাবের জ্বালায় ভুল করেছি। মাফ কর।
---শালা অন্ধকারে ধান সরাবার তালে ছিলু?
---বাঁচাও বাবু। মাফ কর। মাফ কর। মদন পা ছাড়ে না।
শঙ্কর সম্পূর্ণ কাহিনী আন্দাজ করতে পারে। যে কাজেই আসুক, এর আগে বিনয় মদনকে হামারে দেখেও কিছু বলে নি। এখন শঙ্করের সামনে ম্যানেজারি ফলাচ্ছে। মনে মনেই একটা খিস্তি আওড়ায় শঙ্কর।
মদন এ ঘরের বারোমাস বাঁধা কাজের লোক। ঘরে মানুষ বলতে একা রাণী আর রান্নার ঝি। তার ওপরশয্যাশায়ী রুগীর ঝামেলায় সারাদিন বিশৃঙ্খলা। এরকম অবস্থায় যত সুরক্ষিতই থাকুক না কেন পুরানো লোক মদনের পক্ষে হামারের চাবিটা জোগাড় করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।
বিনয় মদনকে বলে, উঠ শালা। আর কখনো যদি দেখি, তাড়াজাঁক দিয়ে মারব তোকে। ঘরের ভিতর কি গোল হচ্ছে শুনতে পাউ নি?
---আজ সন্ধ্যা থিকে গিন্নির খুব বাড়াবাড়ি।
---সেটা জেনেও ডাক্তারকে না ডেকে এনে হামারে ঢুকছু ধান চুরি করতে?
--- খবর দিচ্ছি গো ডাক্তারকে। বলল, সকালে যাবো। বাবু, বোলো নি কো একথা গিন্নিকে। আর কুনোদিন হবে নি এমন। মদন কেঁদে ফেলে।
মদনের লোভ কমই। দশ বিশ সের মাত্র ধান সে সরায় মাঝে মধ্যে এবং এর পিছনে তার অভাবই সবচেয়েবড় কারণ। যদিও সুযোগ থাকে তবুও রাতারাতি পরের ধনে ধনী হবার সখ তার নেই। তবু যেহেতু সে আজ হাতে নাতে ধরা পড়েছে এবং যেহেতু সে খুবই দুর্বল তাই তাকে একতরফা ক্ষমা চাইতে হয়। এত রাতে ভিন পাড়ার দুজনকে দেখে সেও তো পাল্টা প্রশ্ন করতে পারতো। কিন্তু তেমন প্রশ্ন করার মত জোরটুকু তার নেই। কারণ সে জানে বিনয় বেরার মত মানুষদের পায়ের তলায় বসে সারাটা জীবন তাকে কাটিয়ে যেতে হবে। সে আশ্রয় নিজের হাতেনষ্ট করা তার পক্ষে অসম্ভব।

দরজার কাছে গিয়ে বিনয় ডাক দেয়, রাণী ও রাণী, দরজা খোল।
একটু আগেও সে এ দরজার কাছে এসেছিল, রাণীকেই ডাকবে বলে। কিন্তু তখন তার গলায় একটুও স্বর ফোটেনি। গলা শুকিয়ে ি গয়েছিল, ঘামছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর ফিরে যেতে হয়েছিল চুপচাপ। আর এখন সেই তারই গলায় কত জোর।
ঝি এসে দরজার হুড়কো খুলে দেয়। ঘরের ভেতর থেকে রাণী গলা তুলে বলে, আসুন বিনয়দা।
খুব বিপদের মুখ থেকে ফিরে আসবার পর প্রিয়জনের সাড়া পেলে যেমন খুব আনন্দ হয়, রাণীর ডাকেবিনয় ঠিক তেমনই স্বাদ পায় । সে অসঙ্কোচে অন্যান্য দিনের মত ঘরের ভেতরে ঢোকে। তার পিছনে মদন আর শঙ্কর।
--- ক-দিন আসা হয় নি বলে জেঠীর খবরও কিছু পাইনি। মদনই তো এত রাতে খবরটা দিল। রাস্তা ধারের জলায় শঙ্কর মাছ ধরে তছিল। তাকেও ধরে আনছে।
খুব ভাল করছেন। আমি তো সন্ধে থেকেই ওকে বলছি আপনাকে ডাকতে। কিন্তু সেই যে ন-টার সময় বাড়ি গেল আর বাবুর দেখ াটি নেই। আপনি এলে মায়েরও কষ্ট যেন কত কমে যায়। তারপর শঙ্করকে দেখে রাণী বলে, বোসো শঙ্করদা।
না না, মদন তো তার ঘরে যায় নি। ডাক্তার ডাকতে গেছে। ডাক্তার বলেছে সকালে আসবে। তারপর ছুটছে আমার কাছে। বিনয় বলে। পর পর সাজানো মিথ্যে কটি কথা সহজে বলে ফেলতে পেরে সে মনে মনে বেশ স্বস্তিপায়।
শঙ্কর শুধু দেখে। এ বাড়ির এত ভিতরে সে কোনওদিন ঢোকে নি। এত কাছ থেকে কখনও দেখেনি রাণীকে। তাই তার চোখে কেবল বিস্ময়। পূর্ণিমার পর চন্দ্রকলায় যেন ক্ষয় শুরু হয়েছে। মুখের গৌরবর্ণে পড়েছে দুশ্চিন্তার তামাটে ছোপ। তবু রাণীর নাম সার্থক, শঙ্কর ভাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার খুব দুঃখ হয়। এমন একটা মেয়ে অভিভাবকহীন হয়ে পড়তে পারে যে কোনদিন। তারপর?
রাণী মায়ের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলে, মা তোমাকে দেখতে এসেছে বিনয় দা। ও পাড়ার শঙ্করদাও এসেছে।
দীর্ঘ রোগভোগের ফলে ফর্সা মুখ সাদা কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। সুন্দর চোখ দুটি প্রায় অন্ধ। শহরের ডাক্তার এলিয়ে ি দয়েছে। এখন শুধু অসহ্য পেটের যন্ত্রণা কমানোর জন্য একটা মাত্র ট্যাবলেট খেতে হয় দু-বেলা। সেই শীর্ণ কমলা ঠাকুরণ চোখ মে লে তাকালেন। যন্ত্রণা বোধহয় এখন একটু কম। অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে চোখ রেখে বললেন, বোসো বাবা শঙ্কর। আগে তো আসতে মাঝে মাঝে। এখন আর আসোই না। তোমাদের এ বোনটিকে দেখো বাবা। মেয়েটা আমার জলে ভেসে যাবে। জ্ঞাতি - ভাগারিদের আমি একটুও বিশ্বাস করি না। আমার দু-চোখ বুজলেই সম্পত্তিটুকু লুটে পুটে খাবার তালে আছে। অন্য পাড়ার মানুষ হলেও তোমরাই আমার আপন।
খুব কষ্ট করে দম নিয়ে বলা কথা কটা শঙ্করের বুক ছুঁয়ে যায়। সে একটু সান্ত্বনাও দিতে পারে না। চুপচাপ নিচের দিকে মুখ করে ব সে থেকে বারবার কল্পনায় নিজেকেই দেখতে চেষ্টা করে।
তারপর চোখটা আন্দাজ মত একটু অন্যদিকে সরিয়ে কমলা ঠাকুরুণ বলেন, তোকে আর কি বলব বাবা, বিনয়? বুঝতেই পারছি অ ার বড় জোর দুটো একটা দিনই মাত্র আছি। বোনটাকে বিয়ে দিয়ে একটু গুছিয়ে দিস বাবা। তুই ছাড়া আমার আর কে আছে বল বিনয়ের বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। একথা আগেও অনেকবার শোনা। তবু সেই পুরানো কথাগুলোই আজ কেন যেন তীরের মত পাঁ জর ভেদ করে বুকে গিয়ে আঘাত করে। জবাবে ধরা গলায় বিনয় শুধু বলতে পারে, তুমি বেশি কথা বোলো নি জেঠী। আমি তো আছি। তোমার চিন্তা কি?
মদন বাকি রাতটুকুও এখানেই থাকবে ঠিক হয়। বিনয় আর শঙ্কর একসঙ্গে খামার পর্যন্ত আসে। শঙ্করের মন ছেয়ে আছে কেবল দুঃ খভারে। আর বিনয়ের মনে অনুতাপ। নিজের উপর যেন সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে সে। ভাবছে বাপ - ঠাকুদ্দার স্বভাবের উত্ত রাধিকারের ফাঁদ থেকে তার আর কোনমতে মুক্তি নেই। এরকম ষষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম অন্ধকার রাত তো আসতেই পারে। আর সব ব . াতেই যে ব্যর্থতা লেখা থাকবে এমন নিশ্চয়তাই বা কোথায়?
যেন চরাচরময় অন্ধকারের বুকে ক্ষণিকের জন্য একবিন্দু চকমকির আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে বামু জেঠীর করুণ আর্তি, রাণীর ফুলের মত নিষ্পাপ সুন্দর মুখ। এই আলোটুকু নিভে যাবার আগেই যা কিছু করার তা করে ফেলতে হবে।
--- আমার শ্বশুর গরে মাছ ধরতে যেয়ে সেবার যে বামু ছোকরাটাকে দেখ্ছিলু তোর মনে আছে শঙ্কর? লেখাপড়া জানা, সৎ, রো গা লম্বা মতন, খুব গরীব মনে আছে ? আরে সেই শরৎ নাকি কি যেন নাম--অস্থির ভাবে জিজ্ঞাসা করে বিনয়।
--- হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। কত তাস খেললম একসঙ্গে। মনে থাকবে নি কেন ঞ্জ পাড়ার পশ্চিম দিক করে ঘর তো? মনে আছে। শঙ্কর বলে।
--- তাকে মানাবে নি রাণীর সঙ্গে?
--- হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দর মানাবে। ভালই হবে।
তবে তুই কালই একবার চলে যা শঙ্কর। কথাটা পেড়ে দেখ। শরতের বিধবা মা নারাজ হবে নি মনে হয়। এদিকে জেঠীর অবস্থা দেখ লু তো, দুদিন পারাইলে ঢের।
--- যাবো। যাবাটা তো কর্তব্য। ঠাকরুণকে দেখে দুচোখ ফেটে জল আসছিল আমার। যাবো আমি। শঙ্কর বলে।
তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে যে যার ঘরের দিকে পা বাড়ায়, বিনয় আর শঙ্কর।

ছায়াঘর

অসীম চট্টরাজ

বালিশ থেকে কোমর সহ মাথাটা তুলেছিল চোখেরপাতা বন্ধ রেখেই। যখন এ - হেন সচেতনতার মধ্যেও ছবিটা রেটিনায় স্পষ্টআ টকে রইল সনজিদা বুঝতে পারল এটা সত্যি স্বপ্ন নয়, আসলেস্বপ্নের স্টিল ফটোগ্রাফ, যেটা কিনা তাড়ালে যাবে না। ওকয়েকবার জোরে জোরে চোখ রগড়ে ধীরে চোখের পাতা খুলল, আরকম্পিউটার স্ক্রিনে আলো ফোটার মত আস্তে আস্তে ফুটে উঠলদোমড়া নো বালিশের পাশে পড়ে থাকা পোস্টমডার্নিজম ফর বিগিনার্স,পড়ার টেবিলে কিছু নারীবাদ সক্রান্ত বই, চেয়ারের উপর কালরা তে শোওয়ার আগে ছেড়ে রাখা নোংরা জিন্স্ আর টপ, রুমমেটের পড়ারটেবিলে মাসিক ৫০০ টাকায় ভাড়া নেওয়া স্কার্ট আর ব্রা পরে শুয়ে থাকা,টপটা বালিশের পাশে দোমড়ানো। ওকে দেখে হাসি পাবার মুহূর্তে সনজিদারগায়ে হাত পড়তে খেয়াল হল ওর গায়ে একটা সুতোও নেই। কাল তান্ত্রাতে বান্দ্রানিবাসী যে অবাঙালি : ধনী হ্যান্ডুটিকে ওরাদুজন মুরগি করেছিল সে মাল প্রথ ম দিনের তুলনায় একটু বেশিই হাতখোলা।বেদম বিয়ার খাইয়েছে। গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে : গেছে হস্টেলের দরজার : সামে ন। বলেছে : আজপাঁচটার সময় তুলে নিয়ে যাবে। ওরা অবশ্য আজ পাঁচটার অনেক আগেইবেরিয়ে যাবে। : কেননা আজ, ওরা জানেআজ, ছেলেটার মধ্যে চাহিদার আঁকুড় গজাতে শুরু করবে, প্রশ্রয় পেলে হাতআরও খুলবে আর মগজ এবং রেটিনার ফোক াসে কালকের রাত্রের ইত্যাদিবাস্তবতা অথবা বাস্তবতার বিজ্ঞাপন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠলসনজিদার মাথায়। হ্যাং ওভারে ভারি হে য় থাকা তন্বী শরীরটাকে টো-এরভরে দাঁড় করাল ও । মাথা, ঘাড় আর হাতদুটো পিছনে টেনে আড়মোড়াভাঙল। সুরিতার মিনি স্কার্টটা টেনে হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে পায়েরপাতায় আলতো লাথি মেরে হাই জড়ানো গলায় বলল---ওঠ শালা। সাড়ে নটা বাজে,ক্লা স যাবি না। সুরিতা তখনও ঘুমে অচৈতন্য। নাইটিটা চাপিয়ে সনজিদা চলেগেল বাথরুমের দিকে।

:

এই বেপরোয়া জীবনে সনজিদা পরোয়া করে মাত্রদুটো জিনিস। টেবিলের বইগুলো আর গসিপ উইথ সঞ্জীব নামে একটা অন লা ইনচ্যাট্। অবশ্য বইগুলোর ক্ষেত্রে পরোয়া না বলে প্রশ্রয় বলাই ভাল।অধ্যাপক বাবা-দাদার পারিবারিক প্রভাবে যদিও বইপত্রের প্রতিএকটা আকর্ষণ ওর আছে, কিন্তু তন্ত্রার ঠেকে আর ইন্টারনেটের চ্যাট্শো-এর নেশা ধরে যাবার পর : এখন ও বইআনে শুধু বইগুলোর ইমেজ উল্টেপাল্টে দেখতে, যাতেইউনিভসিটির ঠেকে ইন্টেলেকচুয়াল ইন থিংগুলোর আলোচনায় ওপিছনে না পড়ে। সুরিতার এসবের বালাই নেই। ওর আশা, এইভাবে চলতেচলতে কোনো-না কোনো একদিন ও এক পয়সাওয়ালা মস্তিবাজ দিল দারভালো ছেলের প্রেমে পড়বে যে ওয়ান ফাইন মর্নিং আরও বড়ো কেরিয়ারকরতে ওকে নিয়ে কলোরাডোগামী প্লেন ধরবে। ত াই রাত্রে মস্তিআর দিনে অন লাইন মেড ফর ইচ : আদারের মাঝেমধ্যে ঝাঁক মারা ছাড়া বাকি সময়টা ও কাটিয়েদেয় ফিগারমেনে টন করতে। এর মাঝে ওইসব বইপত্রের ঝামেলা ক্ক ছোড় না ইয়ার। মাঝে মাঝে সনজিদারও ইচ্ছা হয় সুরিতার মত অত্যন্তবুদ্ধিম ত্তার সাথে শরীর থেকে মগজটাকে ছেঁটে ফেলতে। পারে না। পারে না অনলাইন চ্যাটের সঞ্জীব ছোকরার জন্য। ইন্টারনেট ঘাঁটে ত ঘাঁটতে সেইপ্রথম যে-দিন ও আবিষ্কার করল চ্যাট্ উইথ সঞ্জীব ক্যাল ডট কম বলেএকটা অন লাইন চ্যাট্ ক্লাব আছে, সঞ্জীব ছে াকরার সাথে আলাপ হলো, দু-একদিনতিন মিনিট ফ্রি লাইন গসিপের পর ক্রেডিট কার্ড নাম্বার দিয়ে ক্লাবেরমেম্বার হল, প্রথম দি ন সেই যে ঘন্টাখানেক দুরন্ত আড্ডায় সঞ্জীবআবিষ্কার করল সনজিদা বেশ মগজওয়ালা মেয়ে, এরকম মেয়ে এর আগে নাকি ওইন

টারনেটে দেখেইনি, তারপর থেকেই : উত্তরাধিকারে মগজটা যাই যাই করেও থেকে গেল ওর সাথে।সঞ্জীবের খাতিরেই সরিয়ে রাখতে পারল না।

:

ইথার বাহিত সঞ্জীব নাকি বাস্তব নয়, ও কিজীবন্ত, না জীবনের প্রজেক্শন---এসব নিয়ে : আজকাল ভাবে সনজিদা। কেন ভাবে ঞ্জ টুথ ব্রাশের উল্টো দিকটা আলতো চাপে দাঁতে ধরে আয়নায় চুল ঠিককরতে করতে নিজের দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফ্যাে ল ও । জল লেগেঝাপসা প্রতিচ্ছবির গায়ে ঠোকা মেরে বলে---বি স্বাভাবিকইয়ার.....দিস ইজ চু মাচ....প্রতিদিন স্বপ্নেওইন্টারনেট. .....স্বপ্নেও সঞ্জীব ক্ক সনজিদা কি ওর প্রেমে পড়েছে ক্ক যদি পড়েও, কি লাভ। অন লাইন চ্যাটে কতবার ওর সাথে দেখা করতে চে য়ছেসনজিদা। কিন্তু সঞ্জীবের সেই এক কথা

----দেখা তো হচ্ছে, চাইলে প্রতি ঘন্টায়দেখা হবে।

সনজিদা অস্থির হয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়েবলেছে---উঃ। এই দেখা হওয়া নয়। সত্যি সত্যি দেখা হওয়া।

সঞ্জীব ঠোটের কোণে মর্মাঘাতী মৃদু হাসিটাছুঁইয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করেছে----ইজ ইট নট রিয়েল ঞ্জ

----ওফ্ ক্ক আই ওয়ান্ট টু টাচ : ইউ ম্যান।

----হোয়াট ডু ইউ ডু নাইট উইথ মি ক্ক

লজ্জায় লাল হয়ে যায় সনজিদা----তুমি কি করে জানলে ক্ক

----আনি সব জানি।

----কিন্তু ওটা তো স্বপ্ন।

----দ্যাটস্ দ্য গ্রেট রিয়েল থিম---ড্রিম। জাস্টড্রিম মি অ্যান্ডটাচ মি।

----কিন্তু----।

আর কথা বাড়ানর সাহস হয় না ওর। এ বিষয়ে কথাবাড়ালেই লাইন কেটে যায়। অভিমানে দু-এক দিন চ্যাটে বসে না সনজিদা। ঘন ঘনমেল বক্স চেক করে যদি সঞ্জীব মেল পাঠায়। হতাশ হয় বাবা-দাদার উপদেশ আরহাবিজাবী প্রেমিকদরে বোকা বোকা চিঠি, কখনো অশ্লীল চিঠি দেখে।সনজিদা প্রতিজ্ঞা করে----এই শেষ, আর মেম্বারশিপরিনিউ করবে না। যেনএই সংবাদটা জানাবার জে ন্যই ও আবার ইন্টারনেটে বসে, লাইনটা না পাওয়াপর্যন্ত মনে মনে আর একবার প্রতিজ্ঞা করে ---ব্যাস্ এই শেষ বলেইজানালাট া, আই মিন উইন্ডোটা, বন্ধ করে দেবো। কিন্তু যখন ধীরে, খুব ধীরেসঞ্জীবের ইন্টেলিজেন্ট চোখ দুটো পর্দায় ফুটে ওঠে, ফুটে ওঠে ঠোঁটেরকোণে সেই সরল অথচ খুনি হাসিটা, জীবনের সব শরীরের প্রতিটিস্নায়ুবিন্দু আকুপাংচারের স্পর্শ করে যায়, ওর মনে হয় সত্যিই কি সঞ্জীবআমাকে স্পর্শ করে না। আর যেন এ সত্যটা অস্বীকার করতেই লাইন : পাবার সাথে সাথে ও কপট রাগে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। চিৎকার করে বলে।---এই : বন্ধ ঘরে বদ্ধ শহরটায় আমার আর ভালো লাগছে না। তুমি আমায়কোথায় বেড়াতে নি য়ে যেতে পারো না ক্ক স্টেপ ড্যান্সের মত পাতায় একটা কাঁচি : মেরে সঞ্জীব বাও ক্ষমা চায়---এনি টাইম মাই : ইন্টলিজেন্ট ডার্লিং । জাস্ট স্পিক আউটহোয়ার ডু ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফান---রাজস্থান ঞ্জ : সাথে সাথে দেখা যাবে ধূ ধূ বালিয়াড়িতেরাজস্থানি পোশ াক পরে উটের উপর চেপে সঞ্জীব মুচকি মুচকিহাসছে। তারপর ওর সাথে এক ঘন্টায় গোটা রাজস্থান টুর। ওফ ক্ক হোয়াট অ্যান এক্সাইটমেন্ট ক্ক এক ঘন্টার প্যাকেজ তিনশ টাকায়।দু-ঘন্টার প্যাকেজ পাঁচশ টাকা। আর যদি সাথে বড়ো হোটেলেরব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ - ডিনার : চাও----খাবো সঞ্জীব আর ক্লায়েন্ট শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে : ও রেসিপি জানবে তাহলে আটশ, এর সাথেনা ইট লাইফ দেখতে গেলে পুরো একপাত্তি----হাজার । অবশ্য রান্নাবান্নায়বিশেষ ন্যাক না থাকায় আর পৈতৃক সূত্রে একটু জমিজা মা থাকা মফস্বলেরউচচবিত্ত : অধ্যাপক ওর বাবার পয়সাঅফুরন্ত না হওয়ায় তিনশ টাকার প্যাকেজটায় বছরে মাত্র দুবার সঞ্জীবে রসাথে যায় সনজিদা। এই : দুবছরে ও সঞ্জীবেরসাথে ঘুরে ফেলেছে কাশ্মীর, সিকিম, খাজুরাহো-কোনারক (একটাপ্যাকেজ) আ র রাজস্থান। কি অসাধারণ গাইড সঞ্জীব। শুধু গাইড ক্ক পৃথিবীর এমন কোনো বিষয় নেই, যা নিয়ে দশ মিনিট আলোচনা করতে পারবেনা।

:

একমাত্র ওর বয়ফ্রেন্ড : ড়িংঙ্কু ছাড়া সঞ্জীবের কথা আর কেউ জানে না। এমনকিসুরিতাও না। সনজিদা চায় না সঞ্জীব আর কারো হক। তাই : ও যখন রুমে একলা থাকে তখন ইন্টারনেটেবসে। অধিকাংশ সময় সেটা দুপুর বেলা যখন সুরিতা খেয়ে দেয়ে ঘুমবে না বলে হয়বিউটিপার্লারে, নয় উইন্ডো শপিং করতে চলে যায়। এমনকি ক্লাসেওযায়না পাছে : ভরপেটে লেকচার শুনতেশুনতে ঘ ুমিয়ে পড়ে। চ্যাট লাইনটা : আবিষ্কার করার পর সনজিদা অবশ্য ডিপার্টমেন্টাল হেডকে বলেইদিয়েছে সেকেন্ডহাফে ও যাবে না। ঐ লেকচারগুলো : অন লাইনে ডাউন লোড করে নেবে। যখন ও যে লেকচার : ডাউন লোড করবে ওর নামে সেই ক্লাসেরপা র্সেন্টেজটা কাউন্ট হয়ে যাবে আপনাআপনি। শুধু সনজিদা নয়, ক্লাসে সময়নষ্ট না করে অধিকংশ বুদ্ধিমান ছাত্রই এটা করে। একটা বাড়তি ইনকামেরপথহিসাবে ইউনিভার্সিটিও এটাতে উৎসাহ দেয়।

:

কোনো কোনো দিন কি যে মতিভ্রম হয় ওর ক্ক বিশেষ করে যেদিন শাড়ি পরে থাকে (সঞ্জীবের শাড়ি খুব পছন্দ) ।সুরিতা চলে যাব ার পর ইন্টারনেট চালু করবে কি করবে না : ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খাট থেকে টেবিলেরদূরত্বটা হয়ে যায় হাজার হাজার মাইল। এই পথটুকু চলতে চলতে : ও কখনো রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভিজেলুক থ্থু হয়ে যায়ওর শাড়ি, ঝড়ে উড়ে যায় আঁচল, বিদ্যুতের অলোয় পথচেনে, বুঝতে পারে না কেন বারে বারে কেঁপে উঠছেওরবুক---বজ্রপাতের শব্দে নাকি সঞ্জীবের সাথে দেখা হওয়ার আশঙ্কায়,কাঁটা বিঁধে পা হয় ক্ষতবিক্ষত আর সনজিদা চেয়ারের উপরঝাঁপিয়ে পড়ে মাউস হাতড়াতে থাকে। কি কারণে যে সেদিন ই লাইন পেতেদেরি হয়। যখন পায় বসন্তের নাম-না-জানা অজস্র ফুলের : গন্ধ বয়ে সামনে দাঁড়ায় সঞ্জীব। যেন বলতে চায়তোমা র জন্য ফুল কিনতে গিয়ে দেরি হল। সেদিন সনজিদা কোন কথা বলে না। শুধুতাকিয়ে থাকে। কথা বলে না সঞ্জীবও । স্ক্রিনে একে র-পর -এক ফুটে ওঠে ওরবিভিন্ন মুড়ের স্টিল ফটোগ্রাফ, ব্যাকগ্রাউন্ডেএকটা হালকা : মিউজিক।

:

আজ অবশ্য তেমন কিছু হল না। সুরিতা চলে যাবারপর এক চান্সেই লাইন পেয়ে গেল সনজিদা। আজকের কথাবার্তাও হলমামুলিগোছের। যেমন অনেক দিনের সংসার ক বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রাত্যহিক : হয়ে থাকে। শেষে সঞ্জীব আক্ষেপকরে বলল,

----এতদিনের আলাপ : আমাদের। তুমি আমায় দেখতে পাও : কিন্তু আমি তোমায় দেখতে পাই না । একটা ক্যামেরা লাগিয়ে না ও : না।

----পয়সা কি গাছে ফলে ক্ক ঝানু গৃহিণীর মতই উত্তর দিল সনজিদা।

----সুরিতার সঙ্গে : শেয়ারে ভাড়া নিয়ে নাও।

----সুরিতাটা এক নম্বরের কিপটে। দ্যাখো নাএখুনি কাঁদুনি গাইতে শুরু করেছে মাসে মাসে আড়াইশ টাকাটা ফালতু, আমি : তো সপ্তাহে একদিন মাত্র মেড ফর ইচআদার দেখি, যে কোনো সাইবার কাফেতে দেখতে পারি---হ্যানা-ত্যানা -ঢ্যাক। আসলে : আমি বেশি ব্যবহার করছিএটা সহ্য হচ্ছে না ওর। হিংসুটে কোথাকার। এরপর যদি ক্যামেরার কথা বলি : ও বোধহয় অজ্ঞানই হয়ে যা বে ---হি হি।

----ও তো একটু বিয়ে পাগলা গোছের আছে----ওকেভজাও ---তোকে দেখতে না পেলে ছেলেরা পছন্দ করবে কি করে ক্ক

----দেখি কি করা যায়।

----আমি তোমাকে কতগুলো দোকানের না বলেদিচ্ছি। তুমি এই দোকানগুলো থেকে কিনতেও পারো---ভাড়াও নিতেপারো---ি রজনেবল্ প্রাইসে পেয়ে যাবে।

----রিজনেবল্ না ছাই। বলো কমিশন আছে।

----বুঝতেই পারছ ব্যবসা করে খেতে হয়।

----তুমি যে জায়গায় পৌঁছে গেছ এটা তোমাকেমানায় না।

----আমি নই মিস ইন্টালিজেনশিয়া, আমাদেরকোম্পানি। প্লিজ সনজিদা তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে।

---দেখি।

---আজ তো তোমার টিংকুর সাথে ডেট ক্ক

---হ্যাঁ।

---ওর সাথে তো একদিন পরিচয় করিয়ে দিতেপারো।

---একদম নট। হি ইজ সো জেলাস অফ ইউ নো, মৎবোল্ ইয়ার, হয়ত মনিটারের স্ক্রিনটাই ভেঙে দেবে।

---ও বোধহয় তোমাকে বিয়ে করতে চায়।

---দ্যাখো না, এমন পিছনে লেগেছে। কিছুতেইবোঝাতে পারছি না বয় ফ্রেন্ডমানেই বিয়ে নয়।

---পাত্র হিসেবে কিন্তু মন্দ না।

---তো দাও না ওর জন্যে একটা পাত্রী দেখে, তাহলেআমি তো বাঁচি।

---দেখে রেখেছি তো।

---কে ক্ক

---এই যে, সামনে বসে আছে।

---তাতে তোমার লাভ ক্ক

---ও তো সেল্সে আছে। মাসে কুড়ি দিন ঘরেরবাইরে। তখন তুমি আমার সাথে গল্প করবে।

---অলওয়েজ বিজ্নেস্---বাস্টার্ড।

একটা নিটোল নরম ক্রুদ্ধ তর্জনি এস্কেপ্ বাট্নচেপে ধরে।

:

দুই.

টিংকুর সাথে যে বার-কাম-রেস্তরাঁটায়সনজিদা সাধারণত অ্যাপো মারে সেটা খুব অভিজাত পাড়ায় না হলেওঅ্যাম্বিয়েন্সটা অসাধারন আর প্রাইসটা রিজনেবল্ হওয়ায় ওদের দুজনেরইএটা পছন্দ। এর সাথে উপরি পাওনা একটা পুরনো ব্যান্ডযারা অসাধারণ কান্ট্রিবাজায়। সনজিদা আর টিংকু দুজনেরই প্রিয় এই ব্যান্ড। ওদের দুজনের মধ্যেএকটা : অঘোষিত ব্যবস্থা হয়ে গেছে--- মাসে চারদিনের মধেও একটা দিন সনজিদা বিল পে করবে। প্রাইসঠিকঠাক হওয়ায় এটাও ওর একটা বাড়তি সুবিধা। কালকের ঐ হ্যাঙ্গুটাকেএড়াবার জন্যে ও আজ তাড়াতাড়িই চলে এসেছে। এতে অবশ্য কোন অসুবিধা নেই।প্রধানত টিংকু মিশুকে স্বভাবের জন্যেই এদের ওয়েটার ম্যানেজার সবাইবেশ পরিচিত হয়ে গেছে। যেদিন বিল খুব বেশি হয়ে যায় আধবয়স্ক ম্যানেজার এসেবলে---টিংকু ভাই ক্ক মিটার চেপে । কোন কোন ওয়েটারআবার রসিকতা করে---তোমাদের বিয়েতে যেন বাদ না পড়ি। এসব কথা শুনেসনজিদা রাগ করে না, আবার বিশেষ প্রশ্রয়ও দেয় না। যেন খানিকটা করুণাইকরে---- এরা তো আর নারীবাদের এই বই পড়েনি, মেয়ে - পুরুষের বন্ধুত্বনিয়ে এরা ঐ একরকম ভাবেই ভাবতে পারে। হে ভার্জিনিয়া উল্ফ, তুমিক্ষমা করো। এরা তোমার আদি নারীবাদ রুম অফ ওয়ান্স ওন পড়েইনি।টিংকু : অবশ্য এনজয় করে ওদের কথা।আজকাল ফ্রাস্টেশন্ থেকে মাঝে মাঝে ইরিটেটিং হয়ে উঠলেও ও বেশসভ্য, সুইট, এনটারটেইনিং। কিন্তু সঞ্জীবের পাশে নেহাত জোলো।

:

একটা অরেঞ্জ জুস নিয়ে সনজিদা বসেছিল ব্যান্ডটারমুখোমুখি। সন্ধেএখনও জমেনি। রেস্তরাঁটা ফাঁকাই। একটা ওয়েটারগায়ে পড় গল্প করতে এলে সনজিদা ভদ্রস্থ শীতলতায় এড়াল। আসলে এখনওর একা থাকতেই ভাল লাগছে। ব্যান্ডটা এখন পুরোপুরি সেজে ওঠেনি। খালিমেটালিক ফ্লুট বাজায় যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মধ্য বয়স্কটি, তিনি বাঁশিটা হাতেধরে একটা চেয়ারের ওপর বসেছিলেন। আনমনে বসে থাকতে থাকতেঅনেকক্ষণ পর : সনজিদা খেয়াল করলবাঁশিওয়ালাটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবলে হয়ত হঠাৎই চোখে চোখপড়ে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ও সিওর হল----না। লোকটা সত্যিইচোখের পলক না ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এই বয়সেও লোকটারদৃষ্টিতে বেশ একটা স্নিগ্ধ রোমান্টিকতা টলটলে। ওর বাঁশির সুরেরমতই, অতীতচারী, মায়াময়। : ব্যাপারটা : বেশরোমাঞ্চকর ঠেকলো সনজিদার কাছে। বেশ অন্যরকম। কাঁধ দুটোর কৌশলীসঙ্কোচনে বুকের বিন্যাস আরও স্পষ্ট করে মাঝে মাঝে লুক দিতে লাগললোকটার দিকে আর অপেক্ষা করল কখন লোকটা ওর সাথে যেচেআলাপকরতে আসবেন। ও তখন পট করে ভদ্রলোককে একটা ড্রিঙ্ক অফার করেবলবে---প্লিজ, আপনি শুধু আমার জন্যেএকটা সুর বাজান। ঠিক এই সময় প্রবেশকরবে টিংকু আর এটা দেখে নিশ্চয় তাক লেগে যাবে, হিংসাই হবে ওর। কালসঞ্জীবকেও ফলাও করে বলতে পারবে গল্পটা। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা : করার পরও লোকটার মধ্যে কোনভাবান্তর দেখা গেল না। লোকটা যেন একটা : চোখ রেখে তাকিয়ে আছে অন্যদিকে। হয়ত অতীতের দিকে। বাভাবছে কোন সুরের কথা। পুরনো দিনের লোকগুলো ভাল, বাট ভেরিরোরিং ইয়ার ক্ক উঃ ক্ক টিংকুটা এত দেরি করছে কেন ক্ক এবার তো এলেই পারে।

:

জুসটা শেষ হবার আগেই টিংকু ঢুকল। মুখটা বেশথমথমে । চেয়ার বসার আগেই রয়েল স্ট্যাগের লার্জ পেগের অর্ডার দিলএকটা। এ - সব আচরণ সনজিদার চেনা। আজ : ও ঝগড়া করার মুডেই এসেছে। কারণটাও আন্দাজ করতে পারছে।অনেক্ষখুণ গুম মেরে থাকল টিংকু, আর সনজিদা ওর দিকে তাকিয়েমুচকি হাসল। ও জানত এই হাসিটায় টিংকু মনে মনে আরও রেগে যাচ্ছে। সাস্যুইট না ক্ক : অবশেষে, যা হয়, ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে টিংকু মুখ খুলল।

----পড়বে কোনদিন বিপদে তখন বুঝবে মজা। তখন এইশর্মা বাঁচাতে যাবে না।

---তোমায় ডাকবে কে ক্ক

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তখন দেখা যাবে তোমারক্ষ্যামতা কত। তখন তোমার : ঐনারীবাদীরা দূরে দাঁড়িয়ে ঘটনাটার নারীবাদী : ব্যাখ্যা করবে কিন্তু কেউ বাঁচাতে যাবে না।

---শুধু বাঁচাতে যাবেন আমাদের টিংকু দি ব্ল্যাকক্যাট্।

---আমাকে না ডাকলে কেন মরতে যাব।

---ও ক্ক ডাকলেই বুঝি : মরতে যাও ক্ক আহা বেচারা কি বাধ্য। ঠিক বিয়ের আগের প্রেমিকদের মত।

---ইয়ার্কি মেরো না তো। পড়বে যেদিন সেরকমছেলের পাল্লায়, মাতাল হয়ে গাড়িতে চাপলে কোথায় নিয়ে যেতে কোথোয়নিয়ে ফেলবে বুঝবে।

---আমাদের কি বুদ্ধি নেই নাকি ক্ক সেরকম ছেলের পাল্লায় পড়ব কেন ক্ক

---আহ ক্ক বুদ্ধিটা যদি একটু অন্যদিকে কাজে লাগাতে ক্ক সব ঐ সঞ্জীব ছোকরার জন্যে হচ্ছে।

---ও আবার কি করল।

---ও ছাড়া কে শেখাচ্ছে : এসব ক্ক ওর হাসিতে পয়সা, তাকানোতে পয়সা,কথা বলায় পয়সা। আর তোমরাও ভেবে ফেলছ একটা ছেলের সাথে কিছুক্ষণগল্প করলে, একটু হাসলে, একটু ডিস্কো নাচলে ছেলেটার পয়সারভরপেট নেশা করা যায়।

---টিংকু ক্ক ডোন্ট ক্রস ইওর লিমিট।

জোরে ড্রাম বিটিং আরম্ভ হয়। সনজিদা গুম মেরেযায়। জুসের শেষ চুমুকটা না দিয়ে গ্লাসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।বাঁশিওয়ালাা ধ রে জন ডেনববের গান। একটু পরে টিংকু : সনজিদার হাতে : আলতো চাপ দিয়ে বলে,
----আই অ্যাম সরি মিতু।
সনজিদা হাত হরিয়ে নেয়।
---সো সরি বাবা।
এবার চোখের দু-কোণে জমতে থাকা দ্বিধাগস্ত জলটালবাহানা ছেড়ে সনজিদার দু-গাল বেয়ে ঝরে পড়ে। ও মৃদু কাঁপা স্বরে বলে,

---আমি কিন্তু সঞ্জীবকে বলিনি আমার ডাক নাম মিতু ।
----আই নো আই নো দ্যাট। টিংকু সনজিদার গালেহাত ঠেকায়।
---সত্যি বিশ্বাস কর, কালকের ঘটনাটায় আমারওখুব খারাপ লেগেছে। কিন্তু সুরিতাটা এমন এডামেন্ট হয়ে গেল, ওকে ছেড়ে---

----জাস্ট লিভ হার। ওটা একটা ব্লাডিবোলাপসুয়াস বিচ। ওর সাথে কোন ভাবেই তোমার বন্ধুত্ব হতে পারে না।তোমার ঐ সঞ্জীব এপিসোডটাও এবার শেষ হওয়া দরকার। আমি আজ : একটা ছেলেকে আসতে বলেছি । ছেলেটাসঞ্জীবকেচেনে। তুমি তো এক বার রক্তমাংসের সঞ্জীবকে দেখতে চাও এই তো ক্ক ওতোমায় হেল্প করতে পারবে।
কান্না জড়ান কণ্ঠেই সনজিদা বলে----থ্যাঙ্কইউ।
---মেনসন নট প্লিজ ইন্টালিজেনসিয়া।
---আঃ ক্ক তুমি কেন সঞ্জীবের মত করে কথা বলছ ক্ক
---তুমি তো ওর কথা পছন্দ কর।
---আমি তোমার কথাও পছন্দ করি। কি করব বল,আমি যে দুজনকেই ভালবাসি। আবার একটা নতুন সুব শুরু হয়। আস্তেআস্তে ধ াতস্থ হয় সনজিদা।
---তোমার জন্যে একটা পেগ বলি ক্ক
---না, আজ নো হার্ডড্রিঙ্কস।
---দিস ইজ ভেরি গুড ডিনিসিন মিস সফ্ট ড্রিঙ্ককনসেনট্রেটেড।
সনজিদার বেঁটেখাটো নরম মোমের মত গড়নটাকেএভাবেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে টিংকু এবং ওর গর্ব ওটা সঞ্জীবের যেকোন প্রফেশনাল রসিকতার চেয়ে অনেক ভাল। লোকে বলে অ্যাপ্রোপিয়েট,ফলে সনজিদা রেগে যায়। তবু টিংকু মাঝে মাঝে ডাকে--- আমার তো সঞ্জীবেরমত ব্যবসা বাড়ানর দায় নোই তাই তোমাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়েতোল্লা দিতে পারব না গো। আজ অবশ্য স নজিদা রাগ করে না। ও আবার খেয়ালকরে বাঁশিওয়ালা ভদ্রলোক ওর দিকে তাকিয়ে : আছে ক্ক
----এই টিংকাই, : দ্যাখো। ওই লোকটা- না আজ প্রথম থেকে আমার দিকেতাকিয়ে আছে।
---কে ঞ্জ
---আরে বাঁশি বাজাচ্ছে ওই লোকটা।
---গ্রেট পিটার দা ক্ক ইমপসেব্ল্।
---আমি বলছি তাকিয়ে আছে। যখন ব্যান্ডশুরু হয়নি, তুমিছিলে না, তখন একেবারে সরাসরি তাকিয়ে ছিল।
---অসম্ভবরে বাবা।
---কেন অসম্ভব বলছ ঞ্জ
---আমি পিটারদাকে চিনি। তোমাকে আজপরিচয় করিয় দেব।
---আমার বয়ে গেছে পরিচিত হতে।
---বেশ ক্ক পরিচিত না হও, চিনে তো নিতে পারো।
একটা গান শেষের মুখে আসতে টিংকু উঠেব্যান্ডটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গানটা শেষ হতে হঠাৎ টিংকু পিটারদারহাত থেকে বাঁশি টা : কেড়ে নিয়েমাটিতে ফেলে দেয় আর পিটারদা ওফ ক্ক বাস্টার্ড : ক্ক হুইজ দ্যাট ঞ্জ বলে চিৎকার করে মেঝেতে বসে পড়ে বাঁশি টাহাতড়ায় টিংকুই বাঁশিটা মেঝে থেকে তুলে ওর হাতে দিয়ে বলে,
---মি টিংকু পিটার দা ক্ক
---ওফ ক্ক : বয় ক্ক ইট্স ওকে।
পিটারের সাথে টিংকুর কথোপকথন সনজিদা শুনতেনা পেলেও এটা বোঝে বাঁশিওয়ালা অন্ধ।
টিংকু বিজয়ীর গর্বে টেবিলে ফিরে আসে। পরাজয়স্বীকারের অসুবিধাটা মাথায় রেখেই সনজিদা আপার হ্যান্ড নেয়।
---মুখে বললেই বিশ্বাস করতাম। লোকটাকেকষ্ট দেওয়ার কোন মানে নেই।

---তোমরা শুনে শেখো না, দেখেও শেখো না, ঠেকেকতটা শেখো সেটাতেও সন্দেহ : আছে।তোমরা শেখো শুধু অন্যকে কষ্ট দিে য়।

---আমরা বলতে ক্ক

---তোমাদের জেনারেশন্ নাও ক্ক

---ঠিক বুঝতে পারি না।

---অলওয়েজ বাড়াবাড়ি।

---অ্যান্ডইউ নিড ইট।

বলেই টেবিলের তলায় ও জুতোশুদ্ধ পা চেপে ধরলসনজিদার বুড়ো : আঙুলে। সনজিদা যন্ত্রণায়চিৎকার করে উঠল। শত জোড়া চোখ ঘুরল সনজিদার : দিকে । থেমে গেল ব্যান্ড। টিংকু শীতল কণ্ঠেবলল,

----এবার : সকলে তোমার দিকে তাকাচ্ছে, দ্যাখো , এমনকি পিটারদাও।

----হোয়াই ডিড ইউ ডু দিস বয় ক্ক

---ফর মি পিটারদা।

---দেয়ার দ্য প্রবলেম লাইজ।

:

তিন.

কোলকাতাটা সনজিদা এখন ও খুব ভাল করে চেনে না।টিংকুর পরিচিত ছেলেটি দক্ষিণ কোলকাতার য়ে অঞ্চলটায় : ওকে নিয়ে এল এটা তো ওর একেবারেইঅপরিচিত। অবশ্য ছেলেটিকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য লাগায়, তার থেকেও বড়কথা ওর ওপর টিংকুর একটা কমান্ডআছে বলে মনে হওয়ায় ও ভয় পেল না। য়েগলিটায় এরা ঢুকতে চলেছে তার শুরুতেই একটা মিশনারি স্কুল আর সুন্দররক্ষণাবেক্ষণে থাকা বেশ পুরনো আমলের কিছু বাড়ি। একটুএগোতেই গলির দুধারে সার দিয়ে শুরু হল বাজার। গলিটা হে য় গেল সরু, অন্ধকার,দুর্গন্ধময়। তরকারি বাজারের দরের বিচিত্র হাঁক আর রিকসা : ও ঠেলার মিলিত কোরাসে সনজিদার মনে হলএখানে কি সময় এগোয়নি ক্ক এরকম একটা জায়গায় এরা অফিস করল কেন ক্ক ডানদিকে আরও সরু একটা গলিতে ঢুকতেই মাছেরগন্ধে বমি পাবারজোগাড়। এবার দরের সম্মিলিত আওয়াজের সাথে যুক্ত হলফেলে দেওয়া কানকো-পেট-পটকা নিয়ে কুকুরদের টানাটানি আরচিৎকার। এরই মধ্যে, সাতসকালেই এক মাতাল দুর্গন্ধের মধ্যে আরও দুর্গন্ধছড়িয়ে বমি করছে। সনজিদার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এলো---উঃ ক্ক মাগো ক্ক : আস্তে আস্তে বাজারের : শব্দটা মিলিয়ে গেলে গলিটা হয়ে উঠল আরও সরু, আরও অন্ধকার।আওয়াজটা কমতে কমতে অস্বাভাবিক নীরবতায় বদলে গেল যখন, সনজিদা ভয়ে ভয়েদুদিকে তাকাতেই বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। হাড় বের করা,পলেস্তরা খসা খিন্ন খাজুরাহের গায়ে সেঁটে রয়েছে ওই উগ্র সাজেররুগ্ন মোহিনী মূর্তিগুলো কাদের জ্ঞ একজন গুড়াখু দিয়ে দাঁত মাজছে, একজন হাঁটুর উপরে শাড়ি তুলে দিয়েতেল মাখছে। ওই দিকে ওই মেয়েটি এমন আলস্যে নিজেকে দেওয়ালের ভরে ছেড়েদিয়েছে যে ওর বুক ও : পেটেরপ্রায় পুরোটাই অনাবৃত। সনজিদা ছেলেটির দিকে তাকাতে ছেলেটাএমনভাবে বাও করল যেন সঞ্জীবকে পেতে হলে এ এক অনিবার্য অভিসার।

:

---এটা কি সোনাগাছি ক্ক

---না। কানাগলিতে এমন ছোটখাট দু-চারটে পাট্টিসারা কলকাতাতেই ছড়িয়ে আছে।

ডিসেন্ট্রালাইজেশন ক্কক্ক মনে মনে ভাবে সনজিদা। কানাগলিটা শেষ হয় নিচের দিকটা জংধরা টিনের পাতেমোড়া এক রংচটা দরজার সামনে। ছেলেটা দরজা দেখিয়ে দেয়।

---কি ওটা ক্ক

--ওটাই অফিস।

---ওটা ক্কক্ক

---হ্যাঁ ক্ক

---আপনি যাবেন না ক্ক

---না। ওদের সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ।

---কেন ক্ক

---প্রথমদিকে আমি ওদের পাট্নার হববলেছিলাম, কিন্তু এটাতে লাভ হবেনা ভেবে শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দি।

এবার সনজিদা ভয় পায়। ও বিশ্বাস করতে পারে নাওই বাথরুমের মত দরজাটা খুলে একটা ওয়েবসাইডের অফিসে ঢুকতে হবে। আবার যদি সত্যি হয় তবে তো সঞ্জীবের এত কাছে এসেও ফিরে যেতে হবে। আশাা ওঅশঙ্কার দোটানায় ও মনে টস করে নেয় এবং চোখে হেড ভেসে ওঠায় দরজাঠেলে ভেতরে ঢোকার : মনস্থিরকরে।

:
ভিতরে ঢুকতেই : অন্য দৃশ্য। যেন স্বর্গ আর নরকের মধ্যে তফাত। যেন বাইরেটাপৃথিবী আর ভিতরটা এক নীল মহাকাশ যেখানে কোন কিছুর ওজন নেই কিন্তুঅস্তিত্ব আছে। নীলাভ : আলোয়,মেঝের গাঢ় কার্পেট আর দেওয়ালে গোটা ঘরটা এই কম শীতেওএ য়ারকন্ডিশনের মৃদু আভায় মোড়া। বাইরের দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে এমনএকটা রুম ফ্রেশনার ব্যবহার করা হয়েছে ফ্রেশনার-পাগল সানজিদার কাছে ও যেটাইউনিক্। ও আশ্বস্ত হয় এটা কোনোসমাজবিরোধীর ঠেক হতে পারে না।দেওয়াল জুড়ে সারি সারি মনি টর। দরজার সামনা সামনি একটা বিশাল ফ্ল্যাটস্ক্রিন। টিভি। আর মাঝ বরাবর গলি কল্পনা করে নিলে দুধারে সারি সারিয়্যাকে আ গুনতি সিডি ভরা। মনিটরে বিভিন্ন মুডে সঞ্জীব বিভিন্ন জনের সাথেকথা বলছে। আর প্রতিটি মনিটরের নিচে ডেস্ক ঘাড় গুঁজে এক টাকরে ছেলে। প্রত্যেকেই সঞ্জীবের মত দেখতে। সনজিদা হাত নেড়ে বলে---হাইসঞ্জীব ক্ক কেউ কোন উত্তর দেয় না, ওর দিকে ফি রেওতাকায় না। এবার অধৈর্য, অভিমানী সনজিদা জোরে ডাকে। গলার স্বরে দেওয়ালেরসাথে ঝুলে থাকা ছোট ছোট ডেস্কে যার া কাজ করছিল তারা ঘাড় ঘুরিয়েওকে দেখার পরও সনজিদার বিশ্বাস হয় না ওগুলো আলাদা মানুষ, সঞ্জীবের ছায়াপুতুল নয়। সামনের বড়ো ফ্ল্যাট স্ক্রিনটার ধীরে আলো ফুটতে ওর আশাহয় এবার নিশ্চয় সঞ্জীব একটা সারপ্রাইজ দিতে : চলেছে। কিন্তু এবার ও ওকে হতাশ করে স্ক্রিনে একে একে ফুটে ওঠে : একটা মনিটরের উল্টো দিক,তার ওপাশে একটা অচেনা যন্ত্র, সব শেষে একটা কৃশ মুখ। সুন্দর করে দাড়িকামান টানাটান গাল ফর্সা না হলুদ বোঝা যায় না। ঘুমহীন চোখ কোটরাগত , : চোখের নিচে কালি। ি তরিশ-পঁয়ত্রিশবছরের মুখেযৌবন যেন থাকতে ভুলে গেছে। এই মুখ : দেখলে মায়া হয়, এই মুখ দেখলে ভয় হয়। নিচের ঠোঁটে এলিয়েথাকা একটা চাপা প্রত্যয়ে ছেলেটি যথেষ্ট অহংকারী, মৃত্যুর সময়যা হয়ত ওর একমাত্র সম্বল হতে পারে। তবুও মনে হয় স নজিদার, এক সময় ছেলেটিহয়ত সঞ্জীবের থেকেও দেখতে সুন্দর ছিল। ছেলেটা মনিটর থেকে চোখ না সরিয়েইওকে ইঙ্গিতে সা মনের চেয়ারটায় বসতে বলে। য়েন হসপিটালের বেডেমৃত্যুশয্যায় রুগ্ন আত্মীয় এমনভাবেহেসে বলে।

---রাস্তা চিনে : আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো ক্ক

---একটু হয়েছে, তবে ও কিছু না।

---জানি। আসলে সঞ্জীবকে পাবার জন্যে এর থেকেও অনেকবেশি : কষ্ট অনেকে করছে তাই না।ভালোবাসা এইটুকু দাবি করতে ই পারে। আচ্ছা ক্ক সঞ্জীবের আর কি আপনি দেখতে চান। নগ্নশরীর । কঙ্কাল ক্ক

---আমি মানুষটাকে দেখতে চাই।

---গোটা মানুষটাকে দেখতে চাই।

---গোটা মানুষটাকে তো আমরা দেখিয়েছি। এরবাইরে কিছু দেখাতে গেলে মানে বুঝতেই পারছেন---ইন্ডিয়ান সেন্সার বোর্ডএখ নও ততো উদার নয়। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে ছেলেটি।

---আই ডিড্ন্ট মিন দ্যাট। আই ওয়ান্ট টু টাচহিম।

:
কথা বলতে বলতেই সনজিদার মনে হয় মনিটরে ছেলেটিওর গলা আর বুকের অনাবৃত সন্ধির দকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটাক্ষুধার্ত অথচ ভিখিরির মত মিনতি মাখা। এই দৃষ্টিকে ঘৃণা করাযায় : না। করুণা করে যা দেওয়া যায় তাঅতি সামান্য, ভিখিরির উপযুক্ত যেটুকু।

---আপনাদের এসিটা এত কম করে রেখেছেন । বিলবাঁচাচ্ছেন নাকি ক্ক ---বলে প্রথমে সনজিদা হেয়ার ব্যান্ডটাখোলে, তারপর ি জনসের জ্যাকেটের নেটা আরও একটু নামিয়ে দেয়। খোলাচুলআর উত্তেজক টপে সনজিদা দপ করে জ্বলে ওঠে। ছেলেটি : মনি টরের দিকে : চুপ করে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তাপরর হঠাৎ যেনপ্রচন্ড তাড়ার বা তাড়নার মুখে, : কথা দেয় কাল ওর সাথে একটি বিশেষ ডিস্কো ঠেকে দেখা করলে ওসঞ্জীবের সাথে আলাপ করিয়ে দেবে।

:

----তন্ত্রাতে গেলে হয় না। ঞ্জ

---না, আমি কোন কমন প্লেসে যাই না।

---কেন ঞ্জ

---মনে হয় লোকে আমাকে চিনে ফেলবে। হয়তমার্ডার করে দেবে। জানি ওটা আমার রোগ, কিন্তু আমার মনে হয়, কাল আমায়ি চনতে পারবেন তো ক্ক

----না : চিনতে পাবার কারণ ক্ক

---না, ইমেজটা তো এখন দশগুণ বড়ো।

----আশা, করি কাল স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেইচিনব।

----স্বাভাবিক বলতে ঞ্জ মানুষযেমন হয় অথবা মানুষের যেমন হওয়া উচিত, কোন্টাকে আপনি স্বাভাবিক মনেকরবেন ।

----জানি না। কালকের কোন কিছুই আমি আজ ঠিককরে রাখি না।

----এক্স্যাক্টলি। সিচুয়েশন ইজ লাইফ এটা বিশ্বাসকরলে কোন কিছুই অসম্ভব মনে হয় না।।
এমন কি মৃত্যুও না। নো রিপেন্টেন্স, নোরিপেন্টেন্স---অস্থির ভাবে ফিস ফিস করে ও।
-----ঠিকই। বাট লাইফ সো গ্লোরিয়াস যেতারপরেও বেঁচে থাকাটা থেকে যায়, লাইফ আ গ্র্যাস্ ভ্যালি, গ্রিন্ বাট্নট্ সো ডিপ্ : রুটেড্।
---আই অ্যাম রিয়েলি জেলাস্ অফ সঞ্জীব, হি হ্যাজ এগার্ল ফ্রেন্ডলাইক ইউ। বাট হোয়াট্ এ ট্র্যাজিক ফরচুন, হি কান্ট টাচইউ, ন ট্ ইভেন সি ইউ। তারপর অত্যন্ত কমান্ডিং সুরে বলে ---আমিকিন্তু আপনার বয়ফ্রেন্ডকে চিনি। সে যেন না থাকে।
:
চার
যে প্রশ্নটা সনজিদাকে সারারাত ভাবিয়েছিল, ডিস্কো ঠেকের একটা আধো-অন্ধকার কোণায় মুখোমুখি বসে ছেলেটির : মুখে ঠিক সেই প্রশ্নটাইশুনে ও বিস্মিত হল, আশ্বস্ত হল। যাক ক্ক : এই চিন্তাটার দায় আর : ওকে নিতে হবে
না। হুইস্কির পেগে বরফ ঢালতে ঢালতে ছেলেটাজিজ্ঞেসা করল,
----আপনাকে কেন আমি এতটা প্রশ্রয় দিচ্ছিবলুন তো ক্ক
----কেন ক্ক :
----সঞ্জীব আমাদের বিজনেস সিক্রেট। আমি কেনআপনাকে ওর সাথে দেখা করিয়ে দেবো ঞ্জ :
----তা তো জানি না। তবে আমি চাই ওর সাথে দেখাকরতে।
----আপনি দেখা করতে চাইছেন বলে আমাকেও দেখাকরিয়ে দিতে হবে আমি জানতে চাই : এই অনিবার্যতার জন্ম কোথায় ঞ্জ :
---হয়ত একই জায়গায়, নইলে, সঞ্জীবের সাথে দেখাকরটাও এত অনিবার্য হবে কেন আমার জীবনে ক্ক :
----আপনি কি ওকে ভালোবাসবেন ক্ক :
----দুদিন আগে আমি এই প্রশ্নের উত্তরজানতাম। এখন বলতে পারব না।
----তাহলে দেখা করতে চাইছেন কেন ক্ক :
---ব্যাস ক্ক : চাই বলে।
----ইউ আর টু ইন্টালিজেন্ট।
সনজিদা মদ নেয়নি, আর ছেলেটাও খুব ধীরে ধীরে সিপমারছিল, যেন দুজনে আজ মাতাল নাহরার প্রতিযোগিতায় মেতেছে। ইতিমধ্যেমিউজিক শুরু হতে ডিস্কো ফ্লোর আস্তে আস্তে ভর্তি হতে শুরু করল।সনজিদা প্রস্তাব দিল চলুন, নাচি।
---- আমি তো নাচতে জানি না।
----নাচের কিছু না। তালে চালে শরীর নাচান।
----আমি স্টেপিং জানি কিন্তু নাচতে জানি না।
----মানে ক্ক :
----আমি নাচতে গেলে হাঁপিয়ে যাই।
ইতিমধ্যে ডিস্কো ঠেকের সাধারণ রীতি অনুসারেএকটা ছেলে নাচবার জন্যে সনজিদার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সনজিদাও হাতবাড়াতে এই ছেলেটি ওর হাত চেপে ধরে এমন পরিমিত হিংস্রতায় বলে---আমারসাথে গল্প করতে কি ভাল : লাগছে না।সেই ছেলেটি অবাক হয়ে শরীরে একটা অসহায়তার মুদ্রা করে চলে যেতে সনজিদা : বলে ---সঞ্জীব কোথায় ঞ্জ :
:
----যদি ওর সাথে দেখা করতে না দি ক্ক :
----তাহলে : আমি থাকব না।
----যদি যেতে না দি ক্ক :
----আপনার কি সে ক্ষমতা আছে ক্ক :
----তুমি জানো না : আমার ক্ষমতা কতখানি।
----আসলে আপনি ভীতু, সঞ্জীবের সাথে আলাপকরিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছেন।
----তোমার সাহস আছে : সঞ্জীবের মুখোমুখি হওয়ার ঞ্জ
----না থাকলে এতদূর এগোলাম কেন ক্ক :
----আর কতদূর এগোতে পাববে তুমি ঞ্জ
----যতদূর যেতে হবে। আসলে আমি বিষয়টা শেষকরতে চাই।
---তা হলে তোমাকে আমার ফ্ল্যাটে যেতে হবে।
:

সনজিদা সরাসরি কোন উত্তর না দিলেও ভাবে, এটাতো জানাই ছিল, আর এর জন্য সে মনে মনে প্রস্তুত।
গাড়িতে ওরা কেউ কারো সাথে একটা ও কথা বললনা। আনোয়ার শা রোডের মধ্যে একটা গলিরভিতরে ছেলেটার ফ্ল্যাট চারত লায়। ওর ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজাটা বাথরুমের : দরজার মত না হলেও সিস্টেমটা যেন এক, বাইরেটা পৃথিবী,ভিতরটা মহাকাশ। এ মনকি মেঝের রঙ, রুম ফ্রেশানারের গন্ধ সব এক। দেওয়ালেতিনটে মনিটর, মাঝেরটা অফিসের : মত অত বড় না হলেও বেশ বড় । এর সাথে আছে বেশ দামী ঘরোয়াআসবাব, একদিকে একটা কাচের আলমারিতে সার সার সাজান একটু করে খেয়েরাখা বিভি ন্ন ব্রান্ডের মদের সাইজের বোতল। আর মাঝে মেঝে জুড়ে মানানসই : আবার বেমানান একটা বেঢপ বিলিয়াডবোর্ড।
আজ লেদার জ্যাকেটের তলায় যে টপটা পরেছেসনজিদা সেটাকে ব্রা-এর বৃহৎ স্কংক্ষরণ বলা যায়। ঘরে ঢুকে জ্যাকেটেরচেনটা একটু নামিয়ে একটা চেয়ারে বসতে বসতে সনজিদা বলল---একই গন্ধ না ক্ক :
----এই গন্ধটা ছাড়া আমার ঘুম হয় না।
----আপনি কি বিলিয়ার্ড খেলেন ক্ক :
---না।
---তাহলে।
----যারা মধুবনী পেন্টিং ঘরে সাজিয়ে তারা কিসবাই ছবি আঁকে । আর ওই যে বেতের যে চেয়ারটায় তুমি বলেছ, এটাতেকিভাে ব বসতে হয় তাও আমি জানি না।
----এটাতে বসেননি কোনদিন ক্ক :
---না।
কেন ক্ক :
ছেলেটা কোন : উত্তর দিয়ে না দিয়ে বলে, আমার বেডরুমে একটা বাঁশের ফ্রেমেরঅসাধারণ : আয়না আছে, ওটাতে আমিকোনি দন মুখ দেখিনি। ওই যে, মদের বোতলগুলো দেখছ। একটু একটু করেখাওয় ক্ক : আমিএক পেগের হাফ খাওয়ার পরই হয় ঘুমিে য় পড়ি অথবা আবার কাজে বসে যাই।তুমি হয়ত প্রশ্ন করবে তাহলে পরের দিন আবার একটা কিনি কেন ক্ক : আমায় ভোগ করে ত হবে তাই আমি কিনি।এত রোজগার করে আমার ভোগ করা উচিত, তাই আমি কিনি।
----ব্যাপারটা সহজ করে বল না, আমার সময় নেই ক্ক :
----ব্যাপারটা যদি সত্যিই অত সহজ হত তাহলে সহজকরেই বলতাম। পৃথিবীর ব্যস্ততম প্রেসিডেন্টেরও একটা এক্সট্রাম্যারিটাল অ ্যাফেয়ারের সময় থাকে, আর আমার মত একজন সামান্য লোকেরতিনটে পেগ গেলার সময় থাকবে না।
----তাহলে খাও না কেন ক্ক :
----একটু খুঁটে : খেয়ে খাবারটাকে সামনে ফেলে রাখলে নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভোগীমনে হয়। হয় না ঞ্জ :
----বিয়ে করেছ ক্ক :
---না।
কেন ঞ্জ :
ছেলেটা কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকে।
---আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতেবাধ্য নই।
---আই অ্যাম সরি।
----তবু আমি তোমাকে এই প্রশ্নেরউত্তর দেব। একচুয়েলি আই ডোন্ট নো হাউ টু টাচ ওয়ান।
না না, ওইসব মন - টন এসব ভাবে টাচ করা নয় ।আমার এই দুহাতের আঙ্গুল দিয়ে কোন সুন্দরীর নরম আঙুল কিভাবে স্পর্শ ক রবসেটাই জানি না। জানি না কি করে এই দু-হাত দিয়ে তাকে আমার বুকের মধ্যেটেনে নেব। কি ভাবে ঠোঁটের স্পর্শে আদরে অ াদরে ভরিয়ে দেব। তুমি সঞ্জীবকেটাচ করতে চাও, আর : আমি টাচকরতে চাই তোমাকে। তুমি আমায় শিখিয়ে দেবে ঞ্জ :
লেদার জ্যাকেটটা বিলিয়ার্ড বোর্ডের ওপর খুলেরাখতে রাখতে সনজিদা বলে,
---ওকে, দ্যাটস নট এ প্রবলেম । কিন্তু আমায়বলতে হবে সঞ্জীব কোথায় ঞ্জ :
---তুমি কি সঞ্জীবকে টাচ করতে চাও না কিব্যাপারটা এখানেই শেষ করতে চাও ঞ্জ :
---শেষ তো করতেই চাই।
----যদি আজই বিষয়টা শেষ করে দি তুমি কিআমায় শিখিয়ে দেবে ঞ্জ :
----আজই।
---আমি তোমার নাম জানি না।
----ওটার জন্যে নাম জানার দরকার হত যে যুগেসেটা আমরা পেরিয়ে এসেছি।
----না স্যার, এখানেই আপনার সঙ্গে সঞ্জিবের তফাত।সঞ্জীব কিন্তু জানত একসময় অনেক স্বামীই স্ত্রীদের নাম জানত না। তবুও ও

রটা হত,ফুলশয্যার রাত থেকেই হত।
---আঃ । বাদ দাও ওর কথা, আমি আজই চাই।
---ভেবে দেখব।
---বল দেবে ক্ক :
---বেশ।
---প্রমিস ক্ক :
---প্রমিস।
----দেন লুক।
:
ও একটা বাটন দাবে, মনিটরে আস্তেআস্তে ভেসে ওঠে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন সজীবের মাথা। সনজিদা আঁতকেওঠে----উঃ ক্ক : মাগো ক্ক : আবারএকটা বোতামের শব্দ হতে একটাা হাত : এইভাবে অস্তে আস্তে সঞ্জীবের সমস্ত ছিন্ন অঙ্গ-
প্রতঙ্গ ভেসে উটতে থাকল মনিটরে। একসময়সনজিদা মুখ ঢেকে ফেলে চিৎকার করে উঠল---- কোথায় সঞ্জীব ঞ্জ ----এটাইসঞ্জীব . । এর বাইরে সঞ্জীব বলে কেউ নেই।
----কোনদিন কি ছিল না ঞ্জ :
---ছিল । এখন নেই।
----তোমরা ওকে খুন করেছ ক্ক :
----খুন কেন বলছ, এটাই ওয়ার্ক মেথড।
---ইউ আর এ কিলার।
:
----সবটা শুনে মন্তব্য কর। যে চার বন্ধু আমরাব্যবসাটা শুরু করেছিলাম তার মধ্যে সবচেয়ে : মিডিওকার ছিল সঞ্জীব। আমরা বাকি তিনজন ছিলাম কম্পিউটারইঞ্জিনিয়ার। তাদের মধ্যে আমি আর একজন বন্ধু ছিলাম সফ্টওয়ার ইঞ্জিনিয়ার।যে টাকা ও ইনভেস্ট করেছিল তাও আমাদের চেয়ে কম। তবু : আমরা ওকে নিয়ে ছিলাম দিনের বন্ধু বলে।প্রথমদিকে আমরা চারজনেই চ্যাট শো-এ বসতাম। যেহেতু ও আর কিছুকরত না, তাই জি. কে মুখস্থ করে, বেশ কয়েকটা ভাষা শিখে, অভিনয়শিখে, ক্যারিসমা তৈরি করে ও ব্যাটা বেশ ক্লিক করে গেল। সবাই দেখি ওকেচায়। আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম এ ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের আর ভাবতে হবে না বলে। ওর জনপ্রিয়তার সাথে তাল রেখে বাড়তে লাগল আমাদের বিজনেস। : আর আমরাও ওকে ঘিরে নতুন নতুনপ্যাকেজ বানানয় মেতেক রইলাম। কাজের খেয়ালে বুঝিনি তলায় তলায় সঞ্জীবকি ফন্দি আঁটছে। যত জনপ্রিয়তা বাড়ল তত ও আমাদের সাথে দুর্ব্যবহারকরতে শুরু করল। যেন আমরা ওর চাকর। কিন্তু পাছে ও বেঁকে বসে তাই সে সবআমরা মেতে নিতাম।আমরা যতই টেকনিক্যাল সাইডটা দেখি, ওকে ছাড়া তোআর উপায় নেই। শেষে একদিন ও খাপ খুলল, রেরিয়েগেল ওর আসল রূপ। বলল,কোম্পানির লাভের ৬০ ক্ষ ওকে দিতে হবে, নাহলে ওক্যামেরার সমনে দাঁড়াবে
: না। এমনকি : ও এ প্রস্তাবও দিল----গোটাকোম্পানিটা ও কিনে নেবে। এর অর্থ আমাদেরকে ওর চাকর হয়ে থাকতে হবে।ওকে বোঝানর সমস্ত এফোর্ট ফেইল করল। তখন আমরা স্থির করলাম,ওকে মেরে প্রোগ্রামিং করে রেখে দেব। ওর ভয়েস স্টাডি করলাম,ফিলিং, অ্যাপ্রোচ, ক্যারিসমা সব স্টাডি করে একদিন ও এই অফিসেঘরের মধ্যেই.....
:
----আর আমার যাকে দেখছি ক্ক :
---সঞ্জীব নয়, ওর ইমেজ, যা আমাদের টেকনিক্যাল নোহাউ দিয়ে কাস্টমারদের সাথে স্পন্টেনিয়াসলি রিঅ্যাক্ট করাই।
----এই ঘটনা কতদিন আগে ঘটেছে ঞ্জ :
----চার বছর আগে
---তার মানে সঞ্জীবের সাথে আমার কোনদিনপরিচয়ই হয়নি ক্কক্ক : ----সনজিদা গায়ে জ্যাকেটটা চাপিয়ে দরজার দিকে এগোলো।
----একি ক্ক : কোথায় যাচ্ছ ঞ্জ :
----হস্টেল।
----তুমি যে আমায় প্রমিস করলে ক্ক : এখন বিট্রে করছ ক্ক :
----বিট্রে বলছ কেন, বল ওয়ার্ক মেথড।
:

পাঁচ

সনজিদা হস্টেল গেল না। পূর্ণ চন্দ্রের আকাশে গিয়ে বসলগঙ্গার ধারে। ওই বয়াগুলো, স্টিমার ছাড়ার আওয়াজ, বড় জাহাজটার স্থির ভেসে থাকা যা-যা কিছু ও দেখছে, আশঙ্কা হয় সনজিদার, তা কিদেখছে, নাকি ডিসকভারি চ্যানেলের কোন ডকুমেন্টারি। ও কি দেখতে পায়।

পিটারদা ছাড়া পৃথিবীর কেউ কি দেখতে পায়

:

চশমা বিভ্রাট

বিমলেন্দু পাল

প্রথম পর্ব

:::::::::: চশমাটা টেবিলের উপর পড়ে আছে।

চশমাটার দেখতে লাগলাম। আপাত দৃষ্টিতে অতি সাধারণ। একটু সেকেলে ধরনের। চশমাটা দুটো ডাঁটিই নেই। গোল দুটো ফ্রে ম। সোনালি রং-এর । মাঝখানটা স্প্রীং দেওয়া। নাকের উপর চেপে ধরে লাগালেই হলো। স্প্রীংটা আঁট হয়ে চেপে বসে নাকের :উপরে।

:

পুরোনো জিনিস সংগ্রহ করার একটা বাতিক আছে আমার। তাই মাঝে মাঝেই শিয়ালদাতে বৈঠকখানা বাজারের এক চেনা দোক ানদারের দোকান যাই। নতুন কিছু আছে কিনা দেখতে। ওর কাছ থেকে কলমদানি, বাতিদান আর কুকুরঘড়ি কিনেছি যা :এখনও বন্ধুরা দেখে অবার হয়ে যায়। সেদিন নেবার মত কিছুই ছিল না। ফিরে আসছিলাম। দোকানদারই ডেকে অবহেলাভরে চশমাটা ি দয়ে বললে, নেবেন নাকি। পুরোনো ডিজাইন। এখন আর ব্যাবহার করতে পারবেন না। প্রায় জলের দামেই পেয়ে গেলাম।

:

চশমাটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে নাকের ডগায় বসালাম। কাচটা কত পাওয়ারের জানি না। কিন্তু সবকিছু আগের চেয়ে পরিষ্ক ার এবং স্বচ্ছ লাগছে। চোখের পাওয়ার বাড়ল নাকি। ডাক্তার দেখিয়ে নিতে হবে।

:

চশমাটা পরে শিয়লদা বাজার ছাড়িয়ে রাস্তায় এলাম। সবাই আমাকে দেখছে। পাগল ভাবছে নাকি। ভিড়টা বেশ পাতলা লাগছে। রাস্তায় নোংরাও কম। ফ্লাইওভারের কাছে গেছি হঠাৎ শশাঙ্কর সাথে দেখা হয়ে গেল। বিশেষ প্রয়োজনে ওর কাছ থেকে একবা র টাকা ধার নিয়েছিলাম। দিতে পারছি না। এ নিয়ে ও বেশ কথা শুনিয়েছে আমায়। ওকে দেখে এড়াবার চেষ্টা করলেও ঠিক দে খ ফেলল আমায়। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে সে আমাকে ধরল।

:

ও নিজে থেকেই বলল ওর এখন আর টাকাটার বিশেষ প্রয়োজন নেই। আমার যখন সময় হবে তখন যেন দিই। যেমন এসেছিল ে তমনই এই কথাটা বলে কর্পূরের মতো উবে গেল। আমিও ট্রামে উঠলাম। ট্রাম প্রায় ফাঁকা । তবে আসন নেই । ভাইয়ের এক বন্ধ ু, যে আমাকে দেখেও সিগারেট লুকায় না, সে হঠাৎ :আসন ছেড়ে আমাকে বসতে বলল। না করলেও মানা শুনল না। চোখে চশ মাটা দেখে ও অবাক হয়ে গেছে। হবারই কথা।

:

ছায়া সিনেমার কাছে পূর্বা আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আজকাল আমাকে বিশেষ, পাত্তা দিতে চায় না। আর কেনইবা দেবে। পাঁ চ বছর ধরে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছি। বিয়ে করার মুরোদ হল না। ওকে কথা দিয়ে রেখেছি একটা ভাল চাকরি পেলেই বিয়ে করে ে ফলব। ছয়শ টাকা বেতনে প্রাইভেট ফার্মে হিসাব- রক্ষকের কাজ। কোন পে- স্কেল, ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশান, ডি.এ., পি.এফ কিছুই ে নই। হন্যে হয়ে খুঁজছি ভাল একটা চাকরির নিরাপত্তা, এদিকে বয়েস বেড়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস বি. এস. সি. টা করেছিলাম। তাই কি

ছু প্রাইভেট ট্যুশানি চালাচ্ছি।

:

পাঁচ বছর আগে পূর্বা কি অপূর্বই ছিল। তন্বী, সুন্দরী, নম্র, লাজুক, ওর সান্নিধ্য ভারি ভাল লাগত। ওকে যেদিন পড়াবার থাকত সেদিন আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যেত। তারপর করে :যে কি করে মাস্টারমাশাই থেকে প্রেমিকাহয়ে গেলাম সে ইতিহাসে যাচ্ছি না. একটা ভাল চাকরি না পেলে পূর্বাকে বিয়ে করতে পারছি না। এদিকে পূর্বার জন্য বাড়িতে পাত্র দেখা হচ্ছে। ওর বাড়িতে অসবর্ণে আপত্তি। তাই পূর্বা খুব টেনশানে ভুগছে।

:

পূর্বা যেন পাল্টে গেছে। আজকাল দেখা হলেই কথা কাটাকাটি। খোঁচা দিয়ে কথা। রীতিমত পৌরুষ নিয়ে টানাটানি। এভাবে ও আর চালাতে চায় না। বিয়ে, নয় ছাড়াছাড়ি। ও অনেক বাস্তববাদী। ওর স্বপ্ন হলো আলাদা একটা ঘর আর সংসার। মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য। সংসারের প্রতি কর্তব্যের খাতিরে পুরোনো প্রথার পরিবারে মাসান্তে সামান্য অর্থসাহায্য। এতে আমি রাজি হচ্ছি না। আজ বোধ হয় একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

:

টেলিফোনে তাঁরই আভাস পেলাম, হোক। আমিও উদাসীনতার অতলে তলিয়ে যাচ্চি। সব কিছুই নাগালের বাইরে। হাত ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে পা গুলো ছোট ছোট। সবার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছি না।

:

চশমাটা আর চোখ থেকে খুলিনি। ছায়ার কাছে পূর্বা আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে অবাক হল। তারপর খুশির আঁচল হাওয়ায় উড়িয়ে দৌড়ে এল একটা কিশোরী মেয়ের মত। আমার পছন্দমত একটা ছাপা শাড়ি পরা। দুটো বিনুনী করেছে বহুদিন পর।

:

প্রথম কম্প্লিমেন্ট ওই দিল। তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে ক্ক এরকম চোয়াড়ে চেহারায় বহুদিন এ রকম কথা শুনিনি। আজ আমরা সিনেমা দেখব। দুটো টিকিট কেটে রেখেছি। হিন্দি ছবি। মারদাঙ্গা আর সস্তা সেন্টিমেন্ট।

:

বহুদিন পরে, চীনা বাদাম খেতে খেতে ছবি দেখছিলাম, আমার একটা হাতের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে পূর্বা বসেছে। ওর গা থেকে একটা মৃদু সৌরভ ভেসে আসছে। আমারই দেওয়া আতর। ওর বাম স্তনটার নরম উষ্ণ স্পর্শ শরীরে অনেক দিন পর একটা সখানুভূতি নিয়ে আসছিল। চশমা পরে সিনেমা দেখতে কোন অসুবিধা হচ্চিল না। ছবির নায়িকার চেয়েও পূর্বাকে সুন্দর লাগছিল, ইন্টারভেলের পর পূর্বা আর থাকতে চাইল না। বলল, চল বরং একটু বেড়ানো যাক। বের হয়ে এলাম। বৈশাখের বিকেলে দমকা বাতাস নিয়ে ঝড় এল। ধুলোবালি ঢুকে পড়ল শরীরের অন্দরমহলে, পর্দাঘেরা কেবিনে চা নিয়ে মুখোমুখি বসলাম। টেবিলের তলা দিয়ে ওর পাটা আমার পা দিয়ে স্পর্শ করলাম। ওকে খুব স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছিল। পূর্বা কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছে। কোনো ভূমিকা নাকরে ও সরাসরি বলল, সন্তু, আর অপেক্ষা করতে পারছি না। কোনো কিন্তুটিন্তু নয়। রেজিষ্ট্রি অফিসে একটা নোটিশ দেয়ে রাখ।

---তোমার বাড়িতে জানাবে না ঞ্জ

---মা জানে।

---মত আছে ঞ্জ

--জানি না। বোধ হয় আছে।

--কিন্তু আমার যে ঘরের অভাব। এখন তো আলাদা বাড়ি করার মত সঙ্গতি নেই।

--ভাববার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন একসঙ্গেই থাকা যাবে, তোমার ইনটাভ্যুটার কিছু হল ঞ্জ

--না, এখনও সংবাদ পাইনি।

:

আমি ভাবতে লাগলাম। বিয়েটা করেই রাখি। অনেক দিন ত হল। মেয়ারা খুব বাস্তববাদী। আর পূর্বা পাশে থাকলে আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। সন্ধ্যার পর পূর্বাকে বাসে তুলে দিলাম। আজকের রাতটা কি সুন্দর। সিগারেট টানতে টানতে বাড়িতে ঢুকছি আমার ছোট বোন কল্‌কলিয়ে উঠল, মা দাদা এসেছে।

মা প্রথমে চিনতে পারে নি, চশমাটা কোথায় পেলি। তোকে যে বদলে দিয়েছে।

ভাই একটি মুখ-ছেঁড়া খামে চিঠি নিয়ে এসে বলল, দাদা, তোর ব্যাংকের চাকরিটা হয়েছে।

বাড়িতে উৎসব পড়ে গেল।

:

যত্ন করে চশমাটা খুলে রাখলাম। ওর জন্যই আজকের দিনটা এভাবে বদলে গেল। কোন অসুখ আর আমার নেই।পৃথিবীটা কি সুন্দর ক্ক চাঁদটা কত বড় ক্ক জোৎস্না যেন পৌষ মাসের রোদ ক্ক
:
দ্বিতীয় পর্ব
রোববারে আমি ঘুম থেকে দেরিতে উঠি। আজ সকাল সকাল উঠেছি। পূর্বাকে খবরটা দিতে হবে। তাড়াতাড়ি জল খাবারটা খেয়ে বের হয়ে পড়লাম। হন্তদন্ত হয়ে চলেছি। পথে শশাঙ্কর সাথে দেখা। ব্যাজার মুখে জিগ্যেসা করল-সকাল বেলায় কোথায় যাচ্ছিস।
--একটা কাজে, একটু থেমে বলি, শশাঙ্ক শোন্ তোর সঙ্গে কথা আছে। আমার ব্যংকে একটা চাকরি হয়েছে, তোর টাকাটা এবারে বোধহয় শোধ দিয়ে দেব।
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শশাঙ্ক।
তোর চাকরি ক্ক এরখম গুল্ আর কতদিন চালাবি। আমার টাকাটা খুব দরকার। তাড়াতাড়ি দিয়ে দিস।
---কিন্তু কালই যে বললি টাকাটার এখন কোন প্রয়োজন নেই।
---কাল ক্ক পাগল নাকি। তোর সঙ্গে দেখা হোল কখন ঞ্জ
--কেন, শেয়ালদার মোড়ে। ফ্লাইওভারের তলায়।
--ডাক্তার দেখা। আচ্ছা চলি, পরে দেখা করব, টাকাটার কথা ভুলিস না।
বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়ে গেলাম। যা গে, টাকাটা দিয়েই দেব, ব্যাংকে চাকরি পাওয়ার জন্যে আমি সব কিছু ক্ষমা কের দিতে পারি। পূর্বার মা অত সকালে আমাকে দেখে অবাক হলেন। বুঝি বা বিরক্তও। বললেন যাও ও ওপরের ঘরেআছে।
:
ওপরে চলে এলাম। পূর্বার বৌদি কিছু সন্দেহ করে রহস্যময় হাসি হেসে বললে ঘরে যাও।
পূর্বা সবে চা খেয়েছে। চুল আঁচড়ায়নি। বেশভূষাও আগোছালো। মেয়েরা না সাজলে এত সাধারণ দেখায়। পূর্বা রাগি রাগি গলায় বললে কি ব্যাপার এত সাত সকালে ঞ্জ
--পূর্বা একটা দারুণ খবর আছে। ব্যাংকের চাকরিটা হয়েছে।
পূর্বা বিশ্বাস করল না, বলল, রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছে ত ঞ্জ
পূর্বা কি বিশ্বাস করছে না। আমি কি এতই অযোগ্য এবং অপদার্থ।
বললাম - আর দেরি নয়। কালই নোটিশ দিচ্ছি।
--কিসের নোটিশ ঞ্জ
কেন রেজেষ্ট্রি ম্যারেজের।
না বাবা, বাবা মায়ের অমতে আমি বিয়ে করতে পারব না।
--কিন্তু কালই যে তুমি বললে,
পূর্বা অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকাল। কাল ঞ্জ কখন ঞ্জ
--আশ্চর্য, মেয়েরা এত অভিনয় জানে।
তুমি বলতে চাও কাল তুমি আমার সঙ্গে সিনেমা দেখো নি ঞ্জ চীনা বাদাম খাওনি ঞ্জ বেড়াও নি ঞ্জ রেস্তোরায় চা খাওনি ক্ক
:
সত্যি সন্তু দা তোমার মাথাটা খারাপ হয়েছে। কাল আমি বাড়ির বারই হইনি। বৌদিকে জিগ্যেস করে দেখ।
আমার শরীরটা কেমন করতে শুরু করল। আমার সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বের হয়ে এলাম প্রায় দৌড়ে। পেছন থেকে পূর্বা ডাকলো, সন্তুদা, শোনো।
:
কিছু বললাম না। আমায় এখন চাই-বইয়ের সেই বন্ধুকে।
পাড়ার চায়ের দোকানে ও আড্ডা দিচ্ছিল। আমি ওর সঙ্গে কথাই বলি না। জানি ও আমার ছোট বোনের সঙ্গে ভাবকরার চেষ্টা করছে। বেকার অপদার্থ ছেলে। ও অবাক হলেও সিগারেট লুকোলো না।
--আচ্ছা তপু কাল তোমার সঙ্গে আমার ট্রামে দেখা হয়েছিল। ঠিক ত ঞ্জ ব্যাপারটা খুবই জরুরি।
তপু অবাক হয়ে বলল না ত।
আমার সারা শরীরে ঘাম ছুটতে লাগল। অত্যন্ত শ্লথ পায়ে বাড়ি ফিরলাম। কালকের বিকেলের ঘটনাগুলো কি তবে সবই ভুল। বাড়ি ফিরতেই মা বলল- বাজার হবে কখন।
ভাইকে ডাকলাম - বললাম চাকরির চিঠিটা দেত ঞ্জ

--চিঠি ক্ক কোন চিঠি আসেনি ত।

:

ঘরে এলাম। টেবিলের উপর পড়ে আছে নিরীহ দর্শন চশমাটা। বুঝলাম, চশমা চোখে বের হইনি। গোল গোল যেন রহসময় :হাসি নিয়ে কৌতুক করে আমাকে দেখছে। ধীরে ধীরে ওর কাছে গেলাম। জানালার তলায় ডাস্টবিন। পাড়ার কুকুরদের আড্ডা। দূর্গন্দ। দক্ষিণের এই জানালাটা তাই কখনও খুলি না। আজ খুললাম। ছোঁ মেরে তুলে নিলাম চশমাকে ছুঁড়ে দিলাম আবর্জনার স্তূপে।

ডানা

নবনীতা বসু

হ ঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বললাম, 'আমি এখানে থাকব না।'
বাবা বলল, 'কেন?'
মা বলল,'কেন?'
দাদা বলল, 'কেন?'
বোন বলল, ' কেন'?
আমি চেঁচালাম, এখানে আমার স্বাধীনতা নেই। আমি চাঁদে চলে যাবে। '
বাবা বলল, 'কক্ষনো না'।
মা বলল, 'কক্ষনো না'।
দাদা বলল,'কক্ষনো না'।
বোন বলল, 'যাস না'।
কিন্তু আমাকে চাঁদে যেতেই হবে। এখানে থাকলে আমি উড়তে পারি না। ডানা লাগালেও আবার পড়ে যাই। আবার উড়তে যাই। পড়েও যাই। চাঁদে গেলে আমি উড়তে পারব।
রাত্রিবেলা । সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত বাবা,মা,দাদা, বোনকে রেখে আমি চাঁদের কাছে চলে গেলাম। চাঁদ আমাকে দেখল। হা সল। বলল 'কেন এসেছ?'
—'উড়তে।'
— 'বেশ। থাকো ক'দিন এখানে। প্র্যাকটিস করো।' আমি প্রতিদিন বার হই। আর ওড়া প্র্যাকটিশ করি। চাঁদে উড়তে পারি। কিন্তু নিজের উপর নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অথচ আমি এরকম চাই না। একদিন এল চাঁদ। হাসতে শুরু করল। রাগে আমার পি ত্তি জুলে যাচ্ছিল। বললাম, 'হাসছ কেন?' বলল চাঁদ, 'তুমি নিজের ইচ্ছেমত উড়তে পারবেই না। বললাম, 'চেষ্টা করি তো।' চাঁদ বলল, 'পারবেই না।'
বাড়ি ছাড়ার পর আজ প্রথম চেঁচালাম। চাঁদ বলল, ' আমার একটা প্রস্তাব আছে।'
— 'কি'?
— 'আমায় বিয়ে কর।'
— 'কক্ষনো না।'
— পাগলী মেয়ে। আমায় বিয়ে করলে তুমি উড়তে পারবে। ইচ্ছেমত।'
আমি সানন্দে চাঁদকে বিয়ে করে ফেললাম। এখন চাঁদ আর আমি রোজ বের হই। চাঁদ কি একটা কায়দায় আমার ডানাদুটো লাগি য়ে দেয়। আমি উড়ি। একদিন উড়তে উড়তে চাঁদের সীমানা ছাড়িয়ে চলে এলাম। ফিরে গিয়ে দেখি চাঁদ গম্ভীর। বলল, 'তোমাকে আর উড়তে দেওয়া যায় না।'
— 'কেন?'

— 'তুমি আমার সীমানার বাইরে চলে যাচ্ছিলে।'
পরদিন থেকে চাঁদ রিমোট কন্ট্রোল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি উড়লে আমার ওড়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। একদিন বাঁদিকে একটা সুন্দর পাহাড় দেখলাম। কাছে গিয়ে দেখতে লোভ হল। হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে গেলাম। আমার ভীষণ কষ্ট হল।
সে দিনই বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে বাবাকে দেখতে পেলাম না। মাকেও না। দাদাকেও না। বোনকেও না। আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছিল। নাড়ীভুঁড়ি জ্বলছিল। আমি ডিমভাজা আর চা করে খেলাম। হঠাৎ দেখি বাবা শাঁ করে এল। একটু বাদে দাদা আর তারপর বোন। আমাকে দেখে ওরা সবাই খুব গম্ভীর হয়ে গেল। দুদিন পরেই স্বাভাবিক হয়ে গেল ওদের ব্যবহার। বাবা বলে, 'রুমু একটু চা করে দিবি মা'। বাবা খুব তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফেরে। মা নাচটা জানে। নাচের প্রোগ্রাম দেখে এসে বলে, জানিস রুমু, আজ ভিক্টোরিয়ায় গেছিলাম। অ্যান্টিক্যুইটিস - এ মীনাক্ষী শেষাদ্রি ভারতনাট্যম কী করল রে। না, নাচটা মেয়েটা ভালোই জানে।' মা নাচটাচ দেখতে যেত না। রাস্তাঘাটে ভীড় বলে। এখন ওদের মুখটুখগুলো কি হাসিখুশি।
এবার নতুন বছরে সরকার নাকি সবাইকে বিশেষ ধরণের ডানা উপহার দিয়েছেন। স্বাধীনভাবে ওড়ার জন্য।
বাবা বলল, 'রুমু কাল তুই নামটা লিখিয়ে নিস।'
— বললাম, 'কিসের?'
— 'বারে। তোরও ডানা লাগবে না।'
বাবার সঙ্গে ডানা অফিস গেলাম। দেখলাম ভীষণ লাইন। বাবার উপর মহলে জানা আছে। লাইন ছাড়াই ভিতরে ঢুকলাম। বাবার নামধাম সব জিজ্ঞাসা করা হল। অফিসার বললেন, 'এতদিন আসোনি কেন?' বললাম। ভ্রূ কুঁচকে অফিসার বললেন, 'তোমাকে ওজন করা হবে'।
দাঁড়ালাম। ওজনস্ট্যান্ডে৷ আটচল্লিশ কেজি ওজন দেখে অফিসার গম্ভীর মুখে বললেন, 'একমাস বাদে আসুন'। অফিসার বাবাকে বোঝাচ্ছিলেন। একমাস বাদে আসতে হবে কেন? রাস্তায় বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম। বাবা বলল, ওড়বার জন্য আরো চারগুণ ওজন কমানো দরকার। ট্যাবলেট খেয়ে ওজন কমাতে হবে।
ফিরে এলাম। ডানা অফিস থেকে ট্যাবলেট খেতে শুরু করলাম। চোখের সামনে দেখতে পাই, বাবা বেড়োচ্ছে, মা বেড়োচ্ছে, বোন বেড়োচ্ছে। বিনা ডানায় কোথাও যেতে ভাল লাগে না। বাস ট্রাম প্রায় উঠেই গেছে। সবাই এখন ডানা মেলে উড়তে চায়।
এক সপ্তাহ বাদে আমার ওজন চল্লিশ কেজি। একদিন বাবা দেরি করে ফিরল।
— বলল, 'কিছু খেতে দে।'
বললাম, 'মা এসে দেবে।'
—'তোর মা জ্যামে আটকে গেছে। আমি এয়ার ফোন -এ জানলাম। এখন আসবে না।
বললাম, 'জ্যাম কিসের?'
জ্যাম হবে না? এত লোক উড়ছে। আমার ডানা তো ভেঙেই যাচ্ছিল। ভীষণ জোর ধাক্কা লেগেছিল।
বাবাকে খেতে দিলাম। ডানাটা দেখি একটু ভেঙে গেছে। ফেভিকল দিয়ে জুড়ে দিলাম।
পরের সপ্তাহে আমার ওজন বত্রিশ কেজি হল। আমার তো ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। দাদা একদিন বলল, 'আমার ডানা ভেঙে গেছে।' বোনও বলল একদিন, 'ডানা ভেঙে পড়ে গেছে। বাবা-মা-দাদা-বোন এখন একটাই আলোচনা করে। ডানাগুলো নড়বড়ে হয়ে যাচেছ। ওড়বার পক্ষে ডানাগুলো মজবুত নয়। ওরা অনেক নীচ দিয়ে ওড়ে।
বাবা তিন সপ্তাহ বাদে আমায় বলল, 'রুমু একটু ডানা অফিসে যাবি।'
— 'কেন? এখনো তো একমাস হয়নি।'
— 'আমাদের ডানার অবস্থা তো খুব ভালো নয়। চারজনের নামটা লিখিয়ে আসবি।'
— 'কেন?'
— 'বা রে, নাহলে ডানা পাব না।'
অফিসার আমায় দেখে খুশি খুশি মুখ করে তাকাল। তারপর বলল, 'তোমার তো বেশ উন্নতি হয়েছে।' আমি বাবা-মা-দাদা-বোন-এর নাম লিখিয়ে চলে এলাম।
আমার ওজন এখন চবিব্বশ কেজি। বাবা-মা-দাদা-বোন কেউ এখনো ফেরেনি। অনেকদিন বাদে টিভির স্যুইচটা অন্ করে দিলাম। দেখলাম, সুবেশা একটা মেয়ে খবর পড়ছে।
----সরকার থেকে যে ডানা দেওয়া হয়েছিল তা যথেষ্ট মজবুত নয়। গন্ডগোলের সূত্রপাত এখানেই। ঝঞ্ঝাট এড়াতে সরকার, নতুন বাজেটে ডানার জন্য কুড়িকোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পবন মেহেতা আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর কোম্পানী উৎকৃষ্ট ডানা তৈরী করতে পারবে। তবে তিনি বলেছেন, রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী সরকারের সঙ্গে আজ একটা বৈঠকে তাঁর -------

আমি টিভির স্যুইচ বন্ধ করে দিলাম। কেউ এখনো ফিরছে না। চিন্তা দূর করতে টিভি খুললাম টিভিতে ঘোষণা করা হচ্ছে— 'অকারণ উড়বেন না, অযথা ডানার অপব্যবহার করবেন না। আপনার ওড়বার সুখের জন্য অন্যকে সুখ থেকে বঞ্চিত করবেন না।' বাবা ফিরে এল। একে একে মা, দাদা, বোনও। টিভিতে ঘোষিকা বলেই যাচ্ছিল, আপনার সুখ যেন অন্যের অ-সুখের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। ' আমার খুব বিরক্ত লাগছিল। ধাঁ করে টিভির স্যুইচ বন্ধ করে দিলাম।

বাবা বলল, 'রুমু, সামনের সপ্তাহে তোর বন্ধুদের নেমন্তন্ন করবি না?'

— 'কেন?'

'বাঃ, তুই সামনের সপ্তাহে উড়বি না।'

আজ একমাস পূর্ণ হয়েছে। বাড়ির সবাই ডানা পাবে। বাবার সঙ্গেই ডানা অফিসে গেলাম। অফিসার বাবাকে দেখে হাসলেন। বাবা যেন বিগলিত হয়ে গেল। অফিসার বললেন, 'আপনাদের চারজনের ডানা তৈরী। আমাকে দেখে অফিসারের ভ্রূ কুঁচকে গেল। বিস্মিত চোখে বললেন, একি! তোমার ওজন তো বেড়ে গেছে। ওজনে আমি বত্রিশ কেজি হলাম। আমাকে আবার নতুন ট্যাবলেটের শিশি দেওয়া হল । নতুন ডানা পেয়ে বাবা খুশি। মাও নিশ্চয় হবে। দাদাও। বোনও নিশ্চয় উল্লসিত হবে। বাবা বলল, 'রুমু তুই আয়, আমি যাচ্ছি। বাবা ডানা লাগিয়ে উড়ে চলে গেল।

আমি গত সপ্তাহের মত এবারও শিশিটা ফেলে দিলাম।

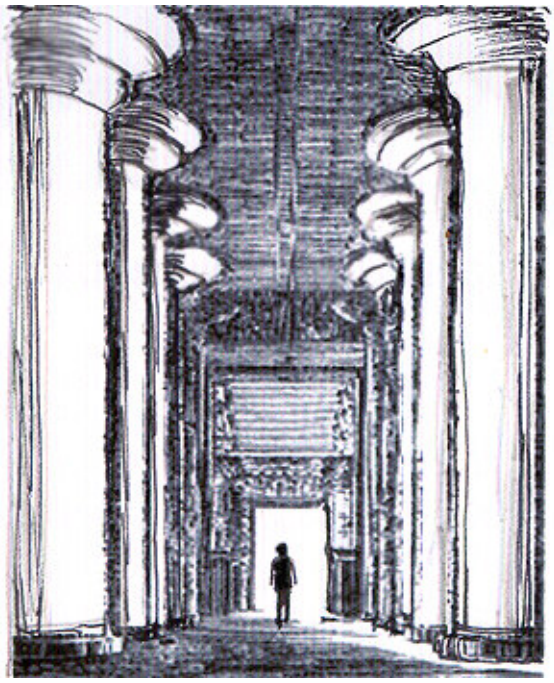

তিনি হারিয়ে গেলেন

সজল দাশগুপ্ত

কৃষ্ণকান্ত নিখোঁজ। আজ শনিবার। গতকাল সকাল ন'টা থেকে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভাব্য সব জায়গাতে বাড়ির লোকজন খোঁজখবর করেছেন। কোথাও তিনি যাননি। পত্রিকা অফিসগুলোতেও খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণকান্ত বেরিয়েছিলেন যখন তখন হাতে লেখা ছিল, বলে গিয়েছিলেন লেখাটা কাগজের অফিসে জমা দেবেন। কিন্তু কাগজের অফিসগুলো থেকে তেমন কোন হদিশ পাওয়া গেল না। কৃষ্ণকান্তের এই আচমকা নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা লেখকমহলে একটা তোলপাড় তুলে দিল। দেওয়ারই কথা। কারণ কৃষ্ণকান্ত প্রতিষ্ঠিত গল্পকার। শুধু গল্পকার কেন, প্রাবন্ধিক, আলোচক, ঔপন্যাসিকও। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা তেত্রিশ। একটা যন্ত্রস্থ। আর গল্প? তার সংখ্যা যে কত তার সঠিক হিসেব তাঁর নিজের কাছেও নেই। খবরের কাগজগুলোর রোববারের পাতা মানেই কৃষ্ণকান্ত। পালা করে করে ছাপানো। এ সপ্তাহে এ কাগজ ত পরের সপ্তাহে অন্যটা। আর পুজো এল মানে দিনরাত লেখালিখি। বড়,মাঝারি, ছোট - সব কাগজে আছেন তিনি। কোথাও নতুন গল্প, কোথাও পুরনো গল্প টুকে একটু এপাশ ও পাশ করে নতুন করে দেওয়া -- আবার কোথাও পুনর্মুদ্রণ।

ইদানিং অবশ্য একটু যেন ভাঁটার টান এসে গিয়েছিল লেখায়। বড় কাগজগুলোতে তেমন করে আর তাঁর লেখা দেখা যাচ্ছিল না। তা বড় কাগজগুলোর ব্যাপারস্যাপারগুলোই ত তেমন। আজ একে তুলছে ত কাল ওকে আছড়ে ফেলছে। এমন ফেলবে যে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না। তাতে অবশ্য কৃষ্ণকান্তের জনপ্রিয়তা ভাঁটা পড়েনি। পড়েনি যে সেটা কফিহাউসে এলেই বোঝা যায়। কফি - হাউসে এসে যে টেবিলে তিনি বসবেন মুহূর্তের মধ্যে তার চারদিকে থিক্ থিকে্ ভিড় জমে যাবে গল্পকারদের উঠতি, পড়তি, ঝটতি, দম ফুরিয়ে আসা বাতিল লেখক--- কে নেইসেই টেবিলে? সববাইকে নিয়েই জম্পেস আড্ডা তাঁর। স্বভাবে এতটুকু উন্নাসিকতা নেই। মানুষটা সজ্জন। কোন লিট্ল ম্যাগাজিন সদ্য বেরোল --- তার প্রথম কপিটাই কৃষ্ণকান্তের টেবিলে এসে যাবে। মানুষটা প্রধানতঃ গল্পকার। কবিতার তেমন অনুরাগী নন। তাতে কি হল? কবিতার বই কারও বেরোল ত কবি হাজির কফিহাউসে। কোথায় কৃষ্ণকান্ত? কোন্ টেবিলে? খুঁজে পেতে কবিতার বইটা এসে যাবে কৃষ্ণকান্তের টেবিলে। কবিরও সহাস্য প্রসন্ন মুখ -- 'পড়ে দেখবেন যে। একটা মতামত পেলে' --- কৃষ্ণকান্তের মুখে 'না'। হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ব--- পড়ব। অবশ্যই পড়ব।' তা, এমন মানুষ হারিয়ে গেলে তোলপাড় একটা ত হবেই।

শনিবার সন্ধ্যায় কফি - হাউসে এক প্রবল ভিড় এমনিতেই থাকে। আজ ভিড়টা যেন সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দিল। আর এই ঠাসা গিজগিজে ভিড়ের সব মুখেই একটাই প্রশ্ন---'কোন খবর আছে?' কার কাছে কি খবর থাকবে? নেই। কোন খবর নেই। মানুষটা তাহলে গেলেন কোথায়? এরকমভাবে নিপাত্তা হয়ে যাওয়ার মত বোহেমিয়ানমানুষ ত নন তিনি। ধীর স্থির শান্ত। বরং সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় মানুষটা বরং একটু ঘরকুনোই। সব টেবিলে উৎকণ্ঠা। কোন টেবিলে কাফকা, কাম্যু, মার্কেজ নেই। সি, পি, এম, কংগ্রেস, বিজেপি নেই। গুরুগম্ভীর বিষয়নেই, হাল্কা চটুল আলোচনাও নেই। যা আছে তা ঐ একটা, মানুষটা কোথায় গেলেন? কোথায় যেতে পারেন? গল্পকারদের কেউ কিডন্যাপ করে না। করে কোন লাভ নেই। একটা পয়সা মুক্তিপণ আদায় হবে না। আথিক মুরোদ নেইকারও। কোন দুর্ঘটনায় পড়েন নি কৃষ্ণকান্ত। ট্রাফিক পুলিশের খাতায় সেরকম কিছু নেই। বরং শুক্রবার কলকাতায়ে

কান যানজট ছিল না কোথাও। এটা অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনা। যানজট কেন ছিল না কে জানে! কিন্তু ছিল না। কিড্‌ন্যাপিং হয়নি, দু র্ঘটনায় পড়েননি---তাহলে কি হেঁটে হেঁটে মানুষটা কর্পূরের মত উবে গেলেন? কোন স্বেচ্ছানির্বাসনে গেলেন? ইদানিং অবশ্য এক টু ম্রিয়মাণ লাগছিল। কেমন যেন একটু উদাসীন মনে হত সবসময়। ঘনিষ্ঠ যারা তারনজর করেছে। তারাই বলছে। অবশ্য যেহেতু ম ানুষটা নিখোঁজ অতএব গল্প উঠে আসবে নানারকম । ইদানিং সিগারেটও খাচ্ছিলেন না। কেন খাচ্ছিলেন না, কে জানে। পকেট থে কে প্যাকেট খুলে একটা দিলাম, বললেন, ভাললাগছে না খেতে। 'একটু বিবর্ণ দেখাচ্ছিল না? এমন টকটকে দুধে-আলতা রংটা যে ন কালচে হয়ে যাচ্ছিল। তার মানে আভ্যন্তরীন দহনযন্ত্রণা।' এমনি ত রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত আমার সাথে আড্ডা মারে রোজ---, ে সদিন হল কি---অফুরন্ত গল্প সব মুখে মুখে আর তার সঙ্গে কার্যকারণ খোঁজার কি প্রবল চেষ্টা!

'কোন মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন?'

'কিসের অবসাদ? তবে সকালে নাকি স্নান করে খুব একচোট মেডিটেশান করতেন।'

'কি হয় মেডিটেশানে!'

'মনে জোর বাড়ে!'

'তার মানে জোর কমে যাচ্ছিল?'

'তা জানি না।'

'লেখাটা কেমন একটু কমে যাচ্ছিল, মনে হয়।'

'হাতি মরলেও লাখ টাকা। কমলেও যা লিখছিলেন তা প্রচুর। আমাদের ফোর টাইমস্‌। একটা টেবিলে এতসব আলোচনার মধ্যে একজন গলা চড়াল---'কিরে, কিছু খবর পেলি?'

যাকে জিজ্ঞেস করা সে এক লিটল ম্যাগাজিনের ব্যস্ত সম্পাদক। খুব অনুরাগী কৃষ্ণকান্ত-র। সদ্য ঢুকল সে। চেয়ার - টেবিলের পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে সে এগোচ্ছিল।

:

'না। বিকেলে বাড়িতে ফোন করেছিলাম। কেউ কিছু বলতে পারল না।'

'ধ্যেৎ বিকেলে! সে ত বাসি খবর। আমি ত আসার পথে সন্ধ্যায় বাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা বলে এলাম।'

'কিছু পেলেন?'

'কই পেলাম! নতুন কিছু কথা না। সেই এক কথা।'

'কি কথা?'

'জানিস ত।'

'তবুও শুনি আর একবার।'

'ঐ ত সেই কোন্‌ কাগজে লেখা দেবে বলে বেরিয়েছিল।'

'কি লোক?'

'কি লেখা মানে?'

'মানে গল্প না উপন্যাস?'

'গল্পই হবে।'

'হবে! মানে জানেন না? আন্দাজে মারছেন?'

'এ ত মহাজ্বালা! লেখা আমাকে দেখিয়ে নিয়ে বেরিয়েছিল? রোববারের পাতার জন্য গল্প ছাড়া আর কি হবে?'

'ফিচার হতে পারে।'

'ফিচার কৃষ্ণকান্ত লিখত? পাগলের মত কথাবার্তা সব!' এবার দু তিনটে গলা প্রতিবাদ করে ওঠে।

'ফিচার লিখত না? কে বলল? হাওড়ার একটা কাগজে গত শ্রাবণ সংখ্যায় লিখেছিল। ফাস্টফুড কালচারের ওপর লেখাটা। এই ফ াস্টফুড কালচার বাঙালীর আতিথেয়তার ভোলটাই কেমন পাল্টে দিয়েছে। দারুণ হয়েছিল লেখাটা কিন্তু।'

বক্তা খুব অপ্রতিভ হয়ে যায়। এসব খবর তার জানা নেই।

:

পাশের আর একটা টেবিলে জনা ছয়েক। তার মধ্যে একজন উঠে দাঁড়াল। একেবারে তরুণ কবি। সদ্য সদ্য কফি - হাউসে আসছে, সদ্য সদ্য দু একটা কাগজে লিখতে শুরু করেছে। হেঁটে এসে দাঁড়াল মাঝখানের টেবিলের পাশে।

'----শৌভিকদা প্রলয়কে ফোন করে একটা খবর, মানে ওখানে গিয়েছিলেন কিনা আদৌ---'

'কে প্রলয়?'

'বাঃ! প্রলয়ের আবার পরিচয় দিতে হবে! যে কাগজের অফিসে কৃষ্ণকান্ত যাচ্ছিলেন তার রোববারের পাতা ত প্রলয় দেখে।'

শৌভিকের চোখদুটো ধারালো হয়ে ওঠে।

‘প্রলয় চাটুজ্জের বয়স কত জানি। ষাট ছুঁই ছুই। প্রলয়বাবু বল। এমন একজন প্রবীন মানুষকে যেমন নাম ধরে ‘প্রলয়’ ‘প্রলয়’ করি ছস মনে হচ্ছে তোর ইয়ার দোস্ত। প্রলয় চাটুজ্জের প্রথম লেখা যখন বেরোল তখন তুই জন্মাসনি।’
একটা মোক্ষম ধাক্কা খেয়ে ছেলেটা প্রথমে নিভে গেল। তারপর বোধহয় পাল্টা কিছু যুক্তি দেখাতে রুখে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই শৌভিক হাঁকিয়ে দিল।
‘ঐ তোর চেয়ারটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যা- যা, শিগগির যা।’ ছেলেটি এরপর আর দাঁড়াল না। ও চলে যেতেই চাপা হাসি।
‘কোন কাগজের রোববারের পাতাটা কে দেখে সব মুখস্থ এর মধ্যে!’
‘ওর জুতোর শুকতলাটা দেখে আয়।’
‘গেছে সেটা। আর নেই।’
:
‘কিথ্ চেষ্টারটনের ‘রিং অব লাভারস্’ পড়েছেন?’
যাকে এই প্রশ্ন যে একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেল। পড়েনি। আর এই এক রোগ ওর। পড়া ধরা। যতক্ষণ থাকবে পড়া ধরে যাবে একে একে। আর এমন সব পড়া ধরার প্রবণতা যাতে সহজেই কাবু করা যায়।
‘তোমায় ভাই এক ঘোড়া রোগ।’
‘কি?’
‘সারাজীবন বিদেশী গল্প, বিদেশী সিনেমা---এইসব করে গেলে। তোমার বৌটা যদি বিদেশিনী হত মানিয়ে যেত। একটু দেশের মাঠ ঘাট, ফুল -ফসল, গাঠপালা - এ সবের দিকে একটু তাকাও।’
‘দেশী, সব ভুষিমাল।’
‘তা-ও ত দেখতে হয়। কিসের ভুষি তা-ও ত জানতে হয়। জানা দরকার। তুমি ত তা -ও জান না। বিদেশী গরুগুলো কি খাসির মাংস খায? ফ্রান্সের গাইগুলো নাকি দুধ দেয় না? একেবারে সরাসরি মাখন বেরোয় বাঁটের থেকে?’
‘এই থাম ত। দুজনেই থাম। একজন মানুষ কাল থেকে নিপাত্তা। আমার ত মাথার মধ্যে ঘুরে ফিরে শুধু আশঙ্কা জাগছে। কত কিছু হতে পারে। কত অঘটন ঘটে যেতে পারে!’
একেবারে দেয়ালঘেঁষো আর একটা টেবিলে একটু উল্টোদিকের বাতাস বইছে। ওখানেও জনা ছয়েক। ওখানে মৌসুমি বাতাস বইছে উত্তর দক্ষিণে।
‘ঐ টেবিলে ত্রিদিবেশ সরকারকে দেখ----’
বাকী পাঁচজনই মুখ ঘুরিয়ে দেখল
‘কি দেখছিস?’
‘ভাষণ দিয়েই যাচ্ছে, দিয়েই যাচ্ছে। কি বলছে শোন একটু চুপচাপ। ছ’জনই নির্বাক। পুরো কান খাড়া করে ত্রিদিবেশের কথাগুলো গিলে খাচ্ছে।
‘কি বলছে?’
‘কি আবার বলবে? ঐ এক ঘ্যানঘ্যানানো কথা। বলছে ইদানিং নাকি কৃষ্ণকান্ত খুব ম্রিয়মাণ হয়ে থাকত।’
‘তাতে ত্রিদিবেশের কি?’
‘তা বললে হবে? আমি যে তোমার দুঃখে দুঃখী, তোমার গর্বে গরবিনী, রূপসী তোমারই রূপে---’
‘ম্রিয়মাণ হবে না ত কি হবে? ওসব আর চলে? একদিন ভোরে তুই ঘুম থেকে উঠে দেখলি তোর হাইট তিনফুটের মত কমে গেছে। তুই তোর ছেলের মত হয়ে গেছিস। ছেলের মত হয়ে যেতে তোর ছেলে এসে তোর সঙ্গেখেলতে শুরু করল। তুই-ও সারাদিন তোর ছেলের সঙ্গে খেলে গেলি। বিকেলে তোর ছেলেকে যেমন তোর বউ হাতপা ধুইয়ে, পরিষ্কার জামা প্যান্ট পরিয়ে পার্কে পাঠিয়ে দিল তোকেও তাই করল। তুই-ও পার্কে গেলি ছেলের সঙ্গে গলাগলি করে পার্রে ঘুরে বেড়ালি----’
‘সে না হয় বেড়ালাম। কিন্তু রাতে শোব কার কাছে?’
‘এই এক কথা তোদের। রিয়েলিটিতে ফিরতেই হবে। তোরা সব বুনো ঘোড়া। শালা, জঙ্গলে না গেলে তোদের হবেই না। এসব গল্প রাত আসেনা, আসবে না।’
‘মানে ----- দিবারাত্রির কাব্য নয়, শুধু দিবার কাব্য?’
চাপা একটা হাসির রোল ওঠে।
‘বেশ লাগছিল কিন্তু শুনতে। এরকম আর কিছু আছে?
‘এগুলো আমার স্বরচিত নয়, ক্যাবলু। অন্যের লেখা পড়ে বলছি।’
‘আর পড়া নেই?’
‘আছে আছে। আর এক কাপ করে ব্ল্যাক অর্ডার দে, তবে শোনাব।’

গল্প শোনার তাগাদায় আর এক রাউন্ডের অর্ডার হল।
'একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে তুই দেখলি--- কি দেখিল?'
'---কি দেখলাম?'
'---যেখানে তোর বাড়িটা থাকার কথা সেখানে আর নেই।'
'কোথায় আছে সেটা?'
'তুই জানিস না। খুঁজেই যাচ্ছিস, খুঁজেই যাচ্ছিস। অথচ যে ক্লাবটার উল্টোদিকে তোর বাড়ি সেটা বহাল তবিয়তে আছে। তোর বাড়িটা শুধু নেই। তুই ওপাড়ার আজন্ম বাসিন্দা অথচ আজ তোকে কেউ চিনতে পারছে না। তুই তোর এক বন্ধুকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে 'সোমনাথ সোমনাথ' বলে চেঁচিয়ে ডাকলি। সে লোক চলে গেল। তার মানে তুই যাকে এযাবৎ সোমনাথ বলে জানতিস, সে আসলে সোমনাথই নয়---'
'তা হলে কে?'
'এখানেই কনফিউশান।'
'তা মন্দ কী! এ গল্প ত ভাল গল্প।'
'তুই আমি বললে ত হবে না।'
'বড় কাগজ বলেছে না?'
'অতএব ম্রিয়মাণ না হয়ে যাই কোথায়?'
দ্বিতীয় রাউন্ডের কফি শেষ।
দোয়ালঘড়ির কাঁটা একজায়গায় এসে দাঁড়ালে ওরা ওঠে। উত্তর থেকে বয়ে আসা মৌসুমী বাতাসের প্রবাহবন্ধ হল। আস্তে আস্তে আড়মোড়া ভাঙছে যে যার জায়গায় বসে। উঠে পড়ছে সব। ফাঁকা হতে থাকে। সিঁড়িতে এখন একমুখী জনতা। নেমে আসছে ধীর পায়ে। ত্রিদিবেশ বলল---'ফেরার পথে ঘুরে যাই একবার কৃষ্ণকান্তের বাড়ি। পথেই ত পড়ে। হয়ত গিয়ে দেখব মজা মেরে বসে চা খাচ্ছে। এমন ঝাড় দেব না!'
'আর যদি গিয়ে দেখিস যেমন তেমন। কোন খবর নেই, তখন?'
'আরে না না। ফিরে এসেছে। এসেছেই । এগুলো সব পরিকল্পনামাফিক। স্রেফ মজা করা। একটা হৈ চৈ তোলা। একটা দুটো দিন একটু অন্যরকম করে কাটানো।'
ত্রিবিদেশ আর দাঁড়াল না। হন হন করে হেঁটে গেল।
।। দুই ।।
না, কলকাতা পুলিশের এলেম আছে। স্বীকার করতেই হবে ইচ্ছে করলে ওরা সব পারে। চোর ধরতে পারে, ছিনতাইবাজদের সাহায্য করতে পারে,তোলাবাজদের নির্মূল করতে পারে, কবর থেকে মৃতদেহ তুলে এনে পরীক্ষা করে খুনীর পেছনে ধাওয়া করতে পারে। সবই ইচ্ছে করলে পারে। যেমন শনিবার রাতে পেরেছে। পারার কথা নয়। বাতিল কাগজের পাহাড়ের নিচে একজন মানুষ চাপা পড়ে শুয়ে আছে দু'রাত্তির। এই দু'দিনে কুইন্টাইল কুইন্টাল বাতিল কাগজ তার উপরে জমেছে। মনে হচ্ছিল বাতিল কাগজের মত মানুষটাও বাতিল হয়ে গেছে। খবরের কাগজের অফিসে এত কাগজ বাতিল হয় রোজ। হয় বোধহয়। ছাপানো বাতিল না - ছাপানো বাতিল, তের হাজার গল্পের পাণ্ডুলিপি, চৌদ্দ হাজার কবিতার পাণ্ডুলিপি--- হতেই পারে। এতসব বাতিল কাগজ পরে অকশনে তুলবে। এর মধ্যে কলকাতা পুলিশ এল কি করে? গাড়ি নিয়ে রাতচরা ছিনতাইবাজদের পিছনে তাড়া করতে গেলে গাড়ির হেডলাইট কান্‌কি মেরে বাতিল কাগজের স্তূপে পড়ে হড়কে গেল। শিকারী চোখ তার মধ্যেই দেখে ফেলল। পায়ের আঙুল বেরিয়ে যে! 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটা মার্ডার। মনে হচ্ছে একটা লাশ--- আরে, আরে, এ যে জ্যান্ত! ছিনতাইবাজদের কেউ? দৌড়তে দৌড়তে ঢুকে পড়েছে কাগজের স্তূপের নিচে? ভাগ্যিস পায়ের আঙুল ঢাকতে পারেনি। বলিহারি বুদ্ধি! একটুর জন্য ফেঁসে গেলে। এই---, উঠে বস বাপধন, এখানে না। শ্রীঘরে চল। এই গদাই, আমরা কোনদিন রাতে চেজিংয়ের সময় ডাষ্টবিন দেখতাম না। এখন থেকে রোজ ডাস্টবিন দেখতে হবে। কর্পোরেশনে রিকুইজিশান পাঠিয়ে নাইট পেট্রোলিংয়ের জন্য দুটো ধাঙর নিতে হবে সঙ্গে। ফর্ দ্য ইনটারেস্ট অব্ পালবিক সার্ভিস' ---ওরা ময়লা ঘাটবে। হেঃ হেঃ বাবা, পুলিশের চোখ! বিশেষ করে ক্যালকাটা পুলিশ ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিংয়ে দু'নম্বরে কি এমনি এমনি থাকে?' কাগজের স্তূপের মধ্যে থেকে শুয়ে থাকা মানুষটাকে টেনে তুলে ও-সি ভুঁড়ি নাচিয়ে বেসুরো গলায় গান ধরে---'পালাবার পথ নাইরে, ও তোর যম আছে পিছে'।
।। সংবাদ ।।
কাগজে খবরটা বেরোল। তবে কেমন আধখ্যাঁচড়া। ---'গতকাল রাতে টহলদার পুলিশ একটি বহুল - প্রচারিত সংবাদপত্রের বাতিল কাগজের স্তূপ থেকে একজন মানুষকে উদ্ধার করে। প্রকাশ থাকে যে ঐ ব্যক্তি আর কেউ নন, প্রখ্যাত গল্পকার শ্রীকৃষ্ণকান্ত মজুমদার। কিন্তু তিনি ঐ বাতিল কাগজের স্তূপে ঢুকলেন কি করে তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তদন্ত চলছে।'

বাস্তুসাপ

হেদায়েতুল্লাহ

সন্ধের মুখে কলিং বেলটা বাজার সঙ্গে লো ভোল্টেজ হয়ে গেল। আজ অফিস ছুটি। সুদিন বাড়িতে ছিল।দরজা খুলতে একটা রোগা লিকলিকে লোক হিস্‌হিস্‌ করে বলে ---- এটা কী সুদিনবাবুর ফ্ল্যাট ?

---হ্যাঁ কী চাই?

---আপনি কী সুদিনবাবু ?

---হ্যাঁ! কী চাই বলুন? সুদিন একটু বিরক্ত হয়। ভ্যাপসা গরমে, লো ভোল্টেজ, গায়ে কে যেন হালকা করে লংকাবাটা মাখিয়ে দিচেছ।

---আপনি বাড়ি ভাড়ার জন্যে কাগজে যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন --- তার জন্যে এসেছি।

---দালাল কিন্তু অ্যালাউড না।

---না না। আমার নিজের জন্যে।

---আসুন। ভেতরে আসুন। সুদিন ইশারা করে। লোকটা সর - সর করে ঘরে ঢোকে।

---আপনার নাম ?

---অহিভূষণ নাগ। দমদমের দিকেই থাকি। আপনার বাড়িটা নিরিবিলি।

বিজ্ঞাপনে সেইকথাই বলেছেন। আসলে নিরিবিলি আমার খুব পছন্দ। আমি হই চই একদম সহ্য করতে পারি নে।

---তা ঠিক। আজকাল যা শব্দদূষণ তাতে নিজের কথা নিজেই শুনতে পাই নে। সুদিন তার কথায় সায় দেয়।

দমদমের মলরোডের ওপর সুদিনের পৈত্রিক বাড়ি। বেশ পুরোনো। ঠাকুরদার আমলে ভিতগাড়া। নোনা ধরা। বিয়ের পর তার স্ত্রী রিমি ওই বাড়িতে থাকতে চায়নি। বিয়ের পর সবাই নতুন সব কিছু চায়। রিমিও তাই। এইপুরোনো ভূতুড়ে বাড়িতে নাকি তার দম বন্ধ হয়ে আসে। তাই বিয়ের ক-মাস বাদেই তারা সল্টলেকে এক সরকারি আবাসনে উঠে আসে। তারা বাবা বিভূতিবাবু যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন সমস্যা হয়নি। তিনি মারা যাওয়ার পর বাড়িটা তালা বন্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে ও অসুবিধে ছিল না। কিন্তু ইদানীং সে বাড়িটা নিয়ে বিব্রত। তার বাড়ির পাশে প্রণববাবু থাকেন। রিটায়ার্ড প্রফেসার। তিনি প্রায় দিন পনের আগে ফোন করেছিলেন।

---সুদিন! তোমার বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করো। নইলে সে অ্যান্টিসোশালের ডেন হয়ে গেল।

বাড়িটা বিক্রি করার জন্যে রিমি তাকে বেশ কয়েকবার তাগাদা দিয়েছে। ওই ভূতুড়ে বাড়ি রেখে কী হবে?কিন্তু সুদিন বারবার এড়িয়ে গেছে। রিমির সঙ্গে সে মুখোমুখি তর্কে যায়নি। কিন্তু তার মনের গোপন কোণে একটা নরম জায়গা রয়ে গেছে বাড়িটার জন্যে। হাজার হোক সেখানে তার এবং তার বাপ ঠাকুরদার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাছাড়া মানুষকে তো একসময় শিকড়ে ফিরতে হয়। এরকম একটা অলীক আশা তার ভেতর দানা বেঁধে আছে। সেই জায়গাটা সে যেন রিমির কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু ইদানীং পরিস্থিতি পালটাচ্ছে। ফাঁকা বাড়িদেখলে ক্রিমিন্যালরা ঠেক নিচ্ছে ? নয়তো প্রোমোটাররা থাবা বাড়াচ্ছে। ফাঁকা বাড় যে তোমার সম্পত্তি, তা তারা মানতে চাইছে না।

---ভাড়া তো দোব। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।
কী শর্ত ?
বাড়ির কোন জিনিস সারানো যাবে না। সবকিছু যে যেখানে আছে, সেইরকমই রাখতে হবে। সুদিন মনের কোণে সাজিয়ে রাখা পুরানো স্মৃতি কিছুতেই স্থানচ্যুত করতে চায় না।
---এ শর্তে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আগে প্রায় দশজন এসেছে। কিন্তু এই শর্তের কথা শুনে চলে গেছে। তারা বাস করবে নিজের মতো। সেখানে এই শর্তে বাস করা অসম্ভব। এদিক - ওদিক তো একটু করতে হবে।
সুদিন একটা সিগারেট ধরায়। এখন দিনকাল খারাপ। মুখের কথার কোনো দাম নেই। বিশ্বাস কথাটা এখন ছিবড়ে হয়ে গেছে।
---আপনার সঙ্গে তাহলে এগ্রিমেন্ট করতে হবে --- কী বলেন অহিভূষণবাবু ? পারেন। আমার কাছে মুখের কথাই সব। আমি কথা দিলে তা রাখি।
--- সে তো মুখে সবাই বলে। পরে ঝুলির মধ্যে থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ে।
---দেখুন, আমার কাছে মুখের কথাই সবচেয়ে বড়ো। কাগজের চুক্তির কোনো দাম নেই। যে লোক মুখের কথার দাম দেয় না, সে লোক কাগজের লেখাকে কোনো দাম দেবে না। কী বলুন --- ঠিক কি না?
---তা ঠিক ! ঘাড় নাড়ে সুদিন। আসলে সে বুঝতে পারছে না লোকটার কথায় সে মোহগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে কি না ? এক - একটি লোক থাকে, যাদের কথায় মায়ার জাল জড়ানো থাকে। এই লোকটা কী তাই ? সুদিনের গাটা শিরশির করে। লোকটার চাহনি যেন কেমন। পলকহীন তাকানো। মুখে কেমন চাকা চাকা দাগ।
---আপনার ফ্যামিলিতে কজন আছে --- অহিভূষণবাবু ?
আমি আর আমার মিসেস। একদম ঝাড়া হাত - পা।
---ছেলেমেয়ে ?
সাবালক হলে তারা যে-যার জায়গায়। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।
---ঠিক আছে। আপনি তাহলে পরশু দিন আসুন। টাকা - পয়সা নিয়ে আসবেন।
আমি কাগজপত্তর রেডি করে রাখবো। দরজার দিকে তাকায় সুদিন।
---ঠিক আছে। নমস্কার। লোকটা দরজা ধরেই চলে যায়।
লোকটা চলে যাওয়ার পর রিমি তাকে ধরে।
---যে লোকটা নিজের ছেলে - মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে রাখে না, তাকে তুমি বাড়ি ভাড়া দিচ্ছ? শেষ-মেষ সবকিছু বেহাত হয়ে যাবে। তুমি কিন্তু বিপাকে পড়ে যাবে?
একটা গুরতর সমস্যার সমাধন হয়ে যাওয়ায় সুদিনের মনটা বোধ হয় হালকা হয়ে যায়। তাই সে হাসির ছলেই বলে ---বাড়ি বেহাত হয় হোক, তুমি না হলে বাঁচি!
---তুমি কী যে বলো? এই বয়সেও কী এসব রসিকতা ভালো লাগে? রিমি রাগ করে উঠে যায়।
রিমির রাগ করে চলে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে সুদিন যেন মজা পায়। ভালোও লাগে তার। আসলে রিমি তার এই সংসারের মধ্যে নিজের সত্ত্বাকে একেবারে বিলীন করে দিয়েছে। তার যাকিছু চিন্তাভাবনা সব এই সংসারের জন্য। এই সংসার, সুদিন আর তাদের একমাত্তর ছেলে সন্দীপন --- যেন তার মনের সমস্ত বাস্তুজমিটা ভরে আছে। সেখানে আর কিছুর স্থান নেই। অন্য কারোর ঠাঁই নেই।
দুদিন পরে বেশ রাত করেই এলো অহিভূষণ। এদিন আবার লোডশেডিং চলছে। সেদিন সুদিন অতটা বুঝতে পারেনি। আজকে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারে, অহিভূষণের গা থেকে কেয়াফুলের বিরল গন্ধ বেরোচ্ছে। সুদিন তার কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না।
---আপনি কী কেয়াফুলের সেন্ট মেখে এসেছেন --- অহিভূষণবাবু ?
আজ্ঞে না। আমি যেখানে থাকি, সেখানে একটা কেয়াফুলের গাছ আছে। সেটা আমার বড়ো পছন্দের।
অহিভূষণ প্রয়োজন মতো টাকা - পয়সা বের করলো। তারপর সইসাবুদ করে ঘরের চাবি নিল। লোকটা উঠতে যাচ্ছিল, সুদিন তাকে বলে --- একটু চা খান?
চা? ঠিক আছে।
চার্জ লাইটের তেজ কমে আসছে। তার মৃদু আলোয় অহিভূষণের চা খাওয়া দেখে সে অবাক হয়। লোকটার জিভ চেরা। একদম আগা পর্যন্ত। সে জিভ বের করে চেটে চেটে খাচ্ছে। সুদিন তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে, সে কৈফিয়ত দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে--- জন্ম থেকে আমার জিভটার ডিফেক্ট। এভাবে আমাকে খেতে হয়।
---আহা ! কত কষ্ট আপনার। আপনি তো প্লাসিক সার্জারি করে নিতে পারেন? আজকাল তো কতরকম সার্জারি উঠেছে।
--- তা ঠিক। কিন্তু ছোটবেলা থেকে একরকম অভ্যেস করেছি। এখন প্লাস্টিক সার্জারি করলে নতুন অভ্যেস গড়তে হবে। এ বয়সে সেটা গড়তে না পারলে ফ্যাসাদে পড়ে যাবো। তখন হয়তো খেতেই পারবো না।

সুদিন কোনো কথা না বলে ঘাড় নাড়ে। লোকটা চলে গেল সেদিনের মতোই। রিমি তার পাশে এসে দাঁড়ায়। ততক্ষণে কারেন্ট ফিরে এসেছে। সুদিন টাকা গুণতে গুণতে বলে --- তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন?

---লোকটার গলায় স্বর যেন কেমন?

---গলার স্বর শুনে কী লোক চেনা যায়?

---না। তা না। কিন্তু বাড়িটা যদি বেহাত হয়? তার চেয়ে বাড়িটা বিক্রি করে রাজারহাট নিউটাউনে জমি কিনলে ভালো হতো না?

সুদিন এবার চুপ করে যায়। সে প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চায়। তাই সে হাসি - হাসি মুখে রিমির দিকে তাকিয়ে বলে --- দেখ! এই টাকা দিয়ে আমি একটা দেনা শোধ করবো?

---কী দেনা?

এই ফ্ল্যাটে আসার সময় তোমার বিয়ের সব গয়নাগুলো বিক্রি করেছিলাম। এই টাকা দিয়ে সেই গয়না সব কিনবো।

---এটা কী তোমার দেনা হলো? আহত গলায় বলে রিমি।

কেন?

---আমি কী তোমার পর নাকি ? তাছাড়া আমি গয়না তো পরিই না। তুমি বরং টাকাগুলো রেখে দাও। সন্দীপনের কাজে লাগবে। আজকাল তো পড়াশোনা করতে গেলে অনেক টাকা লাগে শুনছি।

রিমির দিকে আরেকবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকায়। তার চোখে - মুখে প্রশংসা ঝরে। সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসও ঝরে পড়ে। রিমির বাড়ি বিক্রির কথাটা সে যেন কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে বলে। অথচ তা করলে তার কোনো ক্ষতি হতো না। অতীতের প্রতি তার এত মোহ? একটু বাদে সে প্রণববাবুকে ফোন করে দিল।

সপ্তাখানেক বাদে, একদিন গভীররাতে প্রণববাবুর ফোন এলো। তিনি যেন কিছুটা উত্তেজিত।

--- সুদিন ? তুমি কাকে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে?

--- কেন বলুন তো ?

--- আরে, লোকটার সঙ্গে কোনোদিন দেখাই হলো না। কোন ভোরবেলা বেরিয়ে যায় আর কত রাতে ফেরে কে জানে? দরজা জানালা তো খোলেই না। আর যেজন্যে তোমাকে ফোন করছি। এখন রাত কত হবে।

একটা হবে তো ? এই তো আধঘন্টা আগে এক কাণ্ড ঘটেছে

একটানা কথা বলতে বলতে প্রণববাবু যেন হাঁপিয়ে পড়েছেন। ফোনে তাঁর শোঁ শোঁ টানা নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এদিকে সুদিনের বুকটাও টিপটিপ করছে। সে কোনোমতে শুকনো গলায় বলে--কী কাণ্ড -- কাকাবাবু?

---অ্যান্টিসোশালগুলো আজকে রাতেও তোমাদের ভেতরের উঠোনে আসর জমিয়েছিল। একটু আগে। খানিক বাদে তাদের চিৎকার - চেঁচামিচি ---

আর্তনাদ। কী ব্যাপার ? ওদের উৎপাতে দরজা জানলা তো খোলা যায় না।

বাথরুমের ঘুলঘুলি দিয়ে দেখি, ওরা সব পালিয়ে যাচ্ছে। আর যেন মাপ চাইছে কার কাছে। বুঝতে পারলুম না কিছু। তোমার ভাড়াটে কী মস্ত কোনো পুলিশ অফিসার, না, বড়ো কোনো মাফিয়া ? কী জানি বাপু! তুমি কী করলে বুঝতে পারলুম না। তুমি একবার খোঁজখবর নিয়ে দেখো।

তার হাত থেকে ফোনটা আপনা থেকে খসে পড়ে। সে যে কী করছে, নিজেই বুঝতে পারছে না। সত্যিই তো একবার খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল। বড়ো ভুল হয়ে গেছে। সেই ভুলের কথা ভেবে সে বোধহয় অনেকখন দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় রিমি পেছন থেকে এসে বলে।

---কী ব্যাপার? ওরকমভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন? কে ফোন করছিল? সব শুনেটুনে রিমি কিন্তু সুদিনকে বিরূপ কোনো কথা বলে না। বরং তাকে যেন সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলে --- তোমার কী মাথা খারাপ?

--- কেন ?

ওই সরু লিকলিকে লোকটা কোনো পুলিশ অফিসার না। মস্ত কোনো মাফিয়াও না।

---তবে? ওই অ্যান্টিসোশালগুলি ওরকমভাবে ভয় পেয়ে পালাবো কেন?

---আরে বাবা! গুণ্ডাগুলো মদ খেয়ে মাতলামি করে নিজেদের মধ্যে মারপিট বাধিয়ে ভেগেছে। তোমার ওই ভাড়াটের হিম্মত আছে নাকি ? সে তো নিজেই মনে হয় একটা বেঁজির তাড়ায় পালিয়ে যাবে।

সুদিন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। রিমির কাছে হেরে যাওয়ার গ্লানি থাকলেও, আপাতত তো রিমি তাকে মুক্তি দিয়েছে। রিমি তার কাঁধে হাত দিয়ে বলে --- চল! শোবে চল !

---হ্যাঁ যাচ্ছি। তবুও তাকে একবার যেতে হবে। দেখতে হবে ব্যাপারটা। এই চিন্তাটা যেন তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরায় সুদিন।

রোববার সকালেই তার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শনিবার বিকেলে সন্দীপন এসে হাজির। সে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের হোস্টেলে থাকে। মাঝে - মধ্যেই সে সাপ্তাহিক অন্তে এসে হাজির হয়। তার সঙ্গে কথাবার্তায় গল্প-গুজবে দিন রাত কেটে যায়। রোববার বিকেলে সে ফিরে যাবে। তাকে বাসে তুলে দিয়ে সুদিন যখন দমদমের বাস ধরে, তখন সে সন্ধ্যের মুখোমুখি।

জীবনের অনেকটা সময় তার এখানে কেটেছে। তবু চেনা গণ্ডিটা যেন অচেনার দিকে ভেঙে যাচ্ছে। বাড়িটা যেন আরো বয়স্ক হয়ে পড়েছে। বাইরে থেকে সে দেখতে পেল, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। ভেতরে কোনো সাড়া শব্দ নেই। একটা মৃদু আলো আভা জানালার কাচ দিয়ে বাইরে আসছে। সুদিন সদর দরজায় টোকা দেয়। বাড়িতে কী কেউ নেই ? সুদিন এরকম ভাবতে ভাবতে, দরজা নিঃশব্দে খুলে যায়।

---আরে! আপনি? আসুন। আসুন।

সুদিন ঘরের ভেতরে ঢুকতে হোঁচট খায়। ঘরের ভেতরে বেশ আঁধার রয়েছে। নাইট বালব শুধু জ্বলছে।

---ঘরের ভেতরে আলো জ্বালাননি দেখছি ?

---ফালতু কারেন্ট পুড়িয়ে কী লাভ? ইউনিটের যা দাম বেড়েছে আজকাল।

---কিন্তু রাতের বেলা---?

---এই আলোয় আমার কোনো অসুবিধে হয় না।

সুদিন চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে। মনে মনে সে সবকিছু যাচাই করে নিতে চায়।

বেশ তো গরম রয়েছে। দরজা জানালা খোলেননি দেখছি? দরজা জানালা খুলে বাইরের শব্দ বড়ো বেশি ভেতরে আসে। আগেই বলেছি, নিরিবিলি থাকতে ভালোবাসি। আগে যেখানে থাকতাম, প্রোমোটাররা সেই পুরোনো বাড়িটা ভেঙে বহুতল বাড়ি করেছে। সেখানে এত হইচই চীৎকার --- দারোয়ানের সতর্ক নজর আমি টিকতে পারলুম না। আপনার এখানে এসে শান্তি পেয়েছি।

---অহিভূষণবাবু---? গম্ভীর হয় সুদিন।

---বলুন?

---আমাদের শর্তের কথা মনে আছে তো?

---হ্যাঁ! হ্যাঁ! দেখুন! আপনার কোনো জিনিস বাতিল হতে দিইনি। সব টাটকা তাজা আছে।

সত্যিই - সত্যিই ঘরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে যায়। সেখানে টাঙানো মা - বাবা, দাদু - দিদিমার গলায় রজনীগন্ধার টাটকা মালা ঝুলছে। ফুলের গন্ধ নয়। টাটকা স্মৃতিতে যেন ঘরটা ভরে উঠেছে। সুদিনের ভেতরটা যেন গলতে শুরু করে। সত্যি, ফুলের মালা তো দূরের কথা, ফটোগুলোকে কোনোদিন সে ঝাড়পোছ পর্যন্ত করেনি। লোকটা কী যাদু জানে? এভাবে তাকে হারিয়ে দিল?

চারিদিকে তাকিয়ে সুদিনের মনটা ভরে ওঠে। কোথাও কোনো জিনিসের অদল-বদল ঘটেনি। পনের বছর আগে সে বাড়ি ছেড়েছে। সেই বছরের ক্যালেন্ডার, হ্যাঙারে একটা পুরোনো শার্ট সব ঝুলছে। জানালার ফাঁকে গোঁজা পুরোনো পুরোনো খবরের কাগজ সব রয়েছে। প্রণববাবুর কথা মনে পড়লো। পুলিশ অফিসারের কোনো চিহ্নই সে দেখতে পাচ্ছে না। বড়ো মাফিয়া ? সেটা এখনো বুঝতে পারছে না সে। খাটের তলায় উঁকি মারে সে। তার পুরোনো জুতো জোড়া পড়ে আছে। তার পাশে ওটা কী?

---অহিভুষণবাবু---? সে বিস্ময়ের গলায় বলে।

---ও কিছু না। মাঝে- মাঝে এখানে কু- লোকের আবির্ভাব ঘটে। তাদের ভয় দেখানোর জন্যে দরকার হয়।

সুদিনের বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে যায়। মনটা ফুরফুরে হয়ে ওঠে। ওঃ! মস্ত বড়ো এই সাপের খোলস দেখে অ্যান্টি - সোশালেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। সত্যি লোকটার বুদ্ধি আছে।

ঘর উঠোনময় ঘুরতে ঘুরতে আর তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সুদিনের মনটা তৃপ্তিতে ভরে যায়। সে তখন অসতর্ক মূহূর্তে অনেক কথা বলে ফেলে। তার শেকড়শুদ্ধ জড়িয়ে থাকা এই বাড়িটা সে বেহাত করতে চায় না। এমনকী তার স্মৃতি। তার স্ত্রী বারবার তাগাদা দিলেও, এই বাড়িরর সে বিক্রি করবে না। বাড়ি ভাড়াও দিতে সে রাজি হয়নি। কিন্তু ইদানীং অ্যান্টিসোশালরা সব এখানে বাসা বেঁধেছে। কোনোদিন বোম- টোম বিস্ফোরণে বাড়িটাকে না উড়িয়ে দেয়। তাই বাধ্য হয়ে সে বাড়িভাড়া দিয়েছে। কিন্তু তাতেও তো বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

---না। না। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। সবকিছুই আপনার থাকবে। অহিভূষণ তাকে সান্ত্বনা দেয়। সুদিন চুপ করে থাকে। মনে - মনে ভাবে, ভরসা তো করা যায়। কিন্তু কতদিন?

---চলি তাহলে --- অহিভূষণবাবু ? নমস্কারের বদলে হাত বাড়ায় সুদিন।

---আপনাকে চা খাওয়াতে পারলুম না। আমার গিন্নি একটু হাওয়া খেতে বাইরে বেরিয়েছেন।

---তাতে কী হয়েছে? আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছিলুম।

তার সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে চমকে ওঠে সুদিন। মানুষের হাত এত ঠান্ডা!

সেই শীতল পরশ যেন সুদিনের বুকের ওপর উঠে আসে। ভ্যাপসা গরমের মধ্যে তার কাঁপুনি ধরে। অহিভূষণ দরজা বন্ধ করে দেয়

। একটু বাদে তার কাঁপুনি থেমে যায়। সে একটা সিগারেট ধরায়। লোকটার স্পর্শে সে কী ভয় পেয়েছে? না । না সে ভয় পাবে কেন? তবে লোকটাকে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। লোকটা কত আপন! তার পূর্বপুরুষের স্মৃতি সব আগলে রেখেছে। আবার তার শীতল স্পর্শ তাকে জড় করে তুলেছে। তা হোক লোকটা তার বাড়ি আগলে রাখবে। কোন অমঙ্গল হতে দেবে না বোধহয়।
একবছর খুব ভালোভাবে কেটে গেল। পৃথিবী সূর্যটাকে এক্পাক মেরে এলো। সরীসৃপরা একবার খোলস বদল করলো। প্রণবাবুর ফোন আর আসেনি। মাসে দশ তারিখের মধ্যে অহিভূষণের চেক আসে ক্যুরিয়রে। পাঠানোর আগে সে একবার রিমিকে ফোন করে দুপুরে। তখন সুদিন বাড়িতে থাকেন না। অফিসে।
এবার পুজোর ছুটিতে তারা হংকং যাবে। তারজন্যে সুদিনকে বিস্তর দৌড় ঝাঁপ করতে হচ্ছে। অফিসের পারমিশন, পাশপোর্ট, ডলার --- ইত্যাদির সব হাউল রয়েছে তার সামনে। এজন্যে বোধহয় তার খেয়াল ছিল না, মাসের দশ তারিখ পেরিয়ে গেছে। রিমিই তাকে জানায়। অহিভূষণ তাকে ফোন করেছিল অন্যান্যবারের মতো। তবে তার একটা অসুবিধে হয়েছে। সেজন্যে বাইরে বেরোতে পারছে না। তাই টাকা জোগাড় হয়নি। তার কাছে একটা রত্ন আছে। তার গুণ আছে। একজন নারী যদি ধারণ করে তবে তা প্রকাশ পায়। এটা সে দিতে পারে। তাতে তার দেনা শোধ হয়েও অনেক বেশি থাকবে। সে একটা দিতে পারে। তবে একটা শর্তে।
সুদিনের অত শোনার মতো ধৈর্য নেই। তাছাড়া ব্যস্ত হওয়ার কী আছে? ভদ্রলোক তার সুবিধেমতো শোধ করে দেবে। এখন যখন তার অসুবিধে আছে, তখন থাক না। সে তো তার বাড়িটাকে আগলে রেখেছে। অ্যান্টি - সোশালরা যখন আর ঘেঁষবে না। কিন্তু বি. মি একরকম জোর করে তাকে পাঠিয়ে দেয়। এ - ব্যাপারে সুদিন অবাক হলেও কিছু বলে না ব্যাপারটা কী ? সে ধরতেও পারে না ।
অফিস শেষ করে সন্ধের পর হাজির হয় সুদিন। দরজা জানালা সেই আগের মতো বন্ধ। একবছর সময় পার হয়ে গেছে। অথচ সব কিছু আগের মতো আছে। সে দরজায় টোকা দেয়। অহিভূষণ যেন তার অপেক্ষায় ছিল। টোকা দেওয়ামাত্তর সে দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকে সুদিনের গা-টা যেন শিরশির করে। অদ্ভুত এক আঁশটে গন্ধে চারিদিক ভরে আছে। দেয়ালের দিকে তার চোখ পড়ে। ফুলের মালাগুলো সব শুকিয়ে গেছে। এগুলো কী সেই গতবছরের মালা? ধন্ধে পড়ে যায় সুদিন। বছর কী পালটায় নি? সময় কী থমকে দাঁড়িয়ে আছে? এখানে এলে বিভিন্ন স্মৃতি তাকে আঁকড়ে ধরে। বর্তমান যেন পিছু হটে যায়। অহিভূষণ কী তার মনের কথা ধরে ফেলেছে ?
---মালাগুলো সব শুকিয়ে গেছে। আসলে অতীতকে তো চিরকাল ধরে রাখা যায় না। বর্তমান তো এসেই যায়--- কী বলেন সুদিন বাবু ? সুদিন তার দিকে তাকিয়ে অবাক চোখে বলে---
---আপনি কী বলতে চাইছেন--- বলুন তো --- অহিভূষণবাবু?
---বছরে এসময়ে আমার খুব অসুবিধে হয়। বেশ কষ্ট হয়। তাই আপনার কাছে একটা আবদার ছিল?
---ঠিক আছে। আপনি না হয় পরেই ভাড়া দেবেন। আপনার অসুবিধে কেটে গেলেই নাহয় দেবেন। আমার কোনো আপত্তি নেই।
---না না। তা নয়। আসলে আমি একটা অন্য কথা বলছি।
---কী কথা?
---আপনার ভেতরের উঠোনে একটা কেয়াগাছ লাগাতে চাইছি?
---না। না। তা হয় না । ---সুদিন রাজি হয় না।
---তার বদলে আপনাকে একটা রত্ন দেবো। সেই রত্নের দামও যেমন, তেমনি গুণও আছে।
---ওসব লোভ দেখাবেন না। আমি কোনোকিছুর বিনিময়ে এর অতীতকে ঝাপসা করতে দিতে পারি না।
---কিন্তু, এই দেখুন আমার দাঁতের গোড়ায় গরল জমছে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কেয়াগাছের গোড়ায় আমি তা উপুড় করি।
---আপনার অসুবিধে হলে, আপনি এ বাড়ি ছেড়ে দিতে পারেন?
---কিন্তু আমি যাবো কোথায়? চারিদিকে সব বড় বড় বাড়ি উঠেছে। হইচই লোকজন। এরকম নিরিবিলি জায়গা পাবো কোথায়?
---তাহলে আমার কিছু করার নেই। বলে সে অহিভূষণের মুখের দিকে তাকায়। এতখন সে আবছা আঁধারেভালো করে খেয়াল করেনি। আঁতকে ওঠে সে। মুখের কী ছিরি হয়েছে। চোয়ালের নীচে দু-পাশ ফুলে আছে। দুপাশে দুটো দাঁত ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আছে। মুখ দিয়ে যেন লালা ঝরছে।
---তাহলে আপনার কিছু করার নেই? আপনি তা হলে রাজি নন--আমি সামান্য একটা কেয়াগাছ লাগাই?
---না। না। না। সুদিন শক্ত হয়ে দাঁড়াল। যদিও তার মুখের চেহারায় সে একটু ভয় পেয়েছে। ঠিক আছে! অহিভূষণ হিস হিস করে ওঠে। তারপর খাটের নীচে থেকে খোলস বের করে। অহিভূষণের চেহারা যেন ক্রমশ পালটাতে থাকে। তা দেখে সুদিন আর দাঁড়ায় না। তার পেছনে তখন স্টিম ইঞ্জিনের ফোঁস শব্দটা দরজা পর্যন্ত ধাওয়া করে এলো।
বাড়ি ফিরে সুদিন অনেকখন গুম মেরে রইলো। ভয়টা তার শেষ পর্যন্ত রাগে পরিণত হলো। অহিভূষণের সাহস তো বড়ো কম নয় ? সে বাড়ির মালিক। আর তার দিকে সে ফণা মেলেছে? তার মতলবটা কী? কেয়াগাছেরনাম করে সে সুদিনের সমস্ত অতীতটাকে গ্রাস করতে চায়? সে - ও ছেড়ে দেবে না। অহিভূষণকে সে উচ্ছেদ করবেই। সে তখন তার চেনা উকিল রথীনবাবুকে ফোন করে।

---ওঃ! সুদিন। তুমি ! তোমার ভাড়াটে.....উচ্ছেদ করতে চাইছো---
---হ্যা! হ্যাঁ! রথীনবাবু.....
---ভাড়া টাড়া বাকি পড়েছে নাকি ?
---এক মাস মতো.....
---আর দু - মাস অপেক্ষা করো.....এমন কেস ঠুকে দোব....বাবাধন.....বাড়ি ছেড়ে পালাবার পথ পাবে না!
---আপনি কথা দিচ্ছেন তো..... ?
---হ্যাঁ! হ্যাঁ! একদম পাকা কথা! উকিলের কথা কখনও নড়চড় হয় না।
রথীনবাবুর কথা শুনে সুদিন বোধহয় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু রিমির চোখে ঘুম আসে না। অহিভূষণের কথা মনে পড়ছে। ম্যাডাম! এই রত্ন টার একটা অলীক গুণ আছে। যদি কোনো নারী ধারণ করে তবে। সে তো বেশি কিছু চায়নি। একটা মাত্তর কেয়াফুল গাছ লাগাতে চেয়েছে। এতে আপত্তির কী আছে, সে বুঝতে পারে না। সুদিন মাঝে - মাঝে তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে যায়। তবুও সে পাশ ফিরে শোয়া সুদিনকে ঠেলে দেয়।
---এই শুনছো?
---কী? সুদিন পাশ ঘুরতে চোখ খুলে বলে।
---তুমি কী ভদ্দরলোককে সত্যি - সত্যিই উচ্ছেদ করতে চাইছো?
---কেন বলতো ?
---একটা কেয়াগাছ লাগাতে দিতে তুমি এত আপত্তি করছো কেন?
---কেয়াগাছ একটা বাহানা মাত্তর। আসলে সে পুরো বাড়িটাকে গ্রাস করতে চায়। নইলে অমনভাবে কেউ ফোঁস তোলে?
তাহলে রত্নটা? অহিভূষণ বলেছিল ---ম্যাডাম রত্নটা পরলে, আপনি এক আশর্চ্য নারীতে পরিণত হবেন। সবাই আপনার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাবে। সত্যিই কী তাই? তার মধ্যে আলাদা কোনো নারী সত্ত্বা আছে নাকি? অহিভূষণের কথাটা তার মনে বারবার ভেসে উঠছে। হয়তো রিমি জানে না। রত্নটা পরলে তার নতুন এক সত্ত্বা জেগে উঠবে। সে আদুরে গলায় সুদিনের গলা জড়িয়ে বলে--- তোমাকে একটা কথা বলবো?
---বলো।
---রাগ করবে না তো ?
---না। উঠে বসে সুদিন।
---অহিভূষণবাবুর রত্নটা আমাকে এনে দেবে ?
জানালা দিয়ে চাঁদের আলো বিছানায়। সেই আলোয় সে রিমির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। এ কোন রিমি কথা বলছে? যে কোনোদিন কিছু তার নিজের জন্যে চায়নি। তার চাহিদার সবটুকু সংসারের জন্যে। সুদিনের জন্য। সন্দীপনের জন্যে। বিয়ের গয়না নতুন করে কিনে দিতে চাইলেও সে নেয়নি। রত্নটা নিলে বাড়িটা বেহাত হয়ে যেতে পারে। যে বাড়িটা বিক্রি করে রাজর হাট নিউটাউনে সে জমি কিনতে চেয়েছে। সে বাড়িটার বদলে নিজের জন্যে রত্ন ?
---কী করবে সেটা নিয়ে ? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে সুদিন।
---কেন তুমি আমাকে একটা নেকলেস করে দেবে। তার লকেটে ঝোলাবো সেই রত্নটা।
না। না। এ তো সেই চেনা রিমি নয়। মনে হচ্ছে যে রিমি কথা বলছে না। তার ভেতরে বসে অন্য কেউ কথা বলছে। সুদিন ঠিক বুঝতে পেরেছে। কিন্তু রিমি বুঝতেপারছে না। সুদিন ঘামছে। তার মাথা ঝিমঝিম করছে।পা টলছে। সে বড়ো বিপন্ন হয়ে পড়ে।

:

বিসর্পিল

অনুরাধা কুণ্ডা

সাপটি খুব মন্থর গতিতে চলে। ওর বহুবর্ণময় পিচ্ছিল ত্বক পাথরের উপর ঘষা খেতে থাকে। এক ধরনেরশান্ত অথচ শক্তিশালী মন্থরতা তৈরী হয়। চোখ খুব কালো। গোল এবং স্থির। মার্বেলের মত চকচকে, প্রাণহীন। অথচ প্রাণময়। মাঝেমাঝে জিভ দেখা যায়। এত কাছের থেকে সাপ রচনা আগে দেখেনি। অথচ কেবল নেটওয়ার্ক তোবহুদিন হলই আছে। ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, সানি, সাহারা। দেখেনি। সময় হয় না। হয়নি। রাত্রেরদিকে নিয়মিত দু-একটা সিরিয়াল আর সপ্তাহান্তে হিন্দি বা বাংলা ছবি ছাড়া রচনা তেমন টিভির সামনে বসার সুযোগ পায় না। যেমন আজ পেয়েছে। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি। মেয়ের হাতে রিমোট। খুব কাছে থেকে টিভি দেখেসে। রচনা বিরক্ত বোধ করে। আর কত বলা যায়! একে তো চোখ খারাপ।

উত্তর আমেরিকার সাপটি ক্রমশ সামনে এগোয়। একটি ইঁদুর সামনে আছে। খবু ছোটো নিরীহ। অদৃশ্য ধারাবিবরণী চলে --- সাপটি ক্ষুধার্ত নয়। বিনা আক্রমণে সে ফণা তোলে না এবং একটু আগে সে প্রচুর পাখির ডিম খেয়েছে। তবু রচনা ইঁদুরটির জন্য ভয় পায়। এর আগে কখনো সে ইঁদুরের জন্য এইরূপ মায়া বোধ করেনি। ক্ষিধে নাথাকা সত্ত্বেও সাপটি হাঁ করলে রচনা দ্রুত উঠে যায়। মাঝখানে করিডোর পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে। মেয়েকে বলে---এবার ওঠ। আর টিভি দেখতে হবে না। মেয়ে আরও বেশি সেঁটে যায় টিভিতে।

কষ্ট হয় রচনার। বড্ড মোটা হয়ে গেছে মেয়েটা। এটা ওর রোগ। এই বয়সে এত মোটা, মাত্র সেভেনে পড়ে। থাইরয়েডের সমস্যা আছে। খেলা-ধুলো করতে পারে না। তারপর চোখটা খারাপ। থাক, টিভি দেখুক। শোবার ঘরে যায় রচনা। জানালায় পর্দাদের উড়ে যাওয়া দেখে।

এবং চমকে ওঠে। চমকে ওঠার কোন কারণ ছিল না। দৃশ্যটি খুব সাধারণ। নিলি ঘর মুছচে। ঘরের আনাচকানাচ নিখুঁত করে মোছে মেয়েটা। খুব রোগা, মিশকালো শরীর। মাথায় লম্বা হয়েছে বেশ। ঘর তো রোজই মোছে এইসময়। রচনা স্কুলে থাকে। আজকে চোখে পড়ল। কেমন চকচকে হয়েছে মেয়েটার নাক, চোখ, মুখ। অনায়াসে শরীর লম্বা করে খাটের তলায় ঢুকে গেল, যেন একটি লম্বা, পিচ্ছিল সাপ। মাঝে মাঝে উঁচু করছে---- ঠিক ফণা তোলার মত---সাবলীল, মৃদু। ওর হাতের ঠিনঠিন আওয়াজ হচ্ছে। রচনা স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল এবং ভাবল হঠাৎ করে নিলিকে সর্পিণী ভাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু নিলির গায়ে মেহগনি বার্ণিশ।

কিছুক্ষণের মধ্যে রচনার ছেলে স্কুল থেকে আসবে এবং বিকাশ অফিস থেকে ফিরবে। ক্লান্ত হয়ে। তার আগে কাঁসার বাটিটা খুঁজতে হবে। অনেকদিন ধরে ভাবছে। কাঁসার বাসনপত্র, যা রচনা বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত, বেশিরভাগ লফটে তোলা। দু-একটি বাইরে থাকে। অথচ অদ্রিজা, রচনার মেয়ের জন্মদিনের বাটিটি পাওয়া যায় নি। পায়েস রাখবে, ভেবেছিল রচনা। তার প্রথা অনুযায়ী।

রান্নাঘরের তাকে ঝুঁকে বসে রচনা। ননস্টিক প্যান, কড়াই, তিনটি প্রেশার কুকার, থালা, বাটি সব সরিয়ে খুঁজতে থাকে। রান্নাঘরের তাকে এত ঝুল, এত ধুলো! কি করে নিলি! ক্রমশ বাসনের পাহাড় জমে ওঠে। কাঁসার বাটিটি কিছুতেই দৃশ্যমান হয় না। রচনা ক্লান্ত হতে থাকে। কি খুঁজছে সে? একটা কাঁসার বাটি? যাতে বছরে একদিন সে ছেলেকে বা মেয়েকে পায়স তুলে দেবে? অদ্রিজা টিভি বন্ধ করে উঠে আসে। 'কি খুঁজছো মা?' অনেকদূর থেকেকণ্ঠস্বর ভেসে আসলে যেমন লাগে ঠিক তেমনি। শব্দগুলি কর্ণগোচর হয় মাত্র। বোধ যুক্ত হয় না। অতএব রচনা উত্তর দেয় না এবং ক্রমাগত বাসনের অরণ্যে হারিয়ে যায়। তাকের গভীর খাঁজে অন্ধকার। বস্তুত এই জাতীয় তাকে হাত দিতে রচনার খুব অনীহা। যদি পোকামাকড় থাকে! অথচ সাততলার ফ্ল্যাটে তেমন পোকামাকড় নেই। তারা ছিল রচনার বাপের বাড়িতে। বাসনের তাকে ইঁদুর, আরশোলা। তবু আজও, রচনা ভয় পেতে পেতে ক্লান্তি বোধ করে।অথচ এ বাসনাসমূহ তার-ই।

তারপর খুব চিৎকার করে নিলিকে ডাকে। চিৎকারটি কেমন ফ্যাসফ্যাসে শোনায়। জোরে নির্গত হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। হাওয

. া কাঁপতে থাকে। নিলি এসে দাঁড়ায়। রোগা, দীঘল। সবুজ কাঁচের চুড়ি হাতময়। রচনা হাওয়ায় শব্দ ছুঁড়ে দেয়---কাঁসার বাটিটা কোথায়? নিলি খুব আশ্চর্য হয়ে ভ্রূভঙ্গি করে---জানি না তো! কোন বাটি? রচনা ঝলসে ওঠে। রচনার চিৎকারে অদ্রিজা দৌড়ে এসছে। নিলির পাশে দাঁড়ায়। নিলির চেয়ে বছর খানেকের ছোটো খুব জোর। রচনা চশমা খুলে তাকায়। বেঢপ মোটা মেয়ে। অথচ মুখে কি সরল অভিব্যক্তি। চশমার আড়ালে জুলজুলে চোখ। অদ্রিজা খুব হাসে। এখনও ওর চোখ হাস্যময়।

এর নাম রচনার রাখা। 'নামে কি এসে যায় রচনা?' বিকাশ পরিহাস করে বলে থাকে। ও জানে রচনা তার নিজের নামটি পছন্দ করে না। 'কে বা কাহারা তোমাকে রচনা করিয়াছে' ---এই জাতীয় বাক্যে রচনা কেবলমাত্র নিজেকে রচিত হতে দেখে এবং অদৃশ্য রচনাকারিকে ভাঙতে চায়। তাকে ভাঙা যায়না বলে সে নিজেকে চূর্ণ করে এবং নিলির কাছে উঠে এসে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাক--- 'বাসনের তাক তো তুই দেখিস, জানিস না বাটিটা কোথায়? শয়তান কোথাকার, চুরি করেছিস, শয়তান...।' নিলির চিবুকে একটি আশ্চর্য ডৌল। পিচ্ছিল, রোগা কাঁধ। বস্তুত 'শয়তান' শব্দটি উচচারিত হলে এক ধরনের সবুজ শয়তানি সমগ্র রান্নাঘরে ছড়িয়ে যায়। 'শয়তানি ইলাকা' বলে একটি তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির ছবি রচনা একবার মিনিট পনেরো দেখেছিল, তার বাসি গন্ধ এই রান্নাঘরে পৌঁছায়। রচনা নিলিকে একটি চড় মারতে উদ্যত হয়।

চড়টি হাওয়ায় আটকে যায়। রান্নাঘর যদিও গুমোট পাশের ঘরে বনবন শব্দে পাখা ঘুরছে। রচনা হাঁফাতেথাকে। নিলি তার হাত ধরে ফেলেছে। মাথায় তারই সমান, হিলহিলে লম্বা কালো, মেহগনি বার্ণিশের মেয়ে। 'গায়েহাত দিবা না, তোমার কাঁসার বাটি নিই নাই আমি।'

রচনা নিলির চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে যায়। আর হাঁফায়। বাসনের স্তূপ পা চেপে ধরে। 'তোর মাইনে থেকে বাটির দাম কেটে নেব আমি, বজ্জাত মেয়ে, শয়তানি!' রচনার চোখ বিস্ফারিত হতে হতে শূন্য দেখে। আবারও শয়তানি এলাকা বিস্তৃত হয়। পাথুরে জমি। পত্রহীন রক্ষ গাছ, মসৃণ কালো জলে নিকষ কালো সর্পিনী এবং সর্প সাঁতার কাটে। নিলি হিসহিস করে বলে 'মাইনে কেটে দেখ, কি করি আমি! দাদার নামে বদনাম করে দিব। গাল দিবা না খামকা। চোর না আমি।'

রচনা বিধবস্ত হয় এবং অবাক চোখে নিলির দিকে তাকিয়ে থাকে। অদ্রিজার চেয়ে বছর খানেকের বড়ো। কি অনায়াস শক্ত, সাবলীল বিচ্ছুরণ। তারপর চলে যায়। অদ্রিজা টিভি খুলে বসে। নিলি ঘর মোছে, তারপর বাড়ি চলে যায়।

রাত গভীর হলে নিজস্ব কাপড়ের বাণ্ডিল থেকে নিলি দু একটা করে জিনিস বের করে দেখে। তার মা এবং দুটি বোন, ভাই, বাপ, সকলেই নিদ্রামগ্ন। নিলির পাশে নিলির পিসি ঘুমায়। কানে শোনে না। নিলি পরম মমতায় জিনিসে হাত বোলায়। রচনার ফেলে দেওয়া দু-একটি ঝুটো গয়না, মিনা উঠে যাওয়া, অদ্রিজার জামা পেন এবং সকাল বা সন্ধ্যার সূর্যের মত রক্তাভ কাঁসার একটি বাটি। মসৃণ, শক্ত বাটি। নিলির হাত বাটিটির গায়ে পড়ে থাকে। পরদিন সকালে আবার কাজের বাড়ি। আবার শরীর লম্বা করে খাটের তলা মোছা। সাবানের ফেনার গন্ধ। দিন এবং রাতের মাঝখানে একটি কালো, মেহগনি বার্ণিশের ভাস্কর্য সূর্যকে দুহাতে ধরে রাখে। নিলির মুখে অবিকল অদ্রিজার ন্যায় হাসি।

যেহেতু রচনার সময় কম, বিকাশও ভীষণ ব্যস্ত, এবং রচনা - বিকাশের ছেলে ইংরিজিতে দুর্বল, রচনা বিজ্ঞান শিক্ষিকা, তাই সে স্কুল ফেরত অর্কপ্রভর খাতা নিয়ে আসে। রচনার ছেলে হোমটাস্ক টুকে নেয়। অর্কপ্রভার খাতায় ভুল থাকে না। রচনা নিশ্চিন্ত হয় কিন্তু কাঁসার বাটিটিকে ভুলতে পারে না। নিলি আবারও পিচ্ছিল দক্ষতায় খাটের তলা, আনাচ-কানাচ মুছে যায়। শুধু রচনা দেখে না। দেখেও দেখেনা। অভ্যাসে একটি ব্যবহারিক বৃত্ত তৈরি হলে সে একদিন কাঁসার বাটিটির কথা ভুলে যায়। নিলিও বিকাশের সম্পর্কে কোন বদনাম করে না। ডিসকভারিতে সাপ খুব দেখায়। তারা কখনও মন্থর, কখনও ক্ষিপ্রগতি। সকলেরই চোখ স্থির। দেখলে গা শিরশির করে। তবে অদ্রিজা এখন বেশির ভাগ খেলা দেখে। তার ভাই বা বাবাও তাই।

কাঁসার বাটিটি এখন বন্ধ চ্যানেল। নিলি সংসার পাতলে সে আবার দৃশ্যমান হবে। আপাতত নিলি টাকা জমাচ্ছে। ইঁদুরের অভাব নেই। তাই সে ক্রমাগত সড় সড় করে চলাচল করে, কোন বিঘ্ন ঘটে না।

নিলি জানে এভাবেই বাঁচতে হয়। সে শরীর প্রসারিত করে খাট, ডাইনিং টেবিলের তলা, ঘরের কোণসমূহআরও ভাল করে মুছতে শেখে। অদ্রিজা তার স্থূলদেহ নিয়ে বেশি নড়াচড়া করে না, ডাইনিং টেবলে এক গাদা বই নিয়ে বসে পা দোলায়। এমন করে দোলায় যাতে নিলির গায়ে পা লাগে। এবং হি হি করে। নিলি এই ব্যাপারটা খুবগায়ে না মাখলেও একদিন জোর একটা চিমটি কেটে দেয়।

অদ্রিজা চিৎকার করে ওঠে। 'দাঁড়া মাকে বলে দেব।'

নিলি হাসে---আমার গায়ে পা দিস কেন রোজ? লাথি দিস? আমি মানুষ না? তোদের ঘর মুছি না? আমি তোর মাকে বলব তুই লাথি মারিস। অদ্রিজা ভাবিত হয়। তার উজ্জ্বল চোখ মোটা চশমার কাঁচের আড়ালে চিক্‌চিক্‌করে। চেয়ার থেকে ওঠে। তাতেও কষ্ট। হাঁসফাঁস করে। অদ্রিজা রচনার শয়নকক্ষে চলে যায়। নিলি উদগ্রীব হয়ে মাথা তুলে দেখে।

অদ্রিজা একটি নতুন কাপড়ের টুকরো নিয়ে আসে। ব্লাউজ - পিস। সেলের সময় রচনা একসঙ্গে বেশ কিছু কিনে রেখেছিল। এখনও বানাতে দেওয়া হয়নি। সময় নেই।

'মাকে বলিস না। এইটা নিয়ে নে, জামা বানাবি।'

নিলি কাপড়ের টুকরোটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর নিয়ে নিজস্ব প্লাস্টিকের ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেসে অবিলম্বে।
স্কুলে থাকে বলে রচনার এই ঘটনা দৃষ্টি গোচর হয় না। তবে সে চিন্তিত থাকে --- অসুস্থতার জন্য অদ্রিজার অনেক স্কুল কামাই হয়
।
মেহগনি বার্ণিশের ভাস্কর্যের গায়ে একখানি হলুদ বাটিকের ব্লাউজ। এই দৃশ্য দেখে সায়াহ্নের সূর্য, কচুরিপানা, পাড়ার উঁকিঝুকি দ
দওয়া ছেলেছোকরা, সমবয়সিনীরা সকলেই আশ্চর্য হয়। এক হয় বাবুর বাড়ি খুব দয়াবান না হলে মেয়েটা পাকা চোর, এরকম কি
ছু সিদ্ধান্ত যে কেউ নিয়ে ফেলতে পারে।
তাতে নিলির কিছু আসে যায় না। সে এক আশ্চর্য শক্তি বিকিরণ করে ধীরগতিতে চলতে থাকে। মাঝেমধ্যে মাথা তোলে।
:

ফুল্লরা উপাখ্যান

প্রদীপ সামন্ত

ভোরের দিকে বাবা খুব কাশতো খকখক করে। মা বলতো, যাও, রাত জেগে কীর্তন গান গাইতে যাও বেশি করে বেরিয়ে। বাবার গানের গলা ছিল বেশ তীক্ষ্ণ । গোঁফ - দাড়ি কেটে চকচকে মুখ - চোখ সবসময়। চোখের দিকে তাকালে বোঝা যেত আগের দিনের কাজল লেগে আছে চোখের কোনায়। মনে হত যেন সূর্মা দিয়েছে। খুব ছোটবেলায় বাবাকে দেখতাম, মাঝে মাঝে দু-চারদিন ঘরে ফিরত না। বাবা না ফিরলে মার চেহারা কঠিন হয়ে যেত। কারণে অকারণে আমাদের দু-ভাইকে বকত। খাবার কথা একবারের জায়গায় দু-বার বললেই খিঁচিয়ে উঠত। এভাবে আমরা দু-ভাই মার কাছে মানুষ হচ্ছিলাম। পরে শুনলাম, বাবা নাকি চণ্ডীমঙ্গলের দলে ভিড়েছে। আমাদের পাশের গ্রামে একবার বাবার দল যাত্রাপালা করতে এল। আমরা দূরে বসে বাবার অভিনয় দেখছিলাম। বাবার কী তীব্র গলা। বড় ভালো লাগছিল তাকে। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর অভিনয় করত সে। কী মানিয়েছিল তাকে। যেমন লম্বা তেমনিকোঁকড়ানো চুল। মনে হচ্ছিল বাবা সত্যি সত্যি শিকারে যাচ্ছে। মাকে দেখছিলাম মিটিমিটি হাসছে আর আঁচলের খুঁট দিয়ে মুখ মুছছে। মঞ্চে বাবাকে আর মঞ্চের বাইরে দর্শকের আসনে লজ্জায় রাঙা মাকে দেখে আমার বেশ ভালো লাগছিল।

বাবা মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরত। যাত্রাগান করতে করতে ফুল্লরার সঙ্গে তার একটু ভাব ভালোবাসা হয়। গাঁ- গঞ্জে পাঁচজন পাঁচ কথা বলে। সেকথা মার কানে পৌঁছোয়। বাবা বাড়ি ফিরলে মা খোঁটা দেয়। ভালো করে জানতে চায় ফুল্লরার কথা। আর অমনি বাবার অন্য মূর্তি। মঞ্চে অমন যে খোলামেলা অভিনয় করে, সেই বাবাকে বাড়িতে এলে যেন চেনাই যেত না। গম্ভীর আর খিটখিটে মেজাজের বাবাকে একটুও ভালো লাগত না। কেমন অন্য একটা লোক হয়ে যাচ্ছিল সে। ফুল্লরার কথা নিয়ে মার সঙ্গে তার ঝগড়া লেগে যেত । বাবা রাগ করে বাড়ি আসা কমিয়ে দিত। প্রায় দু-মাস তিনমাস পরে একদিন হয়তো বাড়ি ফিরে আসত। স্নান করে গুছিয়ে ভাত খেতে বসত। অমনি মা ফস করে ফুল্লরার কথা বলে ফেলত। খাওয়ার থালা ঠেলে দিয়ে বাবা উঠে পড়ত। এঁটো হাতে বেরিয়ে যেত। মা কাঁদতে কাঁদতে বাবার এঁটো মুছত। গৃহস্থ বাড়ির কর্তা কাজে গেলেন। তাঁর এঁটো বাসন তো মাজতে হবে। নইলে যে অকল্যাণ হবে ! দাওয়ায় বসে বসে দেখতাম খিড়কির ঘাটে মা বাসন মাজছে। তার চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। থালার উপর ছাইয়ের আস্তরণ। তার উপর ফোঁটা ফোঁটা জলের ছোপ। ওই বয়সে ওই দৃশ্য দেখে আমারও কান্না পেয়ে যায়। আমিও চোখ মুছতে মুছতে ঘরে চলে আসি। বাবার উপর খুব রাগ হয়। দাদা তো আমার থেকে একটু বড়, সে বেশিরভাগ সময় এইসব খুচরো ঘটনা জানতেই পারত না।

ভেজা পায়ে মা ঘাট থেকে উঠে আসত। আমি মার পিছু নিতাম। মাকে জিজ্ঞেস করতাম

---ওমা, মা! বাবা কোথায় গেল ?

মা বলত ----চণ্ডীমঙ্গল।

কিছু না বুঝে আবার বলতাম --- ওমা, বাবা আজ কোথায় চলে গেল ?

মা বলত --- যমের দুয়ার।

আমি আর কথা বলতাম না। মা কাঁদত। আমিও কাঁদতাম।

কাঁদতে কাঁদতে মা আমার একদিন মরে গেল। বাবা খবর পেয়েছিল তিন চারদিন পরে। আচমকা বাড়ি ফিরে এসেছিল। এসে আম

াকে বলল -- তোমার মাকে ডাক।
আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। বাবা বলল -- তোর মা কোথায় ?
আমি বললাম --- স্বর্গে গেছে।
বাবা হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। একটুও কাঁদল না। টিপ করে বসে গম্ভীর হয়ে গেল। মা মারা যাওয়ার চতুর্থ দিনে দাদাকে থান পরতে দেখে বাবা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। বাবাকে কাঁদতে দেখে আমিও কান্না জুড়েদিই। তারপর হঠাৎই দেখলাম দাদা বড়ো হয়ে গেছে। অনেক বড়ো।
দাদা বলল --- এখন আর কেঁদে কী হবে ?
বাবা বলল --- কী বলিস, কাঁদব না ?
দাদা বলল --- না, কাঁদবে না। যেখান থেকে পারো মার শ্রাদ্ধের খরচ জোগাড় করো। মার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। বাবা খুব ভালোমানুষ হয়ে গেল তারপর। একটুও বকে না। তাকে কেমন দুঃখী লাগে এখন। পাড়ার লোক এসে বোঝালো --- এরকম সংসার আঁকড়ে প ড়ে থাকলে চলবে ? মা-মরা ছেলে দুটোকে তো মানুষ করতে হবে। পুরুষ মানুষের কি এভাবে ভেঙে পড়লে চলে ?
বাবা বলল --- কী করব এখন ?
পাড়ার লোক বলল -- বিয়ে কর আবার।
বাবা বলল --- আবার বিয়ে করব ?
কেউ কোনো কথা বলে না। বাবা আমার আর দাদার দিকে তাকায়। আমরা চোখ ফিরিয়ে নিই। বিয়ের কথাটা তুলে দিয়ে পাড়ার লোকেরা কখন কেটে পড়েছে !
তারপর বাবা যেন একছুটে বেরিয়ে গেল স্বর্ণগোধিকা শিকার করতে। এবং কী আশ্চর্য বাবা একটি মেয়েকে সঙ্গে করে আনল একি দন। মেয়েটি রোগা। দেখতে ভালোই। বেশ ফর্সা। মেয়েটাকে দেখে প্রায় দাদার সমবয়সী মনে হল। তাকে প্রথম দেখছি, তবু যেন মে ন হল আগে কোথাও দেখেছি। মেয়েটি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল --কী নাম তোমার ?
আমি বললাম -- দীপক। বাবা ডাকে ভূতু বলে।
মেয়েটি বলল --- তোমার দাদা কোথায় ?
আমি বললাম -- বাইরে কোথাও গেছে।
মেয়েটি তবে আমাদের বাড়ির সব খবর জানে। আমার মনে হল বাবা বোধহয় এ্কে বিয়ে করবে বলে এনেছে। সুন্দরর মেয়েটার উপর আমার রাগ হল। বাবার উপর রাগ হল আরও বেশি।
সেদিন বাবাকে আর আমাদের দু-ভাইকে মেয়েটি রান্না করে খাওয়ালো। খুব ভালো করে খেলাম আমরা।
খেতে খেতে বাবা বলল --- তোদের মা বেঁচে থাকতে এমন করে পেটপুরে খেতিস তোরা।
দাদা বলল -- হুঁ।
আমি বললাম -- হুঁ।
বাবা বলল -- কেমন দেখলি মেয়েটাকে ?
দাদা কিছু বলল না।
আমি বললাম -- ভালো
দাদা আমার মুখের দিকে তাকাল।
আমি বাবাকে বললাম --- মেয়েটাকেও আমাদের সঙ্গে খেতে বলো !
বাবা বললল -- ঠিক কথা। ফুলি, তুমিও এসে বসে পড়ো। এসো, আমরা একসঙ্গে খাই।
আমরা গোল হয়ে বসে খাচ্ছিলাম। বাবার পাশে আমি। আমার পাশে দাদা। মেয়েটি এসে বসল দাদার পাশে।
খেতে খেতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বাবা বলল -- ফুলি, তুমি বিয়ে করবে ? মেয়েটি একটু হাসল। তারপর বলল -- হুঁ।
বাবা বলল --- দেখো, পুরো সংসার তোমার উপর। ছেলে দুটোকে মানুষ করতে হবে।
কেমন অবাক লাগছিল আমার। আমার থেকে একটু বড় দাদার বয়সী একটি মেয়ে আমাদের তিনজনের দায়িত্ব নিচ্ছে ? এখন থেকে ওকে তবে মা বলে ডাকতে হবে ? আমি ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটাকে আর একবার দেখলাম।দাদা মুখ গুঁজে ভাত চিবিয়ে যাচ্ছিল। বাবা বেশ খোশমেজাজে।
বাবা মুখ তুলে বলল --- দেখো, ফুলি -- সবদিক ভেবে বলো। বিয়ে করবে তো, তাহলে ?
মেয়েটি বলল -- বললাম তো বিয়ে করব।
আমি ভাবলাম, কী নির্লজ্জ রে বাবা! এইটুকু মেয়ে, নিজেই বলছে বিয়ের কথা ? বাবা একটু উচ্ছ্বসিত মনে হল। বলল -- এই বুড়াটাকে বিয়ে করবে, ফুলি ?
মেয়েটি আঁতকে উঠে বলল -- ইস্, তোমাকে কে বিয়ে করবে শুনি? আমি ওকে বিয়ে করব -- বলে মেয়েটিদাদার দিকে আঙুল তু

ল দেখালো।
কথাটা শুনে আমার তো ভিমরি খাবার জোগাড়। আর দাদা ? সে বেচারা কথাটা শুনে, একটা অশ্লীল কথা বাবার সামনে শুনে ফে লেছে, এমন মুখ করে গোঁজ হয়ে বসে থাকল। মুখের ভাতের দলা গিলতে পারল না। বিষম লেগে একাকার কাণ্ড। বাবা গম্ভীর মু খ উঠতে উঠতে বলল -- তোরা খেয়ে নে।
মেয়েটি দাদাকে বলল -- কী হল তোমার ?
আমি বললাম -- বিষম লেগেছে বোধ হয় !
মেয়েটি বলল -- তুমি একটু জল খাবে ?
দাদা স্পষ্ট গলায় বলল -- না
আমার খুব মজা লাগছিল। মেয়েটাকে আর মা বলতে হবে না। আমি ছোট তো, দাদার অবস্থা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। আমি ভা বলাম, ফুলি মেয়েটা অ্যাতো ভালো যে, সে আমাদের মা হল না। সত্যি, ফুলির মতো মেয়ে হয় না।
পরে সব শুনলাম। মেয়েটি আর কেউ নয়। চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা। সে কালকেতুকে বাদ দিয়ে তার ছেলেকে বিয়ে করল। দাদার বিয়ে হয়ে গেল। আর বাবা ? তার যে কী হল, ফুল্লরার উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর কক্ষনো ফেরেনি। সং সারে আবার আমরা তিনজন হয়ে গেলাম। আমি, দাদা, আর ফুল্লরা থুড়ি,বৌদি।
আমাদের সংসারে দাদা এখন রোজগার করে। জমি জিরেত সামান্যই। সেটুকু চাষ করে। অন্যের বাড়ি খাটতে যায়। ফুল্লরা অন্যের ধান সেদ্ধ করে, মুড়ি ভাজে। এভাবেই কেটে যাচ্ছিল। দাদা মাঝে খালে বিলে মাছ ধরতে যায়। বক ধরে, ডাউক ধরে। সেগুলো বিক্রি করে হাট থেকে তেল আনে, মশলা আনে, বউদির চুড়ি আনে। একটা ছাপা শাড়ি এনেছিল একদিন। সেই ছাপা সাড়ি পরে ফু ল্লরাকে খুব ভালো লাগছিল। ফুল্লরা হাসতে হাসতে দাদাকেবলেছিল -- হ্যাঁ গো, তুমি ভালোই রোজগার করছো, ওকে পড়তে বলো না।
আমি বললাম -- আমি আবার ইস্কুলে যাব ?
ফুল্লরা বলল -- হ্যাঁ, তুমি পড়বে।
দাদা বলল -- যাস তবে আবার ইস্কুলে।
একদিন বিকেলবেলা গা ধুয়ে এসে ফুল্লরা দাদাকে ডাকল। একদম কাছাকাছি চলে আসতে দাদাকে বলল -- একটা ভালো খবর আ ছে।
দাদা বলল -- কী ?
ফুল্লরা বলল -- তুমি বাবা হবে।
দাদা বলল -- অ্যাঁ !
ফুল্লরা বলল -- অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। যাও, মিষ্টি কিনে আনো।
দাদা ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে মিষ্টি কিনে আনল।
আমরা তিনজন মিষ্টি খেতে খেতে গল্প করছি। হঠাৎ দাদা বলল -- আজ বাবা থাকলে কত খুশি হত। বাবা যে এখন কোথায় ?
ফুল্লরা বলল -- কোথায় আবার ? যাত্রা করছে আর ফুল্লরার সঙ্গে প্রেম করছে।
দাদা বলল -- মানে ?
ফুল্লরা বলল -- মানে, আমাকে কম জ্বালিয়েছে ! শেষে তো বিয়ে করবে একদম ঠিক।
আমি বললাম -- বাবাকে বিয়ে করলে না কেন ?
ফুল্লরা বলল -- অভিনয় আর জীবন তো এক নয়। ওই একসঙ্গে অভিনয় করতে করতে একটু ইয়ে হয়। তাই বলে ওই বুড়োটাকে বিয়ে করব নাকি ?
দাদা বলল -- বাবা তোমাকে খুব ভালোবাসত, আমার মতো ?
ফুল্লরা বলল -- খুউব! কী আদর করে ডাকতো ! পান খাওয়াতো ! তোমার থেকে অনেক বেশি ভালোবাসতো। তুমি তো তেমন ভ ালোবাসতে জানোই না।
দাদা বলল -- অ্যাঁ। কী বলছো কি তুমি ? তুমি বাবার সঙ্গে প্রেম করতে ?
ফুল্লরা বলল -- উনি যেন জানেন না ! তোমার সামনেই তো আমাকে বিয়ে করার কথা বলল। শোননি সে কথা ?
মিষ্টি খেতে খেতে আমরা তেতো জগতে ঢুকে পড়লাম। বুঝতে পারছি না দাদার কতটা খারাপ লাগছে। দাদা মুখ ভার করে বসে থ কাল। ফুল্লরা ডাকল-- শুনছো, কী হলো তোমার ?
আমি বললাম -- দাদা ! দাদা, কথা বলছ না কেন ?
দাদা আমার দিকে তাকিয়ে বলল -- ব্যা।
ফুল্লরা বলল -- ভুতু, দেখো না তোমার দাদার কী হলো !

দাদা বলল -- ব্যা।
এবার ফুল্লরার দিকে তাকালো।
ব্যা - ব্যা করতে করতে দাদা আস্ত একটা ছাগল হয়ে গেল। আমি আর ফুল্লরা অনেক বুঝিয়েও তাকে কিছু করতে পারলাম না। ফুল্লরা অনুতপ্ত হল। সে চুল ছিঁড়ল, শাড়ি ছিঁড়ল। মাঝখান থেকে আমার যে আবার ইস্কুলে যাওয়ার কথা উঠছিল তা চাপা পড়ে গেল। ফুল্লরাকে বললাম -- তুমি শাড়ি ছিঁড়ছো কেন ? কে কিনে দেবে আবার ? দাদার তো ওই অবস্থা !
ফুল্লরা বলল -- কেন, তুমি আছো ! তুমি আমার শাড়ি আনবে। সিঁদুর আনবে।
আমি বললাম -- কি মুশকিল ! শাড়ি সিঁদুর কি আমার আনার কথা ?
ফুল্লরা বলল -- কে আনবে তবে ?
আমি বললাম -- কেন, আমার বড় আনবে।
ফুল্লরা দাদাকে বলল -- শুনছো, শুনতে পাচ্ছো সব ?
দাদা বলল -- ব্যা।
ফুল্লরা বলল -- অমন ছাগল যে বর, সে কি আমার সংসারের সব দায়িত্ব নেবে ?
আমিই বললাম -- আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তো !
ফুল্লরা হাসল। তার স্ফীত পেটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল -- আরও একজন আসছে।
দাদা বলল -- ব্যা, ব্যা।
আমি আবার কালকেতু হয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। লুকিয়ে অন্যের পুকুরে মাছ ধরি। অন্যের হাঁস মুরগি মেরে আনি। হাট বাজার করি। আর ফুল্লরার জন্য শাড়ি চুড়ি সব কিনে আনি এক এক করে। আমার কেন ডুরে শাড়ি পরে ফুল্লরা আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। চুল গোটায়। আমাকে খেতে দেয়। দাওয়ায় বসে ছিল দাদা। যে আমাদের দিকে তাকিয়ে ডেকে ওঠে -- ব্যা।
ফুল্লরা বলল -- তুমি কিছু বলছো ?
দাদা বলল -- ব্যা।
আমি বললাম -- ওকে আর বিরক্ত কোরো না। যা করার আমাদেরই করতে হবে। দাদা তো ছাগল হয়ে গেছে।
দাদা ধীরে ধীরে সত্যি ছাগল হয়ে গেল। ঘাস পাতা খায়। ছাগলের মতো কালো ডেলা ডেলা পায়খানা করে। ঘরের মধ্যে পেচ্ছাপ করে দ্যায়। ওকে আমরা বাড়ির বাইরে গোয়ালঘরে রেখে এলাম। গলায় দিলাম ছাগল বাঁধা দড়ি। মুখের কাছে দুর্বা ঘাস। কাঁঠালপাতা। গোয়াল থেকে আমরা দুজন যখন বেরিয়ে এলাম, দাদা বলল -- ব্যা, ব্যা।
ব্যা ব্যা করতে করতে গলায় দড়ি দিয়ে দাদা ছাগলের মতো মারা গেল। আমি আর ফুল্লরা দাদাকে পুড়িয়ে এলাম। ফুল্লরার জন্য একটা সাদা থান কিনে আনলাম। সেই থান পরে ফুল্লরা দাদার শ্রাদ্ধ করতে পসল। পাড়ার লোকজনু সব এসেছে। পুরুতমশাই মন্ত্র পড়াচ্ছেন। হঠাৎ ফুল্লরার সাদা থান রক্তে ভেসে গেল। ফুল্লরা কাতরাচ্ছে। পাড়ার বুড়ি মতো একজন এগিয়ে এসে বলল -- শ্রাদ্ধর কাজ বন্ধ রাখো। বউমার প্রসব যন্ত্রণা উঠেছে।
ধরাধরি করে ওকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। ফুল্লরার বাচ্চা হল। আমি আর ফুল্লরা অবাক হয়ে দেখলাম, বিছানার উপর ছোট্ট একটা গোসাপের বাচ্চা !
আমি বললাম -- ফুল্লরা, এই তোমার ছেলে ?
ফুল্লরা বলল -- তাই তো দেখছি। বাপ মরা - বাচ্চাকে কেমন দেখাচ্ছে দেখো !
আমি বললাম -- কী করবে এখন ?
ফুল্লরা বলল --- তুমিই বলো।
আমি বললাম -- ওকে তো আমরা মানুষ করতে পারব না ! ওকে পুকুরে ছেড়ে দিই চলো। পুকুরের পোকামাকড় খেয়ে ও বড় হবে। মানুষ হবে।
আমি আর ফুল্লরা ওকে খিড়কির ঘাটে ছেড়ে দিতে গেলাম। ফুল্লরা কাঁদতে কাঁদতে ওকে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিল। গোসাপটা কিলবিলিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে গভীর জলে ডুবে গেল। ফুল্লরাকে ডাকলাম -- চলো, উঠে এসো।
আমাকে অবাক করে দিয়ে ফুল্লরা বলল -- মা ছাড়া ও কি বাঁচবে ? -- বলে, নিজেও ঝপাং করে লাফিয়ে পড়ল পুকুরে।
আমি হতভম্ব। ফুল্লরা তার বাচ্চাকে আদর করছে। দুজনে সাঁতার কাটছে। পুকুরের জলে ঠেউ উঠছে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ তাদের দেখলাম। তারপর অনেক ডাকাডাকির পরও ফুল্লরা যখন জল থেকে তার বাচ্চা নিয়ে উঠে এল না, আমি চলে এলাম ঘরে।
অনেকদিন পর বাবা আজ বাড়ি ফিরেছে। বাবা সারা ঘর খুঁজেও আমাকে ছাড়া কাউকে দেখতে না পেয়ে আমাকে দাদার কথা জিজ্ঞস করল।
আমি বললাম -- ব্যা।

বাবা বলল -- ফুল্লরা কোথায় ?

আমি বললাম - ব্যা।

বিরক্ত হয়ে বাবা পুকুরঘাটে পা ধুতে গেল। পুকুরের জলে ফুল্লরা আর তার গোসাপ বাচ্চাকে সাঁতার কাটতে দেখে বাবা চিৎকার করে বলল -- ফুল্লারাকে গোসাপে ধরেছে।

আমি বললাম - ব্যা।

বাবা ঘর থেকে বল্লম নিয়ে এসে ঘাটে ঠায় বসে থাকল। স্বর্ণগোধিকা শিকারের আশায় বাবাকে বসে থাকতে দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম -- ব্যা, ব্যা।

:

বৃত্তের বাইরে চিত্তপ্রসাদ

রতন শিকদার

সময়ের কাজ সময়ে না হওয়াতেই যত গন্ডগোল। ভট্টাচার্য মশাইদের কপালটাই এমন। ওর জীবন - ঘড়িটা লেটে চলেছে বরাবর। তাই প্রতি পদক্ষেপেই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারার জন্য ঠেকতে হয়েছে বরাবর। আর সেই ঠেক খাবার ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এখনও।

বড় ছেলে সত্যপ্রসাদ। সে চাকরিতে থিতু হয়ে বসতে না বসতেই তার বিয়ে দিয়েছিলেন তারক ভট্টাচার্য। বড় ঘরেরমেয়ে এনেছিলেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নাতির মুখ দেখেছিলেন। তার যজমানি আয় উপার্জনের জোড়াতালি দেওয়া সংসারটায় সে সময় বেশ চাকচিক্য। নাতির অন্নপ্রাশন করালেন বেশ জাঁকজমক করে। নাতির অন্নপ্রাশনের ঝক্কি - ঝামেলা মিটে যেতেই বৌমা বেঁকে বসল। তার আর শ্বশুর - শাশুড়ির সংসারটা পছন্দ হচ্ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তারা আলাদা সংসার পাতলো।

বড়ছেলের আলাদা সংসার মানে তারক ভট্টাচার্যের সংসারে মূলধনে ঘাটতি। এক যজমানের থেকে দান সূত্রে পাওয়া বিঘা চারেক জমির ফসলই প্রধান ভরসা। সেই জমিতে এখন পাকা ধান। অসময়ের ঝড়বৃষ্টিতে সে পাকাধানের শীষ এখন প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। লোক লাগিয়ে সে ধান কাটিয়ে ঘরে তুলতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু কে করে এ সবের তদারকি। মেজ ছেলে নিত্যপ্রসাদই এতকাল এ সব দেখাশোনা করত। জমিজমা, ফসল এসব তারই তত্ত্বাবধানে সামলাতেন তারক ভট্টাচার্য। সেই ছেলে গত বছর বি এ পাশ করেছে। তারপর থেকেই তার আর চাষবাসে মন বসে না। এই মুহুর্তে তারক ভট্টাচার্যের ভরসা কেবল ওই ছোট ছেলে চিতু অর্থাৎ চিত্তপ্রসাদের উপরে।
চিত্তপ্রসাদ তার বাবা মায়ের নবম সন্তান। সবে উনিশে পা দিয়েছে। গত ফাল্গুনে। এখানেও একটু সময়ের গোলমাল করে ফেলেছিলেন তারক ভট্টাচার্য। চিতুর যখন জন্ম হয় তখন তিনি পঞ্চান্নর গন্ডিপেরিয়ে গেছেন। ওই বয়সে নবম সন্তানের জনক হয়ে তিনি যে বেশ খুশি হয়েছিলেন তার প্রকাশ তার পুত্রের নামকরণেই বোঝা যায়। তবে খানিক লজ্জাও হয়েছিল তার। তাই কনিষ্ঠ সন্তানের অন্নপ্রাশনে কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। গৃহ দেবতার অন্নপ্রসাদেই চিত্তপ্রসাদ প্রথম অন্নের স্বাদ পেয়েছিল। অসময়ের ফল ফলাদির কদর বেশি। চিতুর প্রতি সত্যপ্রসাদের বিশেষ টান। প্রত্যাশাও অনেক। ওর বিশ্বাস সে অন্য দুটোর মত হবে না। তার বোঝাটা চিত্তপ্রসাদ নিশ্চয়ই একদিন কাঁধে তুলে নেবে।

চিত্তপ্রসাদ এখন কলেজে পড়ছে। তার অনেক পড়ার ইচ্ছা। পড়াশুনা করে বিদ্বান হয়ে সে মাস্টারি করবে। বাপ - দাদার সাথে জমিজিরেতে টুকটাক কাজ সে সব সময়ই করেছে। তবে এ সবে তার উৎসাহ বিশেষ নেই। বাবার অবাধ্য হতে সে পারে না। তাই ভাল না লাগলেও ওসব কাজে সে হাত লাগায়।। ভট্টাচার্য মশায় এসব বোঝেন। তবুও ভাবেন যজমানির কাজটা তো ধরতে পারে চিতু। তাতেও তো বুড়ো বাপটার খানিকটা সুরাহা হয়। ছেলেবেলায় সেঅবশ্য জেদ ধরত বাবার সাথে যজমানি বাড়ি যাওয়ার। গাইঘাটার সরকারের বাড়িতে। সে ওই বছরে, একবার, দুর্গাপূজার সময়ে। তার বাবা যখন ছোড়দাকে নিয়ে পূজার্চনায় ব্যস্ত থাকতেন, সে তখন ও বাড়ির ছেলেমেয়েদের সাথে মাঠেঘাটে, বনে-বাদাড়ে নদীর পাড়ে, কাশের বনে ঘুরে বেড়াত। পূজার আকর্ষণ তার কাছে গৌণ। তবুও সে যেত, কারণ নতুন জায়গা, নতুন সাঙ্গী- সাথি। সব মিলিয়ে শুধুই মজা আর মজা।

ছোটবেলা বেলা থেকে চিতু কেমন যেন উদাস প্রকৃতির। ছেলেবেলায় ওর বয়সী আর সবাই যখন গোল্লাছুট, দাড়িয়া বন্দা ইত্যাদি খেলায় মেতে থাকত, চিতু তখন একা একা পুকুর পাড়ে বসে জল ফড়িং -এর সাঁতার কাটা দেখত। জলের মধ্যে বুড় বুড়ি কাটা দেখ ও চিনত কোনটা মাছ আর কোনটা কাঁকড়ার বুড়বুড়ি। পুকুরের ওই পাড়ে কলাগাছের মাথায় যখন অস্তগামী সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়ত চিতু তখন আনমনে সে রঙের খেলায় মেতে থাকত। ওর মনে প্রশ্ন উঠতে রোজ রোজ সূর্যটা ডুবে যাবার আগে অম ন নতুন নতুন শোভা সৃষ্টি হয় কী করে। ওর উদাসী মন এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াত।

চিত্তপ্রসাদ যখন প্রাইমারিতে পড়ে তখন তার সবচেয়ে প্রিয় ঠাকুর রবি ঠাকুর। পঁচিশে বৈশাখ রবি ঠাকুরের ছবিতে মালা দিয়ে সা জাত। আর এসব ব্যাপারে তাকে সব চাইতে বেশি উৎসাহ যোগাত তার ছোড়দি। ছোড়দি ঝুমুর তার থেকে বছর দুয়েক বড়। কিন্তু হাবেভাবে চিরদিনই যেন পাকাবুড়ি। প্রতিপদে চিতুকে আগলে রাখা, শাসন করা সব দায় যেন তারই। এই উনিশ বছর বয়সের চি তুকেও সে সব বিষয়ে পরামর্শ দেবে। আর চিতুও তার ছোড়দি অন্তপ্রাণ। বাবা ছোড়দির জন্য পাত্র খুঁজছেন। ছোড়দির বিয়ে হয়ে গেলে চিতু একা হয়ে যাবে।

বাবার মতে সায় দিয়ে চিত্তপ্রসাদ ইদানিং একটু একটু যজমানির কাজ করছে। তবে এসবেতে তার মন বসে না। এ সব পূজাপাঠে ত ার মন ঠিক সায় দেয় না। বেশ কয়েকবার চিতুর মা তাকে দিয়ে গৃহদেবতা নারায়ণের সেবা করাতে গিয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছেন । একবার তো চিতু তার মাকে বলেই দিল, 'তোমার নারায়ণ শিলার ক্ষিদে তেষ্টা লাগে কী করে বুঝি না বাবা। তোমার ঠাকুর যদি সাতদিন একনাগাড়ে ফুল- বেলপাতা নাও পান তবে কেঁদে কঁকিয়ে তোমাকে জানান দেবেন না, বুঝলে?' তার মা এ কথার কী উ ত্তর দেবেন বুঝে পান নি। শুধু বলেছেন, 'বাবা, তুই বামনের ছেলে। পূজাআর্চা তো তোকে মানতেই হবে। লোকে তো তোর বাবাকে দিয়ে তাদের দেবতার পূজা করিয়ে শান্তি পায়। তার তাদের এই পূজাআর্চা আছে বলেই না আমাদের সবার খাওয়া-পরা, তোর লেখাপড়া এ সবেরই যোগান কষ্টেসৃষ্টে হয়ে যাচ্ছে।' কথাগুলো শুনতে সেদিন চিতুর ভাল লাগেনি। কিন্তু প্রতিবাদও সে করতে প ারে নি। যা নিদারুণ সত্য তাকে সে অস্বীকার করে কী করে। সে তো জানে তার দাদা আলাদা সংসার পাতবার পর মাস গেলে নগ দ পয়সার অভাবটা কেমন বোধ হচ্ছে। এ সব রূঢ় সত্য সে তো খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করছে।

এক বছরও হয় নি চিতুর পূজার কাজে হাতেখড়ি হয়েছে। গতবছর দুর্গাপূজায়, গাইঘাটার সরকার বাড়িতে। সে তার বাবার সহক ারী হয়ে কাজ করেছে সেখানে। প্রণামীর থালায় যা টাকা পয়সা পড়েছিল তার সবই তারক ভট্টাচার্য তার ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, ওগুলো ঠাকুরের দান। ও সব তোমারই প্রাপ্য। ও দিয়ে তুমি তোমার কলেজের পড়াশুনার খরচ চালিও। তার পর লক্ষীপূজা, কালীপূজা, কার্তিক পূজা এ সব তো গৃহস্থ বাড়িতে লেগেই আছে। কটা পূজা করলে তোমার সারা বছরের খরচ তু মি নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে।'

চিতু ভাবে, সত্যিই তাই। তার কলেজের বইপত্র, যাতায়াতের খরচ - অনেক টাকার দরকার। আর কোনও উপায় নেই বলে তার ব াবাও এই বৃদ্ধ বয়সে যজমানির কাজ করেন। কিন্তু সে তো নিজের মন থেকে সাড়া পায় না --এ যজমানির কাজে তা সত্ত্বেও সে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছে এই যজমানির গন্ডির মধ্যে। যজমানিকে পেশা করে অর্থ উপার্জন করতে হচ্ছে। সে তো বাধ্য হয়েই এক ধর ণের অভিনয় করে চলেছে। ধুতি পরে, নামাবলী গায়ে চড়িয়ে সে যাকরছে তা তো নাটকের চরিত্রাভিনয় ছাড়া কিছু নয়। সে কি ও ভাবে ও অন্যকে নিরন্তর ঠকিয়ে যাচ্ছে না। এক একটা রঙ্গমঞ্চ। এক এক পূজার এক এক রকম মন্ত্রোচ্চারণ। এ সবই পেশাদার অ ভিনেতার মত পরিবেশ পরিস্থিতি নাটকের চরিত্র প্রভৃতির সাথে মিলিয়ে দর্শকের চাহিদা মত অভিনয় করে যাওয়া। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করবে কীভাবে? তার পূজাকর্মে তো গৃহস্থরা বেশ খুশি হন বলেই মনে হয়। তারা বলে, 'বড় ঠাকুরও আজকাল এমন সু ন্দর করেপূজাপাঠ করতে পারেন না।' চিতু ভাবে অন্যরকম। তার বাবা হয়ত ইচ্ছা করেই এমন করেন। উনি হয়ত ধীরে ধীরে চিতু কে তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চান। যজমানরা স্তুতি করে তার। চিতু লজ্জা পায়। ওর গৌরবর্ণ মুখমন্ডলে লজ্জার লালিমা আঁকা হয়ে যায়। মাটির দিকে তাকিয়ে প্রণামীর থালা থেকে টাকা পয়সা তুলে নিয়ে দ্রুত কোমরের ধুতির খুঁটে গুঁজে ফেলে একছুটে বেরিয়ে আসে যজমানের বাড়ি থেকে। সে নিজের হাতে গামছায় বেঁধে ভোজ্য সামগ্রী বাড়ি বয়ে আনতে পারে না। চি তুর লজ্জা লাগে। চিতু ওই বৃত্তের গন্ডির মধ্যে বাঁধা পড়তে চায় না।

এখন বড়দিনের ছুটি চলছে চিতুর কলেজে। বাড়িতে তার এখন কত কাজ। শ্যামলীর বাচচা হয়েছে। এবার শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। চিতু তার এই ছোট্ট জীবনে এমন শীত দেখেনি কোনদিন। কদিন আগের ঝড়ে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। গোয়াল ঘরের বেড়াটা এক জায়গায় ভেঙ্গে পড়েছে। বেড়ার ওই ফাঁকটা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকে গোয়াল ঘরের অবলা জীবগুলোকে খুবই কষ্ট দিচ্ছে। চি তু অনুভব করতে পারে শ্যামলীর ওই বাছুরটার কী কষ্টই না হচ্ছে। ও সারাটা সকাল লেগে রইল গোয়াল ঘরের বেড়া মেরামতি

ত। নিজের হাতে একটা ছেঁড়া বস্তা টাঙ্গিয়ে শেষ পর্যন্ত বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া আসা আটকাবার ব্যবস্থা করল সে। এ সব কাজে তার দারুণ উৎসাহ। কারওআদেশ-নির্দেশের অপেক্ষা করে নি সে। ও দিকে উঠানের শিউলি গাছটার একটা ডাল ভেঙ্গে প ড়ছে। গাছটার ওই বিশ্রী ক্ষতটাকে সে সুন্দরভাবে ছেঁটে পরিচর্যা করেছে। এই শিউলি গাছটার পরিচর্যা করতে গিয়ে ওর শরৎকা লের কথা মনে পড়ে। প্রতিবছর শরতের আগমন আর সবার মত সেও টের পায় ওই গাছটায় ফুল ফুটতে দেখে। পুরো চত্বরটা ফু লের গন্ধে মেতে ওঠে। ওই ফুলের গন্ধেও কেমন যেন উদাস হয়ে যায়, বুকের ঠিক মাঝখানটায় মোচড় দিয়ে ওঠে। ব্যথায় যেন টন টন করে। একটু বড় হবার পর থেকে প্রতিবছর ঠিক ওই সময় সেই ব্যথাটা ও অনুভব করে। কারণটা যে কী তা সে নিজেও ঠিক বু ঝে উঠতে পারে না। তবে এই অনুভূতিটা আর একটা অনুভূতির জন্ম দেয়। ত া হল শীতের আগমনের জানান দেওয়া একটা অনু ভূতি। শীত মানেই বিষন্ন বিকাল। শীত মানেই প্রকৃতির রুক্ষতা। সব গাছগাছালি অনাবশ্যক শারীরিক মেদের মত পাতা ঝরিয়ে নি র্বকল্প সন্ন্যাসীদের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রকৃতির ওই শুষ্কতা চিতুর মনের গভীরে কেমন একটা আর্দ্রভাব সৃষ্টি করে আর চিতু খুব কষ্ট বোধ করে।

গত রাতেও এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। ঠান্ডার কামড়টা বেশ জোর। চিতুদের বাড়ির চারপাশের গাছপালা ভেদ করে ভোরের সূর্যের আলো এসে পৌঁছায় নি এখনও। উত্তর ভিটের ঘরটাতে পৌঁছায় আরও পরে। ওই ঘরটায় চিতু শোয়। বড়দা বাড়ি ছেড়ে যাবার পর ঘরটা তার দখলে এসেছে। সাবালক চিতু এখন আলাদা একটা ঘরে থাকে। একাঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে সে শুয়ে আছে। চিতু পা শ ফিরে শুল। জানালা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে তাও যে ওর ঘুমেরকোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে। বাদ সাধল তার ছোড়দি। পা ি টপে টিপে ঘরে ঢুকে মাথার ওপর থেকে লেপটা সরিয়েদিল। তারপর ডান হাতে করে আঙ্গুল দিয়ে ওর গোঁফের হালকা রেখাটার ওপর সুড়সুড়ি দিতে লাগল। চোখ না খুলেও চিতু বুঝতে পারে এ তার ছোড়দির কাজ। ছোড়দির হাতটা জোর করে সরিয়ে দিয়ে শামুকের খোলের মধ্যে চটকরে ঢোকার মত লেপের নীচে নিজেকে গুটিয়ে ফেলল। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। এবারে ঝুমুর গলাছেড়ে ডাকে, 'চিতু উঠে পড় এক্ষুনি। তোর না আজ বাবার সাথে যাবার কথা। বাবা কখন উঠে পড়েছেন। ওঠ্, ওঠবলছি। আ র দেরি করলে বাবা খুব রেগে যাবেন কিন্তু।'

অগত্যা চিতুকে উঠতেই হয়। একে শীতে বিছানা ছাড়বার কষ্ট। তার ওপর আবার সেই বিরক্তিকর অভিনয় করতে যেতে হবে বাব ার সাথে, নীলগঞ্জে। শ্রাদ্ধের কাজ। সে কোনওদিন শ্রাদ্ধের কাজ করেনি। সে না কী ভারি কঠিন কাজ। তবে রক্ষে এই যে তাকে শু ধু গীতা পাঠ করতে হবে। খুব সুন্দর করে। শুদ্ধ উচচারণ করে।

খুব জাঁকজমক করে ষোড়শোপচারে শ্রাদ্ধের আয়োজন। চিতু তার বাবার নিষ্ঠাসহকারে শ্রাদ্ধকর্মের ক্রিয়াকলাপ দেখতে দেখতে ক্লা ন্ত হয়ে পড়ে। দুপুর গড়িয়ে যাবার পর তার গীতাপাঠ শুরু হয়। সকাল থেকে উপোসী। চোখমুখতার শুকিয়ে এসেছে। তবে এরই মধ্যে মৃতার এক কন্যা তাকে বার দু'য়েক সরবৎ খাইয়ে গেছেন। প্রায় জোর করেই। মহিলাটি ঠিক ওর বড়দির মত। স্নেহের ডাকে এমন আপন করে নিয়েছেন যে ভাল না লাগলেও তার কথা চিতু ফেলতে পারেনি। চিতু অষ্টাদশ অধ্যায়টি যখন পাঠ শেষ করল ত খন বেলা বাজে দুটো। এতক্ষন পাঠে এত মগ্ন ছিল যে শ্রোতাদের দিকে চোখ ফেরাবার কোনও অবকাশ পায়নি। পাঠ শেষে প্রণাম ে সরে গীতাখানা জলচৌকির ওপর রেখে চিত্তপ্রসাদ এবার চারপাশে তার দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে নেয়। ওর নজর পড়ে ওই বড়দির মত ম হিলাটির দিকে। তার চোখ দুটি চিক চিক করছে। অন্যান্য পুরুষ ও মহিলারাও যেন তার গীতাপাঠে মুগ্ধ হয়ে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। চিতু ভাবে তার চরিত্রাভিনয় নিশ্চয়ই সার্থক। সবাই নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত। সবাই যদি তৃপ্ত হয় তবে সেও খুশি।মনে মনে চি তু বোধহয় মৃতার আত্মারও শান্তি কামনা করে।

ওই বড়দির মত মহিলাটি সবার আগে কথা বলেন, 'বাবা জানি তুমি খুব ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তবুও তোমাকে একটা অনুরোধ করব সবার তরফে। আমরা সবাই খুশি হব যদি তুমি আরও একটু কষ্ট কর আমাদের জন্য। তুমি সহজ ভাষায় গীতা মাহ াত্ম্য একবার আমাদের শোনাও। তোমার গীতাপাঠ অপূর্ব হয়েছে।'

এবার চিতু লজ্জায় পড়ে। ওর শুকনো মুখখানাতে একটু লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে। আড়চোখে সে বাবার দিকে তকায়। তার বাব ার চোখমুখ উজ্জ্বল। ছেলের প্রশংসা শুনে তিনি নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত। বোধ হয় খানিক নিশ্চিন্তও । আত্মতৃপ্তি ওকে পেয়ে বসে। ি চতু তার সত্যিকারের উত্তরাধিকারী হতে চলেছে। ছেলে বুঝি তার সম্মতি চায় তিনি বলেন, 'তুমি তো একাজে অপাবগ নও। তুমি তো সম্পূর্ণ শিক্ষণপ্রাপ্ত। তোম অধীত বিদ্যাপ্রয়োগের এই তো উপযুক্ত ক্ষণ। তবে আর দ্বিধা কেন? তোমা আশুকর্তব্য এদেরকে খুি শ করা। এদের তৃপ্তি মানে মৃতার আত্মার শান্তি।'

চিত্তপ্রসাদ আর কালক্ষেপ করে না। সহজ সরল বাংলায় গীতা মাহাত্ম্য বলে যেতে শুরু করল। ওর সামনে রাখা থালাটা গীতাপাঠ শ্রোতাদের দেওয়া দক্ষিণায় ভরে উঠল। পাঠ শেষে মহিলা ওকে দোতালায় ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের মেঝেতে আসন পাতা। তার সামনে পাথরের থালায় একরাশ লুচি তরকারি আর এক থালায় দই মিষ্টি। বললেন,'তুমি সকাল থেকে উপোসী রয়েছ, এবার খেয়ে নাও। আমার দাদারা তোমার বাবার যত্নঅত্তি করছেন।'

চিতু খাওয়া শুরু করে। মহিলা সামনে বসে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকনে। মাঝে মধ্যে রেডিও'র অনুষ্ঠানের মাঝে ঢুকিয়ে দেওয়া ফিলারের মত টুকরো টুকরো কথা। চিতু খাওয়া সেরে উঠতেই হাত ধোওয়ার জল এগিয়ে দেন তিনি। চিতু সঙ্কোচে একেবারে গুটিয়ে যায়। বলে, 'আপনি আমার বড়দির মত। বয়সে আমার থেকে অনেক বড়। আমাকে পাপের ভাগী করবেন না। অমন করে সেবা করলে যে আমার পাপ হবে।'

মহিলাটি হেসে ফেললেন। বললেন, 'পাপপুণ্য তো যার যার নিজের মনের কাছে। একটু আগে গীতা মাহাত্ম্য শোনাতে গিয়ে তুমি বললে, শ্রদ্ধাসহকারে অসূয়াবিহীন হয়ে যে গীতাপাঠ শ্রবণ করে সে শুভলোক প্রাপ্ত হয়। তবে কী জান ভাই, আমি এই ইহলোকেই বিশ্বাস করি। আমার মায়ের শ্রাদ্ধে এত জাঁকজমক হল। দাদারা কত খরচাপাতি করল। কিন্তু মা বেঁচে থাকতে এরা তাঁর সুখ শান্তির জন্য কী করেছে তা আমি জানি। এখন এসবে কী হবে? মার আত্মা শান্তি পাবে? বেঁচে থাকতে তো শান্তি পায়নি। এটাই তো বাস্তব সত্য, তাই না ?'

এ সবের উত্তর চিত্তপ্রসাদের অজানা। তারর মনেও তো একই দ্বন্দ্ব । মন থেকে সায় না থাকলেও সে তো তার বাবার আজ্ঞামত পূজাপাঠের কাজ করছে। আর তার ফলেই তার বাবার কষ্ট তো খানিকটা লাঘব হচ্ছে। তার কাছে এ সব যজমানির কাজ নিছক অভিনয়ের মত লাগে নিশ্চয়, তবে এর একটা বাস্তব ফল তো সে পাচ্ছে প্রতি পদে। এই পাওয়ার মধ্যে তো কোনও মিথ্যা নেই। সবটাই তো বস্তুভিত্তিক। এর মধ্যে তো কোন অনুভবের ব্যাপার নেই। সবই তো সে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ করছে।

বেলা পড়ে এল। তারক ভট্টাচার্য তার পুত্রকে নিয়ে পথে নামলেন। শ্রাদ্ধের বিপুল দান সামগ্রী ওরা পরে সময় করে তার বাড়ি পৌঁছে দেবেন। চিত্তপ্রসাদ আর তার বাবা দুজনের কাঁধেই দুটো ঝুলি। চিতুর কাঁধের ঝুলিটা একটু বেশি ভারি। চিতু এমনিতেই তার বাবার সাথে খুব কম কথা বলে। আজ যেন সে একটু বেশি গম্ভীর, পশ্চিম আকাশে হঠাৎ উঠে আসা বিশাল কালো মেঘটার মত। মনে হচ্ছে একটু পরেই আকাশটা বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। এক পশলা জোর বৃষ্টি হবে। ওদের দুজনের পায়ে প্রায় ছুটে চলার গতি। বিশাল একটা প্রান্তর সামনে। এই প্রান্তরটা তাদের অতিক্রম করতে হবে। বৃষ্টি আসন্ন। বৃষ্টির আগেই ওই প্রান্তর পেরিয়ে স্টেশনে পৌঁছতে হবে ওদের। ওই স্টেশন থেকেও প্রায় কুড়ি মাইলের পথ ওদের বাড়ি।

তারক ভট্টাচার্যের মাথায় আরেক চিন্তা। এই অসময়ের বারবার বৃষ্টিতে ক্ষেতের ফসলগুলো নষ্ট হলে সারা বছর তার জের চলবে। এ সব বাস্তব সত্য -- চিত্তপ্রসাদ খুব ভাল করেই বোঝে। তার মনেও এ সব ভাবনা একের পর এক সার বেঁধে আসতে থাকে। তার মা এতক্ষুণ তুলসিতলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। আসন্ন ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কায় সন্ধ্যা নামবার একটু আগেই আজ প্রদীপ জ্বলছে। তারপর মা আর ছোড়দি নিশ্চয়ই তাদের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়পথ চেয়ে বসে আছে। অনেক আশা নিয়ে বসে আছে। বড়লোক যজমানের বাড়ির কাজ। দান সামগ্রীও নিশ্চয়ই অনেক পাওয়া গিয়েছে। ছোট ছবিগুলোতে রং-এর বড় অভাব। এখন মেঘটার রং খানিকটা ধূসর হয়ে এসেছে। ওই ধূসর মলিন রং চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবিগুলোতে।

বিশাল প্রান্তরের রং সবুজ। তার মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ বেয়ে চলেছে চিত্তপ্রসাদ আর তার বাবা। পথটা যেন অনেক, দীর্ঘ মনে হয় চিত্তপ্রসাদের দূরদিগন্তে এক বলয় রেখে ওই ঝুলিটা ও বইতে পারে না। ওটাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে চিত্তপ্রসাদ দৌড়তে থাকে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারক ভট্টাচার্য ওকে ধরে ফেলেন। ওকে জাপটে ধরেন। পথের মধ্যে ফেলে আসা ঝুলিটা আবার ওর কাঁধে চাপিয়ে দেন। চারিদিকে কেমন একটা যেন আঁধার নেমে এল আস্তে আস্তে। চিত্তপ্রসাদ হাঁটছে। সামনে তারক ভট্টাচার্য। দু'টি মানুষ হাঁটছে একটু আগে একটু পিছে।

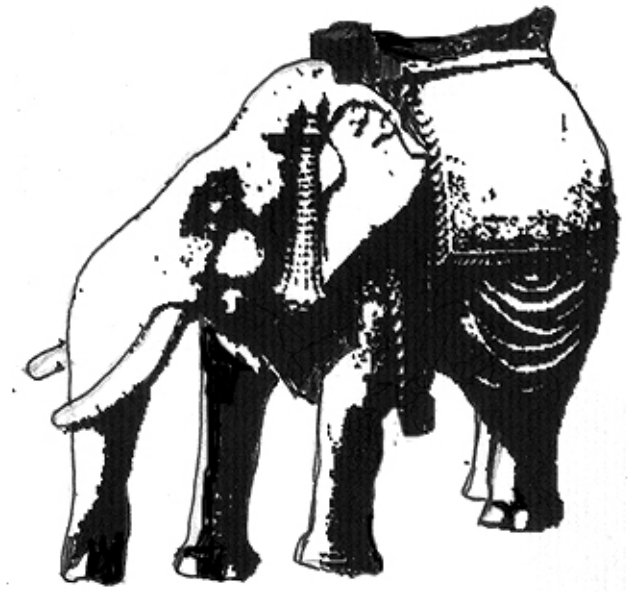

শ্বেত পাথরের ঘোড়া

রতন শিকদার

আমাদের বাড়িতে একটা সেগুন কাঠের আলমারি আছে। আলমারিটা অনেক পুরোনো, বাবার আমলের। আলমারির দরজার পাল্লায় কাঁচ। সেই কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকালেই নজরে পড়ে একটা শ্বেত পাথরের ঘোড়া। আমার মনে পড়ে আমি ছোটবেলা থেকেই ওই ঘোড়াটাকে দেখে আসছি, কাঁচের ভেতর দিয়ে। ওটাকে দেখতে আমার খুব ভাল লাগত। এখনও লাগে। ওর ওই বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে আমার নিজেরও কেমন বেশ বীর ভাব মনে জাগে । তবে ওর চেহারাটায় ছিল বেশ একটা শান্ত ভাব। মাঝে মাঝে আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমার মনে হত ও যদি পক্ষিরাজ ঘোড়া হত, তবে ওর পিঠে চড়ে আমি আকাশের বুকে ঘুরে বেড়াতাম। তারপর তেপান্তরের মাঠে পাড়ি জমাতাম ওর পিঠে চড়ে। তেপান্তরের মাঠ কোথায় আমি জানি না। ভাবতাম, বড় হয়ে আমি তেপান্তরের মাঠ খুঁজে বের করব। কিন্তু পারিনি। ভাবি, পারিনি তো ভালই হয়েছে। আমার সাধের শ্বেত পাথরের ঘোড়া হয়তো তেপান্তরের মাঠে গিয়ে মুক্তির আনন্দে হারিয়ে যেত । হয়ত কোনদিন আর ফিরে আসত না আমাদের ওই পুরোনো আলমারির মধ্যে । আর তা যদি হত, তবে সে হত আমার পক্ষে অসহনীয়। কারণ, ওই শ্বেত পাথরের ঘোড়া আমাকে স্বপ্ন দেখায় । ওই ঘোড়া আমাকে শৈশবে নিয়ে যায়। আমাকে একাত্ম হতে সাহায্য করে, আমার মধুর অতীতের সাথে। বার্ধক্য পৌঁছেও আমার ঘোড়াটাকে দেখতে তাই দারুণ ভালো লাগে।

:

আমি নাকি জন্মেছিলাম এক কুয়াশা-ঘন শীতের রাতে। মা বলতেন, 'তোকে আনতে গিয়ে আমি নিজে যেতে বসেছিলাম। মা অন্নপূর্ণার দয়াতে তুই আমি দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।' ওই অন্নপূর্ণার প্রসাদে আমার অন্নপ্রাশন হয়েছিল। আমাদের পাশের বাড়ির ফুলি মাসীমা অন্নপ্রাশনের দিন ওই শ্বেতপাথরের ঘোড়াটা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। ফুলি মাসীমা মাকে বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে যা দুরন্ত, ওই ঘোড়াটাকে আস্ত রাখলে হয়!' মা কী মনে করেছিলেন জানি না, তবে সেই আঙ্গুল প্রমাণ ঘোড়া আমাদের সামনে রাখলেই আমি নাকি শান্ত হয়ে যেতাম । এমন কী আমি কখনও কাঁদতে থাকলে, ওই ঘোড়া আমার হাতে দিলে আমি কান্না বন্ধ করে চুপটি করে ওকে নিয়ে খেলা করতাম। অন্য সময় ওই ঘোড়া আলমারিতে কাঁচের আড়ালে রেখে দিতেন মা। বাবা চাকরিসূত্রে অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে যখন এখানে এসে থিতু হলেন, তখন খাট, আলমারি, বিছানাপত্র, দামি দামি বাসন-কোসনের সাথে ওই-শ্বেতপাথরের ঘোড়াও অক্ষতভাবে এসে পৌঁছেছিল। আর তখন থেকেই তার স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গিয়েছিল ওই আলমারির কাঁচের আড়ালে ।

:

উত্তরাধিকার সূত্রে আমি এখন এ বাড়ির মালিক। এ বাড়ির নাম বাবা আমাদের বংশ পরিচয়ের ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য রেখেছিলেন 'রায় ভিলা' । বাড়ির ফটকে ডান দিকের পিলারে সাদা পাথরের উপর কালো হরফে সেই নাম এখনও জ্বল জ্বল করে। এ বাড়ির বয়স হল পঞ্চাশের ওপর । গেটের বাঁ দিকের পিলারে ছিল লেটার বক্সের গায়ে সাঁটা প্লাস্টিকের বোর্ডের ওপর গৃহকর্তার নাম। বাড়ির মালিক আমি হলেও বাড়ির কর্তা এখন আমার ছেলে। তাই সরিৎশেখর রায়ের নেম প্লেটটা উটে গিয়ে সে জায়গায় বসেছে অরুণাভ রায়, অর্থাৎ বাড়ির বর্তমান কর্তার নেম প্লেট । এ বাড়িতে থেকেই বাবার চাকরি শেষ হল। আমার চাকরির শু

রু হল এবং সময়ের আগেই শেষ হল। মুক্ত--বানিজ্য বাতাস অস্থির করে তুলেছিল আমার কর্মস্থল। তাই স্বেচ্ছাবসরে আমার চাকরির অবসান ঘটেছে আগেই। আমি এখন বাতিলের পর্যায়ে । তাই অরুণাভ অর্থাৎ আমার একমাত্র সন্তানই এখন 'রায় ভিলা'র চালিকাশক্তি। অরুণাভের চাকরি শুরু হয়েছে সে-ও বছর দশেক হল। অরুণাভ বলেছিল, 'এই পুরোনো আমলের বাড়িতে খোল- নলচে বদলে না নিলে আর বাস করা যাবে না।' তার চাকরি পাওয়ার সাড়ে তিন বছরের মাথায় বাড়ির রূপপরিবর্তন শুরু হয়েছিল । পুরোনো বাড়ির নড়বড়ে কাঠামোটাকে শক্তপোক্ত করতে কংক্রিটের পিলারে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলা হয়েছিল বাড়িটাকে, ঠাকুর ঘর চালান হয়ে গেল তিনতলার চিলে কোঠায় । একতলায় এক কোণে নিরিবিলিতে পড়ে থাকা ঠাকুরঘরের স্থান হল হাঁটুভাঙ্গা উচ্চতায়। পুরোনো ঠাকুর ঘরের শান বাঁধানো মেঝের বদলে ছেলে মায়ের ঘরের মেঝে বানিয়ে দিল জয়পুরের পাথর দিয়ে। দেওয়ালে লাগিয়ে দিল ঠাকুর-দেবতার ছবিওয়ালা সিরামিকের টালি। চিলে কোঠার ছোট্ট জানালায় মুখোমুখি সামনের বাড়ির উনিশ বছর বয়সি ছেলেটার সঙ্গীতচর্চার ঘর। দুই বাড়ির মধ্যে বারো ফুট চওড়া রাস্তার ব্যবধান । সকাল থেকে রাত অবধি ওই ঘরে চলে দলবল নিয়ে সঙ্গীতের মহড়া। পপ্ গানের সহযোগী কী বোর্ড, ড্রাম আর গিটার । আমার স্ত্রীর পূজার ঘরে ধ্যান করে ঘন্টার পরঘন্টা কাটানোর প্রাচীন অভ্যাসটা স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হয়।

:

আমার একমাত্র সন্তান অরুণাভ তার মায়ের সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যে নিবেদিত-প্রাণ। প্রথমে গৃহসংস্কার, তারপর এক এক করে নিয়ে এল জীবনযাত্রার মান উন্নত করবার সব অত্যাধুনিক সাজ - সরঞ্জাম। সাদাকালো টিভি চলে গিয়ে এল রঙীন টিভি। কাপড়কাচা মেশিন, মাইক্রোওভেন আরও সব জিনিস আসতেই লাগল। ছেলে মাকে বলল, 'মা, নতুন যুগের সাথে নিজেকে মানিয়ে নাও। এ সব জিনিস এখন জীবনের অঙ্গ।' আমার স্ত্রী উত্তর দিয়েছিল, 'বাবা, আমাদের তো দিন শেষ হয়েই এল। আমাদের কি এখন আর আধুনিক হওয়া সাজে? তোরা এ যুগের ছেলে, তোদের আধুনিক বৌ এসে এ সব সামলাবে।' ছেলে চুপ করে মেনে নেয়নি তার মার কথা। বলেছিল, 'কিন্তু মা, তুমিই তো আমাকে আধুনিক চিন্তাভাবনায় বড় করে তুলেছ। তোমাদের সময় যা ছিল আধুনিক, এমন তাই পুরাতন। আবার আজ যাকে তুমি বলছ আধুনিক আগামীতে তাই তো হয়ে যাবে বাতিল। তাই পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে থাকলে তো চলবে না।'

:

আমার ছেলে আধুনিকমনস্ক হলেও পুরাতন মূল্যবোধ তার হারিয়ে যায়নি। এসব কয়েক বছর আগের কথা। এরই মধ্যে আমার ছেলের আধুনিকা স্ত্রী ঘরে এসেছে। আরও কয়েক প্রস্থ তার পছন্দের নূতন নূতন জিনিস বাড়িতে এসেছে। কয়েক বছরের দুরত্বে বসে আজ মা ও ছেলের সেদিনের কথোপকথনের বিষয়ে ভাবি আস্তে আস্তে সব কেমন মেনে নিচ্ছি। অর্থের বিনিময়ে জীবনযাত্রার মান কেমন বদলে যাচ্ছে। অর্থের প্রভাবে নির্ধারিত হচ্ছে ব্যক্তির মান। অন্যদিকে আমার মত পূর্ণ কর্মক্ষম কত লোক বেকার হয়ে যাচ্ছ। ক্রমহ্রাসমান মূল্যের কয়েক লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে তারা একটা উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পঙ্গু হয়ে বসে থাকছে। আমার অরুণাভ এসব অনুভব করতে পারে। সেওতো আমারই মত ওই শান্ত পুরোনো শ্বেত পাথরের ঘোড়াটাকে এখনও ভালবাসে । আমি এত অস্থিরতার মধ্যে যখন আমার পৈতৃক সূত্রে পাওয়া আলমারির কাঁচের পাল্লার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখতে পাই অর্ধশতাব্দীর ওপর ধীর- স্থির ভাবে দঁড়িয়ে থাকা আমার শ্বেতপাথরের ঘোড়াটাকে। আমার মন হয়ে ওঠে প্রশান্ত। আমি মৌন হয়ে যাই।

:

আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি বোধ হয় আমার অতীতের শান্ত সমুদ্রে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। মায়ের কথা ভীষণভাবে মনে পড়তে লাগল। মা বলতেন ওই আড়াই-তিন বছর বয়সে দৌরাত্ম্যে নাকি নিজেদের বাড়ির লোকই শুধু নয়, পাড়াপড়শিরাও সবাই অস্থির হয়ে উঠত। আমার মা তখন আমাকে বশে আনতে আমার হাতে শ্বেতপাথরের ঘোড়া তুলে দিতেন। ফুলি মাসিমার কথা মনে পড়ে গেল। ছোট্টখাটো চেহারার ফর্সা রং, সাদা শাড়ি পরা শান্ত, লক্ষ্মী প্রতিমার মত মুখের গড়ন। আসলে তার দেওয়া ওই শান্ত চেহারার শ্বেতপাথরের ঘোড়াটার সাথে তার নিজের ভাব-স্বভাবকে আমি একাত্ম করে নিয়েছিলাম। আমাদের নেত্রকোণার বাড়ির সামনে একটী নদী ছিল। ফুলি মাসিমার মত এ নদীও আমাদের দাদা-দিদিদের গল্পের মধ্যে দিয়েই আমার স্মৃতিতে জেগে রয়েছে। আমার বড়দি বলত যে নদী নাকি শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা সব সময়ই থাকত শান্ত। এ কথা আমার বিশ্বাস করতে কেমন যেন কষ্ট হত। ভাবতাম, বর্ষার নদী আবার শান্ত হয় নাকি ? তবে মানুষ যেমন বার্ধক্যে শান্ত হয়ে যায়, আমাদের বাড়ির সামনের নদীটাও বোধ হয় বয়সের ভারে শীর্ণ এবং শান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ যখন সমগ্র পৃথিবী অশান্ত হয়ে উঠেছে তখন সেই নদী কী তেমন শান্তই রয়ে গিয়েছে ?

:

এসব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে যাই। ভাবি আমার নিজের চারপাশের পরিবেশের কথা, পরিজনের কথা. আমি আমার নিজের কথা ভাবি । আমি বরাবরই শান্ত প্রকৃতির । অফিসে, পথে ঘাটে বা হাটে-বাজারে আমার সাথে কারও কোনদিন কোন অশান্তি হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। আর এখন তো আমি গৃহবন্দি শান্ত। আমার স্ত্রী চিরকালের মত এখনও অচঞ্চলতার প্রতীক। আমরা দুজনে আমাদের সন্তান অরুণাভের স্বভাবকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলাম। তবে অরুণাভ যুগের সাথে তাল মি

লয়ে প্রচণ্ড গতিশীল, কিন্তু অশান্ত নয়। সে পুরাতনের সাথে নতুনের মেলবন্ধন ঘটাতে পারে খুব স্বাভাবিকভাবে। অথচ তার স্ত্রী সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর।

:

আমার পুত্রবধু তার ছোটবেলায় পাওয়া অলকানন্দা নামটাকে কাটছাঁট করে যুগোপযোগী করে নিয়েছে। সে চায় তার শ্বশুর - শ্বাশুড়ী সমেত সবাই এ্যালি নামে ডাকুক বৌমা ডাকটা তার কাছে বড্ড সেকেলে মনে হয়। আমেরিকান কোম্পানিতে তার চাকরি । সেখানে যেমন সবাই সবার নাম ধরে সম্বোধন করে তেমনভাবে সে বাড়িতেও সবাইকে সম্বোধন করতে চায়। কিন্তু বাদ সেধেছে অরুণাভ। একদিন শুনতে পেলাম অরুণাভ বলছে, 'তুমি আমাকে একান্তে যা খুশি নাম ধরে ডাকতে পার। আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু বাবা-মার সামনে? কখনও না। ওসব আমেরিকান কায়দা আমি মেনে নিতে পারব না।'

:

অলকানন্দা অরুণাভের পুরাতন মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করে তার আধুনিক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাবার জন্য তার ছোট্ট ছেলে মেঘদীপকে মডেল হিসাবে বেছে নিয়েছিল। মেঘদীপের বয়স এখন সাড়ে তিন বছর। জন্মের পর থেকেই অলকানন্দা তাকে গড়ে তুলেছে একেবারে নিজস্ব কায়দায়। 'তোমার মা- বাবার ওই সেকেলে কালচারে আমি ওকে বেড়ে উঠতে দেব না'। অলকানন্দা মেঘদীপের তৃতীয় জন্মবার্ষিকীতে অরুণাভকে এ কথা বলে সতর্ককরে দিয়েছিল। এ কথা শোনার পরও অরুনাভ মেঘদীপকে তার দাদু-দিদিমার কাছে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করিয়েছিল। তার দাদু-দিদিমা অর্থাৎ আমি এবং আমার স্ত্রী তাকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'অরুণাভ, এটা আবার তোর বাড়াবাড়ি । ওইটুকু ছেলে প্রণামের কী মানে বোঝে বলত !' অরুণাভ বলেছিল 'মানে বোঝার দরকার নেই বাবা, ওর শুধু এই অভ্যাসটা গড়ে উঠুক যাতে ও নিজে থেকে প্রণম্যের কাছে মাথা নত করতে পারে।' মেঘদীপ তার মায়ের ইচ্ছানুযায়ী তার নাম বসানো মঙ্গেনিসের বার্থ ডে কেক্ কেটেছিল। কিন্তু আমারস্ত্রী তাকে নিজের হাতে রান্না করা পায়েস খাইয়ে আশীর্বাদও করেছিল। ওই জন্মদিনে মেঘদীপকে তার মা একটা ইলেকট্রনিক টয় উপহার দিয়েছিল। ওই খেলনাটা একটা রোবোট।

:

মেঘদীপের খেলনার কথা মনে হতেই আমার নিজের ছোটবেলায় উপহার পাওয়া সেই শ্বেতপাথরের ঘোড়াটার কথা আবার মনে এল। ওই খেলনা এখনও আমার এবং আমার ছেলে অরুণাভের খুব প্রিয়। কিন্তু মেঘদীপ? তার তো এই ছোট্ট জীবনে আনেক মজার খেলনা জুটে গিয়েছে। এ সবেরই সংগ্রহকারী তার আধুনিকা মা । কত খেলনা। কোনটা কথা বলে, কোনটা আবার ড্রাম বাজায়। একবার আবার হাতের নীল বোতামটায় আঙ্গুল ছোঁয়ালেই তারহাতে ধরা বন্দুকটা থেকে যেন আগুনের ফুলকি বেরোতে থাকে। আর একজোড়া পুতুল আছে---একটা ছেলে আর একটা মেয়ে । বোতামে একবার চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে পুতুল ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে আর এক পাক ঘোরার পর একে অপরকে চুমা খায়। মেঘদীপের এসব খেলনা খুব পছন্দের, তবে ওই রোবোট খেলনাটা পাবার পর তার আর কিছুই পছন্দ হয় না। কিন্তু অরুণাভ চায় না মেঘদীপ রোবোট খেলনা নিয়ে বেশি মেতে ওঠে। ওর বিশ্বাস রোবোটটা মেঘদীপের মধ্যে এক নৃশংসভাবের উদয় ঘটাবে। রোবটটা একটা লাল বোতাম টিপে দিলেই সচল হয়ে যায়। তারপরেই ভিন্নগ্রহের প্রাণীর কাল্পনিক চেহারার মত আকৃতির রোবোট থপ থপ করে চলতে শুরু করে। তার চলারপথে কোন বাধা পড়লে সে বাধাকে রোবোট দুহাত দিয়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যায়। মেঘদীপ জানে কীভাবে ওকে সচল করতে হয়। আর প্রতিবারই সে ওটাকে সচল করে দিয়ে তার সামনে কিছু একটা জিনিস বসিয়ে দেয়। তারপর রোবোট চলতে চলতে এগিয়ে গিয়ে সে জিনিসটাকে শূন্যে তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর মেঘদীপ হাততালি দিয়ে তার আনন্দ প্রকাশ করে। এভাবে একবার একটা খেলনা বিড়ালছানাকে আছাড় দিয়ে বিশ্রীভাবে ভেঙে ফেলেছে রোবোটটা। আমরা অর্থাৎ আমি, আমার স্ত্রী বা আমাদের সন্তান অরুণাভ, কেউই চাই না আমাদের মেঘদীপ ও খেলনাটা নিয়ে খেলা করুক।

:

এ মূহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমার শ্বেত পাথরের ঘোড়ার সামনে। মনের মধ্যে একের পর এক আমার পরিবারের সব সদস্যদের কথা এবং বিভিন্ন চলমান দৃশ্যের উপস্থিতিতে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। অরুণাভের রুষ্ট কণ্ঠে আমার সম্বিত ফিরল, 'না মেঘদীপ, না। তুমি রোবোট খেলনা নেবে না, অন্য খেলনা নাও'। তাকিয়ে দেখি মেঘদীপ তার অতিপ্রিয় রোবোটটাকে নিয়ে এক ছুটে চলে এসেছে আমার কাছে। অরুণাভকে উদ্দেশ করে বললাম, 'থাক না, ওকে আমি সামলাচ্ছি। তুই তো ছোটবেলায় কথার অবাধ্য হলে তোকে আমার শ্বেতপাথরের ঘোড়াটা দিয়ে বসিয়ে দিতাম আমরা । আর তুইও তখন সব কিছু ভুলে ওটা নিয়ে মেতে থাকতিস।' আমার কথার প্রতিটি শব্দ মেঘদীপ মনে হয় মন দিয়ে শুনল। আর অমনি তারও দাবি উঠল, 'দাদু, আমাকে ঘোড়াটা দাও না, আমি খেলব।' বোধহয় আমার কথাতে খানিক আস্থা পেয়েছে সে। রোবোটটাকে মেঘদীপ মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এর পরই সে রোবোটের লাল বোতামটায় চাপ দেবে । আর রোবোট চলতে শুরু করবে। মেঘদীপও তার সাথে সাথে হাততালি দিয়ে চলবে। অরুণাভ আমাকে সতর্ক করল, 'বাবা তুমি ওকে শ্বেতপাথরের ঘোড়াটা দিও না। ওই দস্যি ছেলে অতদিনের প্রাচীন জিনিসটাকে নষ্ট করে দেবে।'

:

অরুণাভের কথা আমার কানে প্রবেশই করল না। আমি আলমারির দরজা খুলে শ্বেতপাথরের ঘোড়াটা বের করে নিলাম। তারপর মেঘদীপকে কোলে তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলাম ঘোড়াটা। ওটা পেয়ে মেঘদীপ আমার কোল থেকে নেমে পড়ল। ওর রোবোটটা এখন থপ থপ করে এগিয়ে চলেছে চোদ্দ ফুট লম্বা ঘরের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তের দিকে। তার সামনে ফুট ছ-সাতের মধ্যে কোন বাধা নেই। মেঘদীপ এক ছুটে এগিয়ে গিয়ে ওর চলার পথের সোজাসুজি ওই রোবোট থেকে ফুট তিনেক দুরত্বে শ্বেত পাথরের ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে দিল। যেন তিন প্রজন্মের ব্যবধানের দুই প্রতিনিধি একে অপরের সম্মুখীন। একজন স্থিতিশীল এবং অন্যজন জঙ্গম। আর মাত্র কয়েকটি মূহূর্তে, তারপরই হবে এক সংঘাত। কত তীব্র হবে সে সংঘাত সম্ভুত শক্তি ! আণবিক বোমার বিস্ফোরণ তো ধবংস করে দিয়েছিল এক মানব সভ্যতা । এই সংঘর্ষের তীব্রতা কি হবে তার থেকে তীব্র ?

:

কয়েক মূহুর্তে ধবংস হয়ে যাবে দুই প্রজন্ম ধরে সযত্নে লালিত ভালবাসার এক নিদর্শন, নাকি কোন ঐতিহ্য, নাকি সংগোপনে সঞ্চিত কোন মূল্যবোধ ? নিকট ভবিষ্যতের গহ্বরে লুকিয়ে রয়েছে এ সব প্রশ্নের উত্তর। কয়েক মুহূর্ত পরের বিভৎস দৃশ্যটা কল্পনা করে শিহরিত হয়ে উঠছি। একী চরম এক পরীক্ষার সম্মুখীন করলাম নিজেকে। আতঙ্কে বাধ্য হয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলাম। এ সময় অরুণাভও বোধহয় আমারই মত শঙ্কিত চিত্তে দাঁড়িয়েছিল একটু দূরত্বে। মেঘদীপকে শ্বেতপাথরের ঘোড়াটা দেবার আমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও আমাকে সে বাধা দেয়নি। তার মূল্যবোধ তাকে বিরত করেছে।

:

চোখ মেললাম। রোবোট আর শ্বেত পাথরের ঘোড়ার মধ্যে সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য। মুহূর্তের মধ্যে মেঘদীপ লাফিয়ে পড়ে শ্বেতপাথরের ঘোড়াটাকে মেঝে থেকে তুলে নিল কোলে। আর মাত্র তিন-চার পা। তারপরই রোবোট গিয়ে ধাক্কা মারল দেওয়ালে । তার চোখ দুটোতে দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলা নীল আলোটা নিভে গেল। রোবোটটা ঘরের মেঝেতে ছিটকে পড়ে গেল। আমি, অরুণাভ এবং ইতিমধ্যে অকুস্থলে উপস্থিত হওয়া আমার স্ত্রী, আমরা সবাই লক্ষ্য করলাম যে মেঘদীপ তার অতিপ্রিয় রোবোটটির মৃত্যুর জন্য একটুও কাঁদল না।

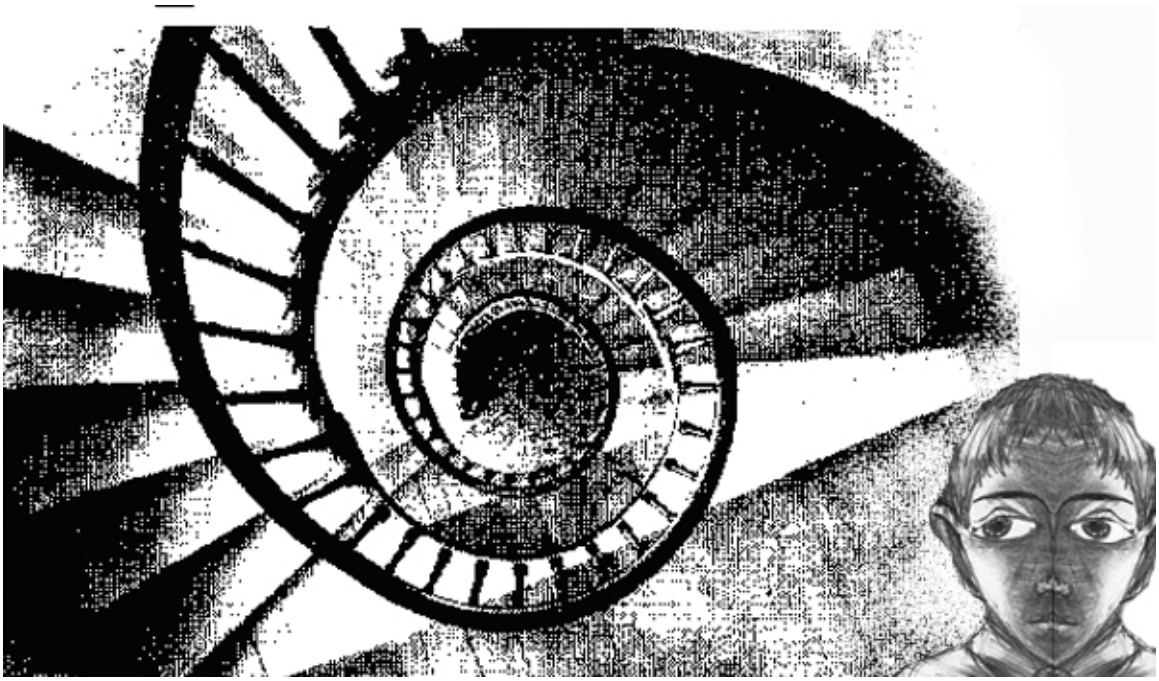

মুখস্থের বাইরে

শতদ্রু মজুমদার

--আচ্ছা রোল নম্বর ৬১২ কোন ঘরটা?

ভদ্রলোক হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন, ওই যে গাছতলায় চলে যান।

আমি বিড়বিড়িয়ে উঠি, গাছতলায় পরীক্ষা হবে নাকি? ছেলের হাত ধরে পাশে দাঁড়িয়ে আমার বউ। সে ধমকাল, ধ্যাত্--গাছতলায় পরীক্ষা হবে কেন-- গাছের গুঁড়িতে সিট-নম্বর আছে--চলো চলো--। বলতে বলতে সে এগিয়ে চলে। পেছন পেছন আমি। গোটা ইস্কুল চত্বরে যেন মেলা বসে গেছে। খবর যতদূর, এবার হাজারের ওপর বাচ্চা পরীক্ষায় বসছে সিট মাত্র ৫০টা। আমি তাই আশা ছেড়ে দিয়েছি। উমা বলেছে, তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না--যা করার আমি-ই করব।

তা সে যথেষ্টই করেছে। ছেলের দু'দুটো মাস্টার। একজন সকালে। একজন বিকেলে। বাকি সময়টা উমা নিজেই। কখনো মুখস্থ করাচ্ছে। কখনো ধরছে। ঘড়ি ধরে পরীক্ষা নিচ্ছে। তাতে ফল নাকি আশাপ্রদ। শেষের দিকে হুবহু ইস্কুলের ধাঁচে পরীক্ষা নিয়ে ৯০ পর্যন্ত নম্বর উঠেছিল। মুশকিল হল বানিয়েও তো লিখতে হয় কত কী। বিশেষ করে রচনাটা। রসগোল্লা থেকে দুর্গা পর্যন্ত যা খুশি দিতে পারে।

উমা বলছে স্টকে অবিশ্যি সত্তরটার মতো আছে। দশটা নম্বর যা-তা ব্যাপার নয়। কিন্তু আমি যা-তা ব্যাপার ছাড়া তো কিছুই দেখছি না। সিরাজদ্দৌল্লার ইস্তেহারের মতো লম্বা লম্বা কাগজে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন উত্তর লিখে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছেন অ্যাডমিশন টেস্ট-এর মাস্টারমশাই। তাঁর মতে এটাই নাকি শিশু শিক্ষার বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি--একই জিনিস সারাক্ষণ দেখতে দেখতে মনে গেঁথে যাবে।

বাপের জন্মেও শুনিনি এসব। ছেলেটার অন্যকিছু দেখার সুযোগ নেই।

ভাববার অবকাশ নেই। খেতে বসলেই সামনে ঝুলছে ঃ মনীষীদের জন্মদিন, মৃত্যুদিন। শোবার ঘরের দেওয়াল সার সার বুদ্ধির অংক। সেগুলো আবার সপ্তায় পালটে যায়।

সিঁড়ির রেলিংটা ফাঁক ছিল। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে দেখি, কোথায় কী কী ঘটেছে। এইসব দেখতে দেখতে বাচ্চা ওঠা নামা করবে। প্রথম ধাপে পা দিলেই গুজরাটে ভূমিকম্প। দ্বিতীয় ধাপে পশ্চিমবঙ্গের বন্যা। পরেরটায় আমেরিকায় বোমা।

দম আমারই বন্ধ হয়ে আসে। তবু কিছু বলার উপায় নেই, ফোঁস করে উঠবে ঃ তোমার কোন ধারণা আছে। কী সাংঘাতিক সাংঘাতিক প্রশ্ন আসে!

আমি আর কী বলব! জেলার একটা সেরা ইস্কুল। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে স্টারের ছড়াছড়ি। যেনতেন একবার ঢুকিয়ে দিতে পারে

ল সেই টুয়েলভ ক্লাস পর্যন্ত নিশ্চিন্তে। তাই চারদিক থেকে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে।
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বছর বছর বেড়েই চলেছে। সুতরাং প্রতিযোগিতা তো হবেই। কিন্তু আমার বক্তব্য শিশুর স্বাভাবিক জগতের দ রজা জানলাগুলো বন্ধ করে দিলে তো সে ক্রমশই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে। উমা বলে,ওসব ভাবনা পরে। যেভাবেই হোক চান্স পাওয়াতেই হবে।
আমি এখন একটা শিরিষ গাছ তলায়। গাছের গায়ে লটকানো আছে সিট নম্বর, রুম নম্বর। দ্রুত খুঁজে ছেলেকে ঠিক জায়গায় নিে য় যায় উমা। ঘড়িতে ঠিক ১১টা। পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।
--আসলে কী জানেন তো--এটা অ্যাডমিশন টেস্ট নয়, এলিমিনেশন টেস্ট--মানে কী করে বাদ দেবে সেই পরীক্ষা।
--বাদ দেবার জন্যে পরীক্ষা।
--হ্যাঁ, কিচ্ছু করার নেই তো, এগারশো ক্যানডিডেট।
-- আচ্ছা, এত ডিমাণ্ড, আর একটা সেকশান বাড়ায় না কেন?
-- সেটা তো স্কুলের ব্যাপার।
-- প্রাইভেট হলে ঠিক করতো।
পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই মহিলার কথোপকথন শুনতে ভাল লাগছিল না। একে - তাকে পাশ কাটিয়ে পাঁচিলের ধারে দাঁড়ালাম। ও পারে একটা বিশাল পুকুর। স্থির কালচে জল কেটে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলেছে হাঁসের লাইন। দূরে কোথায় গান বাজছে ঃ যদি কিছু আমারে শুধাও কি যে তোমারে কব.....।
হঠাৎ শুনলাম ঃ অংকটার জন্যই আমার যত চিন্তা - চারটে যদি রাইট করতে পারে , চবিবশটা নম্বর ছাঁকা! মুখটা ঘুরিয়ে দেখি, ে পপসি - হাতে একটা বউ! অন্যজন বলল, আমি তো বলে দিয়েছি, ফেটে গেলে পচে গেলে উড়ে গেলেই বিয়োগ! চোখের মণি ঘুি রয়ে ঘুরিয়ে বলেই চলেছে।
ঠোঁটের কষ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রঙিন জল। আমার চোখাচোখি হতেই হাতের চেটো দিয়ে মুছে নিয়েই ফের শুরু করল। ইস্কুলময় এইসব। এই ঘেরাটোপের বাইরে যেতে গেলে আমাকে স্কুল কমপাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।
ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এদিক- সেদিক তাকিয়ে বউকে খুঁজতে থাকি। রংবেরঙের শাড়িতে ছয়লাপ। আনাচে কানাচে মহিলা। ছে াটখাটো চেহারার মানুষটাকে ঝট্ করে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। যতদূর অনুমান, ছেলেটো যে ঘরে বসেছে, তার চারধারে ঘুর ঘুর ক রছে হয়ত। পারলে দেওয়াল ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে যায়।
সত্যি,মাথা খারাপ করে ফেলছে একেবারে। কী, না এটাই লাস্ট--সাত বছর হয়ে গেলে আর তো বসতে পারবে না।
একটা বাচ্চা বেরিয়েছিল বাথরুম যাবে বলে। তার পেছন পেছন একদল মা। ঘিরে ফেলেছে ছেলেটাকে। একজন গার্ড ওপরের বা রান্দা থেকে চিৎকার ছাড়ল ঃ ওকে যেতে দিন, যেতে দিন--ডিস্টার্ব করবেন না!
সবাই সরে যায় একটু। দুধারে সার সার বাবা-মা। মাঝখান দিয়ে রাজার মতো হেলতে দুলতে বাচ্চাটা চলে গেল। সকলের চোখে মুখে হতাশা। ঘুরে দাঁড়িয়ে একজন বলল, সেয়ানা বাচ্চা--কিছুতেই মুখ খোলে না।
ঘন্টা খানেক সময় কেটেছে। ঘুরতে ঘুরতে আমি একবার বাইরে চলে আসি। সিগারেট কিনব। পাশা-পাশি হাঁটছে একটা ছেলে। ম ুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার ছেলে কি এই প্রথম?
বললাম, না। কেন বলুন তো?
হাতে একটা ছাপানো কাগজ ধরিয়ে দিয়ে সে বলল, আমি অ্যাডমিশন টেস্ট-এর কোচিং করি। গত বছর আমার তিনটে ক্যানডিডে ট চানস্ পেয়েছিল। আমি চুপ। ভাগ্যিস উমার সঙ্গে আগে যোগাযোগ হয় নি।
সে বলল, এতে আমার ফোন নম্বর, ঠিকানা দেওয়া আছে। ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে একটা গুমটির সামনে দাঁড়াই। ততক্ষণে সে আর একজনকে বোঝাতে শুরু করে দিয়েছে।
অনেকক্ষণ দেখা নেই উমার সঙ্গে। এক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই তো খেয়ে আসে নি। শরীরের অবস্থাও ভাল নয়, মাথা ঘুরে পে ড় গেলেই হয়েছে আর কি। এমনিতেই হাই প্রেশার। তার ওপর প্রচন্ড অনিয়ম। উমা বলেছে, আজকের দিনটা যাক্, প্রেশার আপি ন কমে যাবে।
আমি আবার ইস্কুলে ঢুকলাম। নুড়ি বিছানো লম্বা পথ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখি, উমা। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল। হাঁপাচে ছ বেশ। দ্রুত ওঠানামা করছে বুক।
--কী হল, শরীর খারাপ করল নাকি?
সে বলল, অংক বোধ হয় খুব শক্ত এসেছে। বললাম, তুমি কিছু খাবে?
ও বলল, তিন নম্বর ঘরের একজন কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে পড়েছে--একটা অংকও পারে নি। এইসব বলছে আর চোখ থেকে সান গ্লাসটা খুলছে, লাগাচ্ছে। ফরসা মুখটা লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। চোখের কোলে ঘাম। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। আমি বলল াম, ওসব কথা ছাড়ো তো!

কিছু-না-বলে আবার ভিড়ে মিলিয়ে গেল সে। ফের একটা ছেলে আসছে। ফের ঘেরাও। ভারী চেহারার একটা বউ এগিয়ে গেল, দেখি সরুন সরুন ও অসুস্থ।
--কী সোনাই হয়ে গেল?
--মা, আমি আর পরীক্ষা দোব না।
--ওমা, কেন?
--আমার ভাল লাগছে না--
--সব করছো তো?
--হ্যাঁ।
--অংক করেছো সব?
বাচ্চাটা নিরুত্তর।
--রচনা লিখেছো? কী রচনা দিয়েছিল। রিভিশান দিয়েছো?
ছেলেটা বমি করে দিলে হড়হড় করে । সবাই পিছিয়ে আসে একটু। অসুস্থ বাচ্চাটাকে টানতে টানতে ওর মা নিয়ে চলেছে। পেছন পেছন দুচারজন। এখনো আশা ছাড়েনি--যদি দু একটা জানা যায়। আমি ঘড়ি দেখলাম। আরও আধঘন্টা বাকি। একসময় উমাকে বললাম, চলো একটু চা খেয়ে আসি।
ও বলল, তুমি যাও।
আমি গেলাম না। সিগারেট ধরালাম। চারদিকে মানুষের মাথা। খুব সাবধানে ধোঁয়া ছাড়ি। খালি পেট চারিয়ে পাতলা ধোঁয়া এ কবারে ওপর মুখো হয়ে সরাসরি বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছি। তবু এক মহিলা কটাক্ষ চোখে মুখে আঁচল চাপা দিল।
সূর্য মাঝ আকাশে। কোথাও এতটুকু ছায়াও নেই। লম্বা লম্বা গাছগুলোর ছায়া পড়েছে মানুষের মাথা টপকে বাড়ির দেওয়ালে। ক ারোর মাথায় রুমাল, কারোর মাথায় খবরের কাগজ। ঘোমটাও দিয়েছে কেউ কেউ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, উমা একজনই নয়--হা জারে হাজারে। যেন এই ইস্কুলে ছেলেকে ভর্তি করাতে না পারলে মা হিসেবে জীবন ব্যর্থ।--যেন পৃথিবীতে একটাই স্কুল।
অতঃপর পরীক্ষা শেষ হল। লাইন দিয়ে বাচ্চারা বের হয়ে আসছে। আবার বড়দের হুড়োহুড়ি। আবার কর্তৃপক্ষের ধমক ঃ আপনার া বাচ্চাদের মতো আচরণ করবেন না।
কে কার কথা শোনে! যে যার নিজেরটাকে নিতে ব্যস্ত।
ওই যে আসছে আমার ছেলেটা। মুখে রাজ্যজয়ের হাসি। এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াল, উমা, যেন হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাকে খুঁজে পেয়েছে। আমি ছেলের হাত থেকে ঝটপট পেন্সিল বক্স, ওয়াটারবটল নিয়ে নিলাম।
গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে উমা বলল, সব লিখেছো তো তাতাই?
--হ্যাঁ। মা, আমি রচনাটা লিখতে পারি নি।
--ওমা, সে কী! কী দিয়েছিল?
--তোমার মা।
চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল উমার। রচনা কমন আসেনি। বলল, একটুও না?
ছেলেটা আমতা আমতা করল, শুধু লিখেছি--আমার মায়ের নাম--উমা রেগে গিয়ে বলে, আঃ শুধু নাম কেন? আর কিছু লেখ নি ?
আমি চুপচাপ। গতবারের পরীক্ষায় রচনা এসেছিল পিঁপড়ে--যতদূর জানি, সেটাও তো বানিয়ে লিখেছিল--।
ভয়ার্ত চোখে তাতাই একবার ওর মাকে দেখছে, একবার আমাকে। দু'ধারে জনস্রোত। আস্তে করে সে বলল, কী করে লিখবো--মুখ স্থ নেই তো!

হুইল চেয়ার

হিমাংশু কীর্তনীয়া

দ্বি জপদ নিজেও জানে না, হঠাৎ কেন যে সে, ছাবিবশে আগষ্ট নিরানববই, বুধবার, একদম ভর সন্ধ্যাবেলায়, যখন, যে সব বাড়ীতে আজও মহিলারা সন্ধ্যায়, ধুপদীপ দেখান, শঙ্খ বাজান এবং লক্ষ্মীর পাঁচালী সুর করে পড়েন, যদিও এমন বাড়ীর সংখ্যা গ্রামেও আজকাল কম, শহরে শূন্যে ঠেকেছে, তথাপি দ্বিজপদ অফিস ফেরৎ যেন শঙ্খের শব্দে সমুদ্র ছুঁয়ে ফেলেছে, সমুদ্রের নোনা জলে সাঁতার কাটছে, বালি ভাঙছে, ভাঙতে ভাঙতে পাড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে নীল সাগরের বুকে শঙ্খ চিলের ওড়াওড়ি দেখতে দেখতে নিজের শহরতলীর বাড়ীর দরোজায় এসে দাঁড়ালো। যে দরোজা দিয়ে সাধারণত অতিথিরা আসেন, দ্বিজপদই ছোট্ট বাড়ীটা তৈরী করার সময় ওই গেটের সামনে সব মহলবাড়ীর কায়দায় একটা সংগীতমুখর কলিংবেল লাগিয়েছিল, যা সে লাগানোর দিন পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকবার বাজিয়েছিল এবং পরে আর বাজানোর বিশেষ প্রয়োজন হয়নি, কারণ দ্বিজপদর বরাবরের অভ্যাস, বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বের ছোট গেট দিয়ে, বাগানের মুখে নানান গাছ, কিছু ফুল ও ফলের গাছ লাগিয়ে সুন্দর একটি শান্তিনিকেতনী ছন্দ আনার চেষ্টা করেছে। বাড়ীতে ফিরে সেই বাগানের ভেতর দিয়ে সরাসরি পথ ধরে ভেতরে বাড়ীর দরোজায় যেতে যেতে বাগানটা দেখতে দেখতে ঢোকার অভ্যেস দ্বিজপদর। বটের এবং নিমের বনসাই আছে, অরকেরিয়া, ফরকেরিয়া, সাইকাস, বাহারী নাম এবং দেখতে সত্যিই অপরূপা এই সব দলাপাকানো সবুজের ঢিবির মত ছোটবড়ো গাছগুলো। দ্বিজপদর অসুখী কোন চিত্রকল্প এই সব আঙ্গিকে ধরা পড়েনা, বরং সুখী কবুতরের মত গন্ধ ওড়ে।

দ্বিজপদর বাড়ীর কলিংবেল মাঝে মাঝেই বেজে উঠে। প্রতিবেশী কেউ আসেন। নতুন দু'একজন দূরের মানুষও আসেন এবং তারা বেল বাজান। বেল বাজানোর শব্দের মধ্যে বেশ একটা মনোরম আগমনী সুবাস পাওয়া যায়। কু-বাসও যে আসে না তাও ঠিক নয়। হঠাৎ কোন দিন এমন কেউ বেল বাজালেন, দরোজা খুলে তাকে দেখে ঠিক আলোকিত হওয়া যায় না। তথাপি দরোজা খুলে সেই অপ্রিয় খামের লোকটিকে ভেতরে আসতে বলতে হয়, বসতে বলতে হয়, এবং কথা বলতে হয়, মুখে হাসি ঝুলিয়েও রাখতে হয়, হয়তোবা। আজ সন্ধ্যার সময় গেটের কলিংবেল বাজতে শুনেই দ্বিজপদর মেয়ে শানু, আঠারোতে পা দিলো এই সেদিন, ছোটখাটো দেখতে, স্বাভাবিক চটুলতার বিপরীত চিহ্নবাহী পদক্ষেপ, চলমানতা এবং দরোজা খোলার ব্যঞ্জনায় একটু অন্যরকম শানু, প্রথমে বারান্দার আলো জ্বেলে, তারপর চাবি দিয়ে দরোজা খুলে, একেবারে হতবাক, 'বাবা! তুমি?'

'হ্যাঁরে আমি, আমি কি বেল বাজাতে পারি না?'

'না, তা নয়, তোমার বেল বাজানোটা একেবারে অন্যরকম, কখনো শুনিনি কিনা। পেছনে কি?'

'তাইতো পিছনে কি? ওটা একটা চেয়ার রে!'

'চেয়ার? ওরকম রিকশা-ভ্যানের মতো দেখতে?'

'হ্যাঁ, ওটাকে হুইল চেয়ার বলে।'

'হুইল চেয়ার কেন? কার জন্য?'

'আচ্ছা দরোজা ছেড়ে সরে দাঁড়া। বারান্দায় তুলতে দে তারপর বলছি সব।'

বারান্দার আলো থেকে কিছু আলোর ভ্রূণ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে হুইল চেয়ারের সাদা নিকেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। বসার গদিটা লাল ফোম লেদারের। ভেতরে স্পঞ্জ থাকাতে পেটটা উঁচু গর্ভবতী মেয়েদের পেটের মত লাগছে। দুধরঙের সেলোফন পেপারে মোড়া। পেছনের হেলান দেওয়ার গদিও লাল। ফিকে আলোয় লালের গভীরতা কালচে দেখায় প্রথম। কেউ যদি পে

ছনে দাঁড়িয়ে হুইল চেয়ারটাকে আরোহীসহ এগিয়ে নিতে চায়, যে হ্যান্ডেলদুটি ধরতে হবে তার 'সু' কুচকুচে কালো। আরোহীর পা রাখার যায়গায় এ্যালুমিনিয়ামের বরফি কাটা প্লেট লাগানো। ভারী সুন্দর দেখতে চেয়ারখানা। দ্বিজপদ পেছনের হাতল ধরে বারান্দায় তুলল। কোন পয়সাওয়ালা লোকের অথর্ব শরীরটা যেন বারান্দায় উঠে এলো হামাগুড়ি দিয়ে। এটা শানুর চোখের দৃষ্টিতে প্রথমেই কেমন যেন বিসদৃশ্যভাবে ফুটে উঠলো।

দ্বিজপদ শানুর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ম্রিয়মান হাসি এবং ঈষৎ হলুদ বর্ণের কাশি একসঙ্গে মিশিয়ে একবার শানুর দিকে আর একবার চেয়ার খানার দিকে তাকালো। দ্বিজপদর নামটা একটু প্রাচীন, মেঠো টাইপের । অথচ তার আটোসাটো শরীরের সঙ্গে নামের সঙ্গতি নেই কোন। এমনকি তার স্ত্রীর নামের সঙ্গেও বটের ঝুরির মত স্বাভাবিক গ্রাম্যতা আছে। যেমন স্বর্ণপ্রভা, দ্বিজপদর বৌয়ের নাম। সন্ধ্যার মুখে কলিংবেল বাজানো শুনে, শানু ফিরছে না কেন দেখতে, কার সঙ্গে এতক্ষণ বাইরের গেটে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দেখতে, স্বর্ণপ্রভা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো। অতএব স্বর্ণপ্রভাকে হতচকিত হতে হয়। প্রথমত দ্বিজপদ কলিংবেল বাজিয়েছে এজন্য, দ্বিতীয়ত শানুর চোখের দৃষ্টিতে বৃষ্টিভেজা দিনের শুকনো ঠাঁই খোঁজার লাল পিঁপড়ের সারি দেখে, তৃতীয়ত দ্বিজপদর বোকাবোকা হাসি এবং কাশির বিষয়বস্তু যে জিনিষটাকে কেন্দ্র করে, হঠাৎ সেটার দিকে নজর পড়তেই স্বর্ণপ্রভার আর্তনাদ, 'হায়! হায়! হুইল চেয়ার কেন? কার জন্য? ' দ্বিজপদ স্বর্ণপ্রভার বিমূঢ় জিজ্ঞাসায় তার চোখের কালো মণি দুটোর ভেতরের কর্ণিকা ফেটে জলের ঢেউ উঠে আসছে আর মণির চারপাশের সাদা অংশে চাল ধোয়া জলের অস্বচ্ছতায় কাল-বৈশাখীর আঁচ পায়। দ্বিজপদ কেনোরকমে বলে, ' আরে তুমি! শানু সবাই ওরকম করছো কেন? এটা তো একটা হুইল চেয়ার'। স্বর্ণপ্রভা বলতে চাইল আমি কি বলেছি ওটা হুইল চেয়ার নয়। কিন্তু বলতে পারল না। স্বর্ণপ্রভা যেন দেখতে পেল সে, অথবা শানু, কিংবা দ্বিজপদ ওই চেয়ারের মধ্য গুটিয়ে বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের শরীরটা এক একবার লতপতিয়ে চেয়ারের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, আবার বেরিয়ে আসছে এক একজন করে। শেষ যার শরীরটা ঢুকল, সেটা স্বর্ণপ্রভারই সম্ভবত। দ্বিজপদ ঘাবড়ে গিয়ে স্বর্ণপ্রভার কাছে আসে এবং কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়, ' কি হোলো তোমার স্বর্ণ'?

স্বর্ণপ্রভার চোখে শুকনো নীরবতা। হুইল চেয়ারখানার মসৃণ সৌন্দর্য ক্রমশ উজ্জ্বল আলোকময় হয়ে ফুটে উঠছে। কখনো না কখনো না এই সংসারের কোন কংকালের যদি কাজে লাগে একথা ভেবে স্বর্ণপ্রভার চুল ও চোখের ভ্রুতে কাঁপুনি ধরে।

' কিনে আনলে'? স্বর্ণপ্রভা সোনালী সুরে দ্বিজপদকে জিজ্ঞেস করে। ' ভারী সুন্দর দেখতে কিন্তু। যে কোন জিনিষ ফেলনা নয়। কখন কি কাজে লাগে বলা তো যায় না।' স্বর্ণপ্রভা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেয়ে এক নিশ্বাসে দ্বিজপদ বলে,'না না স্বর্ণ, এটা কিনিনি। এর একটা ইতিহাস আছে। আমাদের অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাবের এবছর, দুঃস্থদের জন্য বস্ত্র এবং বই বিতরণের প্রোগ্রাম ছিলো। আমাদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে লায়ন্স ক্লাবও কয়েকটি হুইল চেয়ার বিতরণের জন্য দিয়েছিল। হুইল চেয়ার চেয়ে যারা আবেদন করেছিলো তাদের মধ্যে একজন আসেনি। সম্ভবত মারা গেছে লোকটি। সেই চেয়ারখানাই একটু এদিক ওদিক করে আমি নিয়ে এসেছি। বিক্রী করলেও তো কিছু টাকা আসবে কি বলো স্বর্ণ?' একদমে কথাগুলো বলে দ্বিজপদ খানিকটা সবল হওয়ার সুযোগ পায়।

স্বর্ণপ্রভা দেখলো হুইল চেয়ারখানায় কে যেন বসে আছে। অসমর্থ শরীর একপাশে হেলে পড়েছে। চেয়ারখানাকে পেছন থেকে কে যেন ঠেলে এগিয়ে নিয়ে আসছে। স্বর্ণপ্রভা ছুটে এগিয়ে যায় চেয়ারখানার দিকে। যেন লোকটা পড়ে না যায়, তাকে ধরে ফেলতে। শানু ভেতরে চলে গেছে। তার সম্ভবত পরিবেশটা আর ভালো লাগছিলো না। দ্বিজপদও যেন কাজটা ভালো হয়নি এতক্ষণে বুঝতে পারলো। আসার সময় অবশ্য মনের মধ্যে একটা দারুণ চপলতা খেলা করছিলো। শানু এবং স্বর্ণপ্রভা খুব হাসবে দ্বিজপদর কীর্তি দেখে। খানিকটা রাগ করবে। তবু হাসিতে কম পড়বে না। তারপর দু-চার দিন পরে কাউকে দিয়ে দেবে, অথবা বিক্রী করে দেবে এরকম ভেবেছিল। কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতি কেমন চিটে চিটে হয়ে গেল মুহূর্তে।

'হাত মুখ ধুয়ে এসো। চা করছি।' অলস কণ্ঠস্বর স্বর্ণপ্রভার।

দ্বিজপদ ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ছেড়ে কলতলায় যায়।

রাতের খাবার সময় অন্যদিনের তুলনায় শানু বা স্বর্ণপ্রভা ভীষণ নীরব। দ্বিজপদ অস্বস্তি এবং রাগ দুটোকেই হজম করতে গিয়েও না পেরে ক্রমশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে।

'তোমরা ভাবছো কি স্বর্ণ? আমি জালিয়াতি করে আনিনি। কিছু ভেবেও আনিনি।'

কিছু বলেছি তোমাকে? জিনিষটাতো ভালো। দারুণ সুন্দর।'

'না যা ভাবখানা করছো তোমরা, মনে হচ্ছে বিরাট কোন অন্যায় করে ফেলেছি।'

'তুমি তোমার মতো ভাবছো'।

‘তোমরা ভাবাচ্ছো’।
‘বাবা ওটা এনে ঠিক করনি। অফিসের ক্লাবেই রেখে আসতে পারতে।’
‘ঠিক আছে কাল নিয়ে যাব।’
‘থাকনা, এনেছো যখন,’ স্বর্ণপ্রভা ডালের বাটি এগিয়ে দিতে দিতে বলে।
আর কোন কথা এগোয় না। দ্বিজপদও গম্ভীর হয়ে যায়। তার শরীরের মধ্যেও স্বর্ণ এবং শানুর পরিত্যক্ত নাইট্রোজেন শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ দ্বিজপদর ঘুম ভেঙে যায়। আলো জ্বালে। তার মনে হলো স্বর্ণপ্রভা বিছানায় নেই। বাথরুমে গেল কি? দ্বিজপদ মনে করতে পারে না রাতে বাথরুমে যেতে গিয়ে স্বর্ণ কোনোদিন একা গেছে। যতরাতেই যেতে হয় দ্বিজপদকে ডেকে তুলে জাগিয়ে রেখে যাবেই। আজ কি হলো স্বর্ণর? বিছানা থেকে নেমে দ্বিজপদ বাথরুমের কাছে যায়। না বাথরুম ফাঁকা। ঘরে ফিরে দেখ বারান্দার দিকের দরোজার ছিটকানি খোলা। দ্বিজপদ তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে আলো জ্বালায়। চেয়ারটার ওপর বসে আছে স্বর্ণপ্রভা। কেমন বিবর্ণ তার অবয়ব। লালা গড়িয়ে পড়ছে কি মুখ দিয়ে! দৃষ্টি ওরকম অস্বচ্ছ কেন স্বর্ণপ্রভার? ছুটে গিয়ে স্বর্ণকে টেনে তোলে হুইল চেয়ার থেকে। পাঁজা কোলে করে প্রায় অচৈতন্য স্বর্ণকে ধরে নিয়ে যায় ঘরে। শানুকে ডেকে মায়ের পাশে বসতে বলে বারান্দার গেট খুলে দ্বিজপদ হুইল চেয়ারখানা গড়িয়ে ঠেলে নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়। স্বর্ণপ্রভা ছুটে আসে। ‘করছো কি? এই রাতের বেলায় তুমি যাবে কোথায়? আসলে আমার ঘুম আসছিল না। তাই ঘুরতে ঘুরতে বারান্দায় এসে চেয়ারটাতে বসেছিলাম। রাখো। ঘরে চলো।

সে রাতে দ্বিজপদর ঘুম হল না। বাকী রাত স্বর্ণপ্রভা দ্বিজপদকে জড়িয়ে শুয়ে থাকল। ফলস্বরূপ রাতের নগ্নতায় দ্বিজপদ এবং স্বর্ণপ্রভা একসময় বেআব্রু হয়ে পড়ল। স্বর্ণপ্রভার পিঙ্গল শরীরের উচ্ছ্বাস দ্বিজপদর অজানা নয়। আজ কেমন যেন টেনে অনিচ্ছাকৃত ভাবে শরীরে ঢেউ তুলতে গিয়ে স্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ দ্বিজপদ অনুভব করে। দ্বিজপদও যান্ত্রিকভাবে রাতের শেষ শয্যা থেকে একসময় উঠে পড়ে। স্বর্ণপ্রভা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন রবিবার। অফিস ছুটি। ছুটির দিন দ্বিজপদ সাধারণত বাগানের পরিচর্যা করে। স্বর্ণপ্রভা ভোরে উঠে চা করে। তারপর টিফিন তৈরী করে। দ্বিজপদ চা টিফিন করে বাগানের কাজে হাত লাগায়। শানু টিউটরের কাছে পড়তে যায়। ভোরেই সে বেরিয়ে গেছে। আজ স্বর্ণপ্রভার উঠতে দেরী হলো। শানু চা না খেয়েই বেরিয়ে গেছে। দ্বিজপদও ভোরে কোথায় যেন কাউকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেছে। স্বর্ণপ্রভার ঘুম ভাঙল যখন তখন সূর্যের আলো বেশ চড়ে গেছে। ফাঁকা বাড়ি। দ্বিজপদ গেল কোথায়? বাগানে তো নেই। বেলা দশটা নাগাদ দ্বিজপদ ফিরলো। অনেকটা পথ হাঁটার ক্লান্তি ঘাম এবং বিমর্ষ, গরুর নরম ন্যাদার মত চোখে মুখে ছড়িয়ে আছে। ‘কোথায় গিয়েছিলে সকালে?’
‘এই একটু হেঁটে এলাম।’
শানুও ফেরে এই সময়। সকালের টিফিনে বসে সবাই। পরিবেশ ধীরে ধীরে অনেকটা হালকা হয়ে আসে।
‘ সেন পাড়ায় গিয়েছিলাম। গিরিনদার স্ট্রোক হয়েছে। অবস্থা ভালো নয়। ’
‘সে কি? গিরিনবাবু তো তোমাদের বয়সী। কি করে হলো?
‘স্ট্রোক কি করে হয় তা তো জানিনা। রাতের খাওয়ার পর শুয়েছিলেন। মাঝরাতে বুকে যন্ত্রণা। বমি বমি পাচ্ছিল নাকি। বাথরুমে যেতে গিয়ে পড়ে গেলেন। বামদিকটা অবশ হয়ে গেছে। ’
‘কবে?’
‘দিন দুয়েক হলো।’
‘এখন কেমন আছেন?’
‘ওষুধ এবং ম্যাসাজ চলছে। বেশ কিছুদিন লাগবে। পুরোপুরি সুস্থ হবেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না।
আবার বাতাস ভারী হয়ে গেলো। সুস্থ মানুষগুলোর এরকম হঠাৎ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া ভীষণ কষ্টদায়ক।
এখন বাতাসে আর্দ্রতা, গরম অস্বাভাবিক। মাঝে নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই গরমের অত্যাচার এবং বৃষ্টির অনিয়মিত আক্রমণে সব গাছ গাছালিতে সবুজের আধিক্য। এর মধ্যেই দ্বিজপদর বাগানের সাইকাস, দ্বিজপদর প্রিয়তম সজারুর কাটার মত তীক্ষ্ণপত্রপুঞ্জের গাছটির সবুজের হলুদের ছাপ নজরে পড়লো। পোকায় কয়েকটি পাতা কেটে দিয়েছে। খুরপি দিয়ে গাছটির গোড়ার মাটি আলগা করতে করতে দ্বিজপদ গভীর হতাশা বোধ করে। বেশ কয়েকদিন বাগানটির দিকে নজর না দিতে পারায় এরকম ঘটনা কখন ঘটে গেছে টের পায়নি। দ্বিজপদ খবর নিয়ে জেনেছে এই গাছ আসলে পাথুরে গিট ভেঙে জলের সিঞ্চন ঘটিয়ে বাঁচে। আলগা দোআঁশ মাটিতে তাই জীবন ধারণ করার পক্ষে একটু কষ্টকর। দ্বিজপদ যথাসম্ভব মাটিকে শক্ত করার চেষ্টা করেছে। মাঝে মাঝে আবার আলগা করে দিতে হয় মাটি। হাওয়া খেলানোর জন্য। গত দিনকয়েক দ্বিজপদ বাগানটির দিকে নজর দিতে পারেনি। কারণ রিক্রি

য়শন ক্লাবের কর্মকর্তাদের মধ্যে সেও একজন। লায়ন্স ক্লাব তাদের সাথে একযোগে তিনখানা চেয়ার দেবার কথা বলার পর থেকে এবং চেয়ারগুলো তাদের অফিসে আসার পর থেকেই দ্বিজপদর একটা ভাবান্তর হয়েছিল। লাল চেয়ারখানা তাকে ভীষণ আকৃষ্ট করেছিল। লিষ্ট মিলিয়ে দেখেছিল তিনজনের নামের। সজল বারুই, হিন্দ মোটরে বাড়ি। ধনেশ চক্রবর্তী, বিশর পাড়া, বিরাটি। তৃত ীয় নীলকান্ত ঘরামী, বনমালীপুর, বারাসাত।লায়ন্স ক্লাবের সম্পাদক অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন। তিনিই চেয়ারগুলো দেবেন এই অ াপায়েজ মানুষগুলোকে। তারা চিঠিপত্র দিয়ে যোগাযোগ করেছে। তৃতীয় ব্যক্তি, নীলকান্ত ঘরামী নামটা দ্বিজপদকে খুব ভাবনায় ে ফলেছিলো। মনে হলো তার চেনা। কিন্তু সব মনে করতে না পারায় সে একদিন বারাসতের বনমালীপুর চলে যায়। এবং সে ঠিক বু ঝতে পারে তার অনুমানই ঠিক। তাদের অফিসেরই পাশের এক প্রাইভেট ফার্মের বহুদিনের পুরানো কর্মী, প্রায় দশ বছর আগে রি টায়ার করে ছিলেন নীলকান্তবাবু। বাড়ীর কাছে গিয়ে প্যান্ডেল এবং দুটো মাথা মোড়া ছেলেকে দেখে বাকীটুকু বুঝতে অসুবিধে হ য় নি কি হয়েছে।

অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ ছাবিবশ তারিখ, বুধবার যখন এক এক করে নাম ডেকে হুইল চেয়ারগুলো দেয়া হচ্ছে, তার মধ্যে একজন গ রহাজির। তিন নম্বর নাম, নীলকান্ত ঘরামীর নাম বারবার ঘোষণার পরও কেউ এগিয়ে না আসায় দ্বিজপদ ভাবলো আসল কথাটা বলে দেয়। বলতে গিয়ে বলার সময় সে বললো উল্টো কথা।

‘নীলকান্ত বাবু খুবই অসুস্থ আমার পরিচিত। কাছেই থাকেন। ওটা আমিই নিয়ে গিয়ে দিয়ে দেবো।’ লায়ন্স ক্লাবের কর্মকর্তাও তা ই মেনে নিলেন। কারণ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া আবার হাঙ্গামার ব্যাপার। কথাটা বলার পর থেকেই ভেতরে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিলো দ্বিজপদর, কিন্তু বলা হয়ে গেছে আর কিছু করার নেই।

পাঁচটা ফরকেরিয়া আছে দ্বিজপদর বাগানে। ফিকে হলুদ আর সবুজ রেখার ফরকেরিয়া গুলো দেখতে এত সুন্দর লাগে, চোখে অ নেকটাই তৃপ্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকা যায়। কিন্তু একটা ফরকেরিয়ার মাঝখানের বিশাল পাতাটা ওরকম নুয়ে আছে কেন? কাছে গিে য় দেখে পাতাটার গোড়া থেকে ভাঙা। পাতা নয় যেন দ্বিজপদর হাতখানা অথবা একখানা পা কেউ ভেঙে দিয়েছে। নীল, বিষাক্ত ন ীল যন্ত্রণা মনের মধ্যে পেঁচিয়ে ওপরের দিকে ওঠে। মাথার মধ্যে দপদপ করতে থাকে। চিৎকার করে স্বর্ণপ্রভা এবং শানুকে ডাকতে যায়। কিন্তু ডাকা হয় না। কারণ দ্বিজপদ দেখতে পায় স্বর্ণপ্রভা দরোজা দিয়ে বাগানের পথ ধরে এগিয়ে আসছে। হুইল চেয়ারে বে স নিজে নিজে চালিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। দ্বিজপদ হা করে তাকিয়ে থাকে।

শারদীয়া

ভাস্কর

ব াজার করতে গিয়ে রোদের গরমে, দামের গরমে, ভিড়ের চাপাচাপিতে ঘেমে নেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন সুধাকর দত্ত। ছোটখাট চ চহারার মানুষ, বেশ একটু গোলগাল সুখী সুখী চেহারা। লম্বায় চওড়ায় প্রায় সমান মুখটা এমনিতেই। একটু হাসি হাসি। মাথার এ কদম পেছনের একটুখানি অঞ্চল বাদ দিলে বাকিটা একটা সুন্দর উত্তল প্রতিফলক। পরিধানে সাধারণতঃ ধুতি পাঞ্জাবি বা পাজামা পাঞ্জাবী, এবং সব মিলিয়ে একজন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়। আজ পূজোর দিনে বাজার করতে এসে সেই ভদ্রলোককে অত্যন্ত নাকাল হ ত হল। আজ আবার বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন আসার একটা ব্যাপার আছে। তাই বাজারের ফর্দ বেশ বড়। দুটো ব্যাগের একটায় আ নাজ, সদ্য ওঠা পালং শাকের বেশ খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে, কমলা রঙের একটা কুমড়োর ফালিও যেন উঁকি দিচ্ছে। আর একটা ছোট ব্যাগে মাছ নিয়েছেন বেশ খানিকটা। সেটা ব্যাগের আয়তনের পক্ষে একটু বেশীই হয়ে গেছে, ফুলে গোল হয়ে রয়েছে ব্যা গটা। মাছের বদলে মাংসই হয়ত নিতেন; কিন্তু কালিপদর মাংসের দোকানের সামনে আজ যেরকম ভিড় তাতে.....। সুধাকর ব াবু বেঁটেখাটো মানুষ। দু-চারবার একটু ঠেলা দিলেন, কিছুই লাভ হল না তখন বাধ্য হয়েই ফিরতে হল।

‘‘ .....বাজারে ভিড় দেখেছেন আজ?’’

‘‘আর বলবেন না যেভাবে এরা দাম বাড়াচ্ছে!’’

‘‘তবু তো কেনবার লোকের অভাব হয় না। দেশের লোকের হাতে পয়সা নাই কে বলবে মশাই!’’

সাধন বিশ্বাসকে পেয়ে তবু দুটো মনের কথা বলবার লোক পেলেন সুধাকর বাবু। মাছের বাজারে যখন হরির কাটাপোনা কিনছি লেন তখনই দেখলেন পাশের লোকটা কোথা থেকে একঢালা গলদা চিংড়ি নিয়ে এসে ফেলল। দেখে লোভ হল খুব। কিনেই ফেল বেন কিনা ভাবছিলেন এমন সময় কানে এল ‘কুড়ি, কুড়ি, একদম ফ্রেশ মাল।’ কুড়ি মানে একশ কুড়ি টাকা কেজি। সুধাকর বাবুর ই চ্ছার প্রদীপটা দপ করে নিভে গেল। তবু কি আশ্চর্য, মুহূর্তের মধ্যে ঠিক মাছির মত একদল লোক জুটে গেল। সেই মুশকো লোকট া, মাংসের দোকানে পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল, এখানেও এসে জুটেছে। দেখেই চিনলেন সুধাকর বাবু। মনে মনে ভাবলেন--রাক্ষস নাকি লোকটা। মাংসও খাবে আবার চিংড়ি মাছও খাবে একই দিনে! খাক্, খেয়েই মরবে এরা.....! সুধাকর বাবুর পরিষ্কার মনে আছে ছোটবেলায় পূজোর চারদিনের একদিন বাড়ীতে চিংড়ি মাছ হতই। আর শুধু পূজো কেন, অন্য সময়েও যখনই চিংড়ি মাছ রা ন্না হত তখনই এই কুচোচিংড়ি কেউ খেত না। সেই চিংড়ির মালাইকারি নারকেলকোরা দিয়ে.....আহা। সুধাকর বাবুর জিভে জল এসে গেল। তাঁর চোখের সামনে প্রাগৈতিহাসিক চিংড়িরা শুঁড়ে নেড়ে খেলা করে বেড়াতে লাগল। চিংড়ির স্বপ্নে বিভোর হয়ে বা জার ছেড়ে প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন, এমন সময় খেয়াল হল যদি ওরা আসে। বড়বৌদি তো আমিষ খাবে না, এক ঝামেলা। শেষ পর্যন্ত বিকাশের দোকান থেকে খানিকটা পনীর কিনতে হল! একশ টাকা নিয়ে বাজার এসেছিলেন, এখন একটাকা খুচরো টাকা প ড় আছে। আর এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত, শুভ বড় হওয়ার পরেও, বিশ টাকা নিয়ে বাজারে এলে এক বস্তা বাজার হত। পনীরের দাম মেটাতে গিয়ে সেইসব সুখের দিনের স্মৃতিচারণ করছিলেন সুধাকর বাবু।

আজ যে পূজোর দিন সেটা সকালে বারোয়ারী তলার মাইকের বিকট চিৎকারে মনে পড়েছিল। কিন্তু বাজার করতে এসে লোকের ভিড়ে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। আবার মনে পড়ল বাজার থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য রিক্সায় বসে। ততক্ষণে গরমে ভি ড়ে দুটো ভারী ভারী ব্যাগ বয়ে বেড়ানোর কষ্টে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। বয়স তো হয়েছে। এবার থেকে ছেলেকেই বাজা

র পাঠাবেন--- মনে মনে ভাবলেন সুধাকর বাবু। অবশ্য ছেলেকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেলে তবে তো। রিক্সায় বসে বাইরের হাওয়া য় অনেকটা ভালো লাগল। সামনে লিচুতলা দুর্গোৎসব সমিতির প্যাণ্ডেল! অনেক প্রাচীন পূজো, একচালচিত্রের সনাতন প্রতিমা। ঢা কের বাদ্যি শুরু হয়েছে। কতদিন হয়ে গেল, উনষাটটা দুর্গাপূজো পেছনে ফেলে এসেছেন সুধাকর দত্ত। আর লিচুতলার এই পূজো ফেলে এসেছে একশ বত্রিশ বছরের ভাঙা ইতিহাস। দুজনেই আজ কালের কিনারায়।

সুধাকর বাবুকে নিয়ে রিক্সাটা যখন লিচুতলা মোড় ঘুরছিল তখন একটা সাইকেল খুব জোরে এসে সাঁ করে মোড় ঘুরে খুব তাড়া তাড়ি চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছিল। সুধাকর বাবু খেয়াল করেননি, কিন্তু সাইকেল আরোহী খেয়াল করেছিল, আর অত্যন্ত সত র্কতার সঙ্গে নিজেকে আড়াল রেখেছিল। এর পিছনে দুটো কারণ ছিল। প্রথমতঃ রিক্সা আরোহীর সাথে সাইকেল আরোহীর একট া সামাজিক সম্পর্ক আছে এবং সেটা পিতা-পুত্রের। আর দ্বিতীয় কারণ যেটা আরও গুরুতর তা হল সাইকেল আরোহীর হাতে এক টি জ্বলন্ত বস্তু ছিল। ছেলে যে সিগারেট খায় তা যে বাবা জানে না এমন নয়, তবু বাবার সামনে দিয়ে ছেলে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁ কতে যাবে এই ব্যাপারটাই বাড়াবাড়ি। তাই বলে সদ্য ধরানো ফিলটার উইলস্ একেবারে ফেলে দেওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। অন্য স ময় শুভর দৌড় বিড়ি কি বড় জোর প্লেন চারমিনার। তবে এখন পূজো, এই সময়ও যদি এরকম একটু বিলাসিতা না করতে পারে তবে আর কবে হবে। .....তাই বাধ্য হয়ে সিগারেটের আগুন অভ্যস্ত হাতের আড়ালে নিয়ে, মুখটা আড়াআড়ি একটু নামিয়ে সাইকে লে স্পিড তুলতেই হল। শুভ এখন যাবে অনুপমদের বাড়ীতে। দেবব্রত আসবে, সুশান্ত, প্রণবও হয়ত আসবে। এমনিতে কাজ তো ি কছু নেই কারুরই, তবু পূজোর সময় আড্ডা দেওয়াটাই একটা কাজ। আর এইরকম আড্ডা দেওয়ার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত যায় গা বোধহয় অনুপমদের দোতলার ওই ঘর। আসলে ঘরটা ঠিক দোতলা নয়, দেড় তলার সিঁড়ির মাঝের ধাপে। ফলে বাড়ির মূল ে স্রাত থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। এখানে বসে নিশ্চিন্তে আড্ডা মারা যায়, ধোঁয়া ছাড়া যায়, তাস পেটানো যায়, লাল দোপাট্টেওয়ালি ব া চোলি কা পিছে শোনা যায়। মাধুরী আর স্বর্গীয় দিব্যা ভারতীর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। সেই ঘরের আরো একি ট জিনিসের প্রতি শুভদের একটা অমোঘ আকর্ষণ আছে। সেটা হল পূর্ব দিকের রাস্তার ওপর একটা বারান্দা। ওই বারান্দায় দাঁড়িে য় যদিও সূর্যোদয় দেখা যায় না, কারণ সামনে লাহাদের বিশাল তিনতলা বাড়ি আকাশের আধখানা ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে, তবু এক কালে এই বারান্দা থেকেই অনেক নবীন আশার অরুণোদয় হয়েছিল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই বারান্দায় একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তবে সেই ইতিহাস কখনোই অবিমিশ্র সুখের নয়। আর এই পূজোর সময় সেই বিষন্ন ইতিহাসকে দূরে সরিয়ে রেখে এই বারান্দায় একটা বিশেষ গুরুত্ব পায়, কারণ জাগৃতি সংঘের বারোয়ারীতলার যাবার এটাই একমাত্র রাস্তা।

এক ঝাঁক লাল হলুদ বেগুনী প্রজাপতিকে আড় চোখে পাশ কাটিয়ে শুভ যখন অনুপমদের বাড়িতে ঢুকল তখন দশটা বেজে গেছে। ঘরে ঢুকে একজনকে দেখে বেশ একটু অবাক হতে হল। যাকে দেখে অবাক হল মাস দুয়েক আগেও তাকে দেখতে না পেলেই বেশী অবাক হত ওরা। ওদের এই গ্রুপটার মধ্যে অরিজিৎ শুধু একজন ছিল বললে খুব কম বলা হয়। সুখে দুঃখে বিরহ মিলনে আড্ডায . সিনেমা হলে সব-সময়েই অরিজিৎ ওদের সঙ্গে ছিল। দারুণ জমাতে পারত। কিন্তু মাস দুয়েক আগে একটা খুবই অভিপ্রেত ঘটনা অনভিপ্রেত ভাবে ঘটে যাওয়ার পর থেকে ওদের মধ্যে সম্পর্কের সুতোটা পচে যেতে যেতে এখন প্রায় ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থায় এে স পৌঁছেছে। এখন তো আর প্রায় দেখাই নেই। .....ঘটনাটা আর কিছুই নয়, একটা চাকরি। মোটামুটি নাম করা একটা কোম্পান ীর মাঝারী মাপের একটা চাকরি। কিন্তু কি করে? অনুপম পেল না, বিকাশ পেল না, শুভ পেল না, হঠাৎ অরিজিৎ পেল কি করে? ও দাবী করে ইন্টারভিউ ভালো দিয়েছিল, কিন্তু শুভরা কেউই সে কথা খুব একটা বিশ্বাস করে না। কেউ বলে ওর জ্যাঠার লাই ন ছিল, কেউ বলে লাইনটা ওর পিসতুতো দাদাদের। আবার অনেকের মতে ব্যাপারটায় ওর মেসোমশাইয়ের হাত ছিল। তবে হা ত যারই হোক কোন না কোন অদৃশ্য হাত যে পেছনে ছিল সে ব্যাপারে ওরা হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর। অদৃশ্য হাত তো থাকতেই পা রে, ওদের আপত্তিটা সেইজন্য নয়; আপত্তি অন্য জায়গায়। বন্ধুদের জন্য অন্য কিছু না কর অন্ততঃ সত্যি কথাটা তো বলা উচিত ি ছল। তা না, অনেক খেটেছি, ভালো ইন্টারভিউ দিয়েছি এসব ভ্যানতাড়া মারার কি আছে? শুভরা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে, কিছু ই বোঝেনা! আর কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবার পর থেকে ওদের মধ্যে যোগাযোগ আরও কমে গেছে, বন্ধুত্বের যেটা একটা প্রাথমিক শর্ত । তাই শিক্ষিত বেকারদের সঙ্গে চাকুরের বন্ধুত্ব আর তেমন দানা বাঁধেনি। তবু আজ পূজোর দিনে অরিজিৎ এখানে কেন? কি মনে করে? .....ওদের অফিসের গল্প, লেডি স্টেনোর দুঃসাহসিক পোষাক পরিচ্ছদ আর বসের পিও র গল্প শুনেও শুভ ততটা উৎসা হ পেল না। কোথায় একটা তার যেন ঢিলে হয়ে গেছে, কিছুতেই আর আগের সুর বাজে না, কোথায় যেন বাধে, সেটা কি ঈর্ষা?

সামনের পূজো, আর একবছর। তার মধ্যে একটা চাকরি হবে না? .....খাটতে হবে। প্রচণ্ড খাটবে শুভ। কিছু একটা করে দেখিয়ে ে দবে।..... কিন্তু কি করবে, কাকে কি দেখাবে সেটা পরিষ্কার জানা নেই শুভর। তাই আরও অস্থির লাগে। এক এক সময় মনে হয় সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছার-খার করে দেয়।

বাজারের ব্যাগ রান্নাঘরে ব্যস্ত উত্তেজিত প্রবীণার জিম্মা করে সুধাকর বাবু ভাবলেন একবার বেরোবেন। গোবিন্দ, দ্বিজেন, ব্যানার্জীবাবু সবাইকেই আসার সময় দেখে এসেছেন প্যাণ্ডেলের সামনে। পূজোর দিন অন্তঃত একবার গিয়ে দাঁড়ানো উচিৎ, নাহলে খারাপ দেখায়। ওদের অবশ্য আলাদা ব্যাপার। পূজোয় ওদের ইন্‌ভল্‌ভ্‌মেন্ট অনেক বেশী। গোবিন্দ তো আবার প্রেসিডেন্ট না কি যেন। একটা সময় এই পূজো নিয়ে কম মাতামাতি হয় নি। সে যুগে সুধাকর বাবুর উৎসাহ কিছু কম ছিল না। আর তখন এরকম রাতস্থায় ঘাটে ব্যাঙের ছাতার মত বারোয়ারী পূজো গজিয়ে উঠেনি।এই গোবিন্দ দ্বিজেন এদের তখন বয়স অল্প। বলতে গেলে এরাই পাড়ার পূজোটা আরম্ভ করেছিল। সুধাকর বাবুও ছিলেন, তবে একটু দূরে দূরে। তখনকার আনন্দই আলাদা ছিল। পাড়ার সবাই থাকত আনন্দ করত। বারোয়ারী হলেও অনেকটা ছিল বাড়ীর পূজোর মত। ওই গোবিন্দদের বাড়ী থেকেই পূজোর সবকিছু ভোগ জাগাড় আসত। আর শেষপর্যন্ত হাতে কিছু বাঁচলে তাই দিয়ে একদিন বড় করে খাওয়া দাওয়া। আর একটা ব্যাপার হত ভাসানের পরদিন ---- বিজয়া সম্মিলনী। ওই প্যাণ্ডেলের মধ্যেই একটা তক্তাপোশ পেতে স্টেজ হত। খুবই ছোট ব্যাপার। তবু এই ব্যাপারটায় সুধাকরবাবুর খুবই উৎসাহ ছিল। তখন এরকম বাইরের লোক ধরে এনে গান গাওয়ানোর রেওয়াজ ছিল না। যা কিছু হত সবই পাড়ার মধ্যে। দ্বিজেনের বোন শান্তি দারুণ গান গাইত। সুলেখারা দুই বোনও ভালো গাইত। সুধাকর বাবু তখন একটু আধটু কবিতা বলতেন। একবার দেবতার গ্রাস পুরোটা আবৃত্তি করে বেশ খ্যাতি হয়েছিল। সে সব কবে চুকে গিয়েছে। এখন মাইক এসেছে। পাড়ার লোকের কানের মাথা খেয়ে দিনরাত গাঁক গাঁক করে বাজছে। এখনো বোধ হয় বিজয়া সম্মিলনীর নামে কিছু একটা হয়।ওই শিবেটা সেদিন বলছিল ফাংশন। সেটা আর যাই হোক সেদিনের বিজয়া সম্মিলনী নয়। বহুদিনের অভ্যাস, তাই সুধাকরবাবু এখন একবার গিয়ে বসেন, তারপর যখন 'আর্টিস' আসবার সময় হয় তখন বাড়ি ফিরে এসে বাইরের দিকের জানালাগুলো বন্ধ করে দেন। কালই তো বোধ হয়, বিকেলে মাইকে কিরকম একটা অসহ্য চিৎকার হচ্ছিল। সেটা না গান, না কবিতা, না নাটক, সুধাকর বাবুর জানা কোন জিনিস নয়। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ছেলে বলেছিল ওটা নাকি র‍্যাপ সঙ, তাঁর বোঝার মত জিনিস নয়। অবশ্য সত্যিই পুরোটা বোঝেন নি সুধাকর বাবু। তবে এটুকু বুঝেছেন যে যুগ বদলে গেছে। মনে পড়ে গিয়েছিল গোবিন্দ একবার পূজো প্যাণ্ডেলের সামনে সিনেমার গান গেয়েছিল। নিত্যানন্দ বাবু, মানে গোবিন্দর বাবা সেটা শুনে ছেলের হাড় কখানা ভাঙতেই শুধু বাকি রেখেছিলেন। সেই গোবিন্দ সেদিন মেয়ের বিয়ে দিল। ভাবা যায়? সময়ের চাকা কেমন তাড়াতাড়ি গড়িয়ে চলে।

সুধাকর বাবু প্যাণ্ডেলের সামনে এসে দেখলেন বোস বাবু, মুখার্জী বাবু সবাই এসেছেন। বোস বাবুর চোখে কালো চশমা। সেই কবে ছানি অপারেশন করিয়েছেন। এখনো তার মানে ডাক্তার নতুন পাওয়ার দেয়নি। .....নিজের চোখটাও সমস্যা করছে। ছানি পড়ার বয়স তো হয়েছেই। একবার ডাক্তারকে দেখাতে পারলে ভালোই হোত। সুধাকর বাবু এগোলেন বোস বাবুর দিকে। ডাক্তার তালুকদারের চেম্বার, ভিজিট, রোগীর ভিড়, সবকিছু খুঁটিয়ে জানতে হবে।

অনেকদিন বাদে অনেকক্ষন আড্ডা হল। ডাক্তার তালুকদারকে নিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে অন্য ডাক্তার, সরকারী হাসপাতালের অব্যবস্থা, নার্সিং হোমের রমরমা। তারপর হঠাৎ করে বাজারের চড়া দাম, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মার্কিন আগ্রাসন, সরকারের উদার নীতি। নীতি থেকে দূর্নীতি। শেষ পর্যন্ত কে বড় চোর নরসীমা রাও না জ্যোতি বসু সেই তর্ক অসমাপ্ত রেখে যখন সুধাকর বাবু উঠলেন তখন সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সমবেত চিৎকার ছোটকাকা, ছোটকা, দাদু.....দাদু। ভাইপো ভাইঝি জামাই নাতি নাতনীদের দুটো রিক্সা বাড়ীর সামনে থামল।

.....

দুটো ক্যাসেটকে কিছুতেই ঠিকমত সামলাতে পারছিল না শুভ। জামার বুক পকেট থাকলে সেটাই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা ছিল। কিন্তু এবারের পূজোয় যে রেডিমেড শার্ট গুলো কিনেছে সেগুলোর পকেট নেই। শুভর সখের মাকন জিন্‌স্‌ ----তাও যথেষ্ট টাইট ফিট। সেখানে ক্যাসেট ঢোকালে বিসদৃশ ভাবে ফুলে থাকে। তাতে অবশ্য কিছু যেত আসত না যদি না শুভর সেরকম একটা ইমেজ থাকত। আসলে ওকে দেখতে বেশ ভাল। ফর্সা লম্বা, চকচকে চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ সব মিলে স্মার্ট এবং হ্যাণ্ডসাম। তাই পূজোর ক'দিনে নতুন জামাকাপড়ে পথ চলতি অনেকের কাছেই শুভ স্যুটেবল বয়। .....তাই বাধ্য হয়ে কিছুটা কষ্ট করেই এহাত ওহাত বদল করে ক্যাসেট দুটো বয়ে আনছিল শুভ। তবে গান শোনা বা নিজের ইমেজ রক্ষা করার জন্য এটুকু কষ্ট করা যেতেই পারে। বিশেষতঃ গান শুনতে যখন শুভ ভালোবাসে। গানের ব্যাপারে খুব একটা বাছবিচার নেই ওর, শুধু ক্লাসিক্যাল আর একান্ত ঘুমের সময় ছাড়া রবীন্দ্র সংগীত, এই দুটো বাদ। এর বাইরে সায়গল থেকে বাবা সায়গল, সন্ধ্যা, হেমন্ত, জ্যাকসান, ম্যাডোনা, জীবনমুখী বাংলা গান সব মিলিয়ে শতখানেকের বেশী ক্যাসেট শুভর ঘরের তাকে সাজান আছে। আর একদম তলার তাকে ধূলিধূসারিত খাপে ভরা কিছু পুরনো রেকর্ড পড়ে আছে। সেখানে বেশীর ভাগই শুভর অপছন্দর গান। আসলে সেগুলো বাবার এককালের সংগ্রহ, তাই ছেলে সে বিষয়ে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখায় না।

বাড়ির কাছাকাছি এসে শুভর উপলব্ধি হল ক্যাসেট বয়ে আনার এই কষ্ট সবটাই বৃথা।। খেয়াল ছিল না আজ বাড়িতে অনেকের আসার কথা। ওর জাঠতুতো দাদা দিদিরা আসবে, সঙ্গে টুকাই, বুম্বা ওরাও নিশ্চয় আসবে, আর ওরা আসা মানেই .....ওফ্, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। ওরা এলে যে শুভর খারাপ লাগে তা নয়, ভালই লাগে, হইচই করে সময় কেটে যায়। তবে সত্যিকথা ব লতে কি এই পূজোর সময় শুভ পাড়ার পূজো, বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা, পাকখাওয়া, নানারকম 'ডিউটি' এই সব নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে এর মধ্যে নতুন কোন কাজ বা অন্য কোন রকম ঝামেলা এসে পড়লে খুব বিব্রত লাগে।

এবার বয়েজ ক্লাবের সুবর্ণ জয়ন্তী। ওদের প্যাণ্ডেলটা ফ্যাণ্টাসটিক হয়েছে। কোন একটা মন্দিরের ছাদে । তাছাড়া ভেতরে বাঁশের কাজের যেসমস্ত 'ডেকোরেশন' রয়েছে সেগুলোও 'বিউটিফুল'। সামনের বার পাড়ায় শুভর সেক্রেটারি হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত উ জ্বল। সেরকম হলে একদম নতুন কিছু করতে হবে। শুভর মাথায় একদম নতুন কিছু করার নানারকম চিন্তা পাক খেতে লাগল। আ কাশে একটু একটু মেঘ করেছে। জ্বালা করা রোদটাও আর নেই। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া হাওয়া আর পূজো প্যাণ্ডেলের মাইকে অনেক রকম গানের মিশ্র সুরের ভেতর দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে উদাস হয়ে গেল শুভ। সামনের পূজোয় যদি দারুণ কিছু করে ফে লতে পারে তখন সবাই কি বলবে? পাপিয়া পিয়ালীরা কি ভাববে.....? এরকম নানা অসম্ভব চিন্তার জাল ছিঁড়ে একসময় বাড়ি র দরজায় এসে থামল শুভ। সামনে তখন প্যাণ্ডেলের এককোণে আড্ডা জমিয়েছে সেই পাপিয়া পিয়ালীরা আর কিছু রঙচঙে অচে না মুখ। শুভ থামল, সবাই তাকাল; কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে, কেউ বা শুধু চোখ ঘুরিয়ে। কিছু বিস্ময়সূচক শব্দও কি সৃষ্টি হল না? সেদিকে একটা মোলায়েম হাসি উপহার দিয়ে শুভ যখন বাড়ি ঢুকল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে।

যদিও এটাই সুধাকর বাবুদের পৈতৃক বাড়ি তবু বর্তমানে এখানে সুধাকর বাবু ছাড়া দত্ত পরিবারের আর কেউই নেই। অবশ্য দত্ত পরিবার কোনো দিনই খুব বিরাট পরিবার ছিল না। সুধাকর বাবুরা ছিলেন দুই ভাই। ভাই সুধাকর আর দাদা দিবাকর। তাঁদের ব াবা ছিলেন জবরদস্ত লোক, ইংরেজ আমলের সরকারী কর্মচারী। তিনিই এইখানে জমি কিনে অনেক সখ করে এই বাড়ী বানিয়েছিলেন। জবরদস্ত হয় নি। দাদা দিবাকর তবু কিছুটা, কিন্তু সুধাকর বাবু একেবারেই জবরদস্ত বাপের বিপরীত। আজীবন পোর্ট ট্রাস্টের কর্মী ছিলেন। সম্প্রতি, মানে মাস তিনেক হল রিটায়ার করেছেন। দাদাও মারা গেছেন বছর পাঁচেক হল। অবশ্য তার বহু আগে থেকেই, কর্মজীবনের শুরু থেকেই দিবাকর বাবু এই বাড়ী ছাড়া। তাঁর জীবনও বেশ বিচিত্র ধরনের, রোমাঞ্চকরও বলা যায়। সেসব কথা অবশ্য সবারই জানা। কিছুটা সত্যি, আর বেশ কিছুটা অতিরঞ্জন মিশিয়ে দিবাকর বাবুর গল্প এখনো এ পাড়ার বড়দের আ ড্ডার একটা প্রিয় বিষয়। তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অবশ্য জন্মসূত্রে এবং কর্মসুত্রে এ পাড়ার যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। তাঁরা সবাই বর্তমানে কলকাতাবাসী। তবু পূজোর চারটে দিনের ভেতর অন্ততঃ একটা দিন এই মফস্বল শহরে দেশের বাড়ীতে আসাটা তাদের কাছে এখন একটা প্রথা হয়ে গেছে। .....অনেক আগে, সুধাকর বাবুর ছোট বেলায়, তখন বাড়িতে আরও জমজমাট সমাবেশ হত । পিসিরা আসত। সুধাকর বাবুর মামার বাড়ীর দিকের বিশাল পরিবার তারাও আসত মাঝে মধ্যে। তখন দারুণ মজা হত। সবচে য় বেশী মনে পড়ে বিজয়াদশমীর কথা বাড়ীতে নাড়ু তৈরী , বিকেলে পাড়ার বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রণাম আর মিষ্টি খাওয়া। শুধু ওরাই নয়, বড়রাও প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ী যেত। সে একটা অন্য রকম পরিবেশ ছিল। আজকের মানুষের মত সবাই তখন স্বার্থপর ছি ল না। এখন মানুষ যেন কেমন হয়ে গেছে, প্রাণহীন, শুধু যে যার নিজেরটা বোঝে। হয়ত এটা অবশ্যম্ভাবী। দিন পালটাচ্ছে, সমাজ পাল্টাচ্ছে। সুধাকর বাবুই বা এখন আর কজনের বাড়ী যান। গেলেও সেই প্রাণের স্পর্শ আর খুঁজে পান না। বাচচারাও এখন আর সারা সন্ধ্যে এবাড়ি ওবাড়ি ছোটাছুটি করে বেড়ায় না। আসলে এটাই নিয়ম। সময়ের হাত ধরে সব পাল্টে যায়। যা পালটায় না ত া ক্রমশঃ জীর্ণ হয়, শেষে একদিন ভেঙে পড়ে যায়। এই বাড়ীর পশ্চিম দিকে আগে একসার নারকেল গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ি য়ে ছিল, সেগুলো এখন আর নেই। শেষ যে দুটো বুড়ো গাছ ছিল, যাতে আর ডাব ধরতো না, তার একটা এবারের ঝড়ে ভেঙ্গে প ড়ে গেছে। বাকি আছে একটা। সন্ধ্যায় যখন দিনের আলো নিভে আসে, ধূসর অন্ধকারের ভেতর ছাদে পায়চারি করতে করতে সুধা কর বাবু গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। শীর্ণ হেলে পড়া গাছটার মধ্যে হয়ত নিজেকে খুঁজে পান।

.....শুভ এখন যা যা করে তার বেশীর ভাগই অভ্যাসগত ভাবে করে। কোন কাজের জন্যই ভেতর থেকে আর তেমন চার অ াসে না, করতে হয় তাই করা। বি এসসি পাশ করে ফেলেছে শুভ। এম এসসিতে চান্স পাবে কিনা কে জানে। পেলেও আদৌ পড়বে কিনা তাও ঠিক করতে পারে না। ওর বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্যে খুব খাটছে। মাঝে মাঝে সি এস আর এর পাতা উল্টোয়, অনেক কষ্ট করে দু-পাতা ইংরেজী পড়ে। তবু মন লাগে না, ভালো লাগে না। স্কুল জীবনে, ইলেভন্ টুয়েলভে বা তা র পরেও বন্ধুত্বের যেমন গভীরতা ছিল সম্পর্কগুলো যত স্বাভাবিক-স্বচ্ছন্দ ছিল এখন আর তা নেই। এক কালের কত ঘনিষ্ঠ বন্ধুদে র সঙ্গে এখন তো আর যোগাযোগই হয় না। আসলে এই জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সবই ভেঙে গড়ে; সম্পর্ক তাই ভেঙে যা য় আবার গড়ে ওঠে। .....তবু রোজ বিকেল হলেই আড্ডা মারতে বেরোয়, না গিয়ে থাকতে পারে না। আসলে এটাও এখন এক

রকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে পূজোর দিনে আড্ডার তো একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকেই। জন্মের পর থেকে বরাবরই শুভ এ ই শহরে। এখানকার সবকিছুর সঙ্গে ওর একটা নাড়ির যোগ তৈরী হয়ে গেছে। এখন তাই পূজোর কদিন নিজের জায়গা ছেড়ে এ ক পাও নড়তে চায় না। অনেক আগে শুভর মনে পড়ে পূজোর চারদিনের একদিন কলকাতায় ঠাকুর দেখতে যাওয়া হোত বাড়ীর স বাই মিলে। এখন অবশ্য আর হয় না। কেই বা যাবে ? পূজোয় এখন শুভর কত কাজ।

তবু এবারের পূজোয় শুভ একটু কম ব্যস্ত। এতদিন পূজোয় ওর যেগুলো অবশ্য কর্তব্য ছিল এবার তার মধ্যে বেশ কতকগুলো নে ই। যেমন এবার পূজোর চারদিন চবিবশ ঘন্টা সময় পুরোটাই শুভর নিজের। সেটা ও একান্ত নিজের মত করে খরচ করতে পারে, সেখান থেকে কাউকে কিছুটা সময় ভাগ দেওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এবার কোন বন্ধন নেই শুভর। ঠাকুর দেখতে বেরোনো, রেষ্টুরেন্টে চাইনিজ খাওয়া, সিনেমায় যাওয়া কোন কিছুতেই এবার তেমন বিশেষ কোন ব্যাপার নেই। এত স্বাধীনতা ি ক ভাল? ভাবতে চেষ্টা করে যে আমি মুক্ত বিহঙ্গ। তবু মাঝে মাঝে কোথায় যেন গোলমাল হয়ে যায়। এক আকাশের থেকে অন্য আকাশের দিকে উড়ে বেড়াবার মত ডানার জোর এই বিহঙ্গের আর নেই।

শুভ সন্ধেবেলায় মাঠে এসে দেখল অনেকে এসেছে। যাদের সঙ্গে এমনিতে প্রায় দেখাই হয় না, পূজোর সময় সে রকম অনেকের স ঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যেমন বাবলু। গত বছর ওদের এখানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্রোটেকশান ফোর্সের যে রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল তাতে বাবল ু চান্স পেয়ে গিয়েছিল। তারপর কোনরকমে একবছর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। আসলে ওদের ট্রেনিং পিরিয়ডে নাকি কোন ছুটি নেই। তবু বাঙালী বলে এই পূজোর কদিন ওকে ছুটি দিয়েছে। ধাপিতে আজ বাবলুর ট্রেনিং পিরিয়ডের নানারকম রোমহর্ষক এবং অব শ্যই অতিরঞ্জিত গল্প শুনতে শুনতে অনেকটা সময় কেটে গেল। বাকি সময়ের খানিকটা কাটল পূজোর রঙিন পথ চেয়ে চেয়ে, আর দুই পূজো, অমিতাভ, স্যাটেলাইট চ্যানেলের অনুষ্ঠান, সন্তান সংঘের প্যাণ্ডেল, রথতলায় দেবুর দিনরাত ঘুর ঘুর করা এই সব টুক রো কথার জোড়াতাড়ায়।

তবু সেইসব বন্ধন কাটিয়ে শুভ আজ তাড়াতাড়ি উঠল। পাড়ার পূজোতলাতেই বাকি সন্ধেটা কাটাতে পারলে ভাল হয়। পিয়ালীরা ও হয়ত থাকবে আজ। ওদের পাড়ায় নতুন বাড়ী করে এসেছে এক ডাক্তার। তার মেয়ে সুদীপ্তা। অক্সিলিয়ামে ফার্স্ট গার্ল। 'বীভৎস ' ভালো দেখতে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকার মত । পূজোর চাঁদা, তার বিল, পূজোর প্রসাদ এরকম এটা সেটা ছুতো করে বার পাঁচে ক ঐ বাড়ীতে ঘুরে এসেছে শুভ, তবু এখনও ঠিকমত আলাপ হয়নি। আজ একবার চেষ্টা করতেই হবে। বাবার আদ্যিকালের ল্যামে ব্রটা স্কুটারটায় লাথি কষাল শুভ।

ফেরার সময় কেন কে জানে বাড়ী যাওয়ার সোজা রাস্তায় গেল না শুভ। গেল একটু ঘুর পথে, যে পথে এককালে প্রতিদিন যাওয়া আসা ছিল ওর। সেই বাড়ীর কাছাকাছি এসে শুভর গাড়ীর গতি ধীর থেকে ধীরতর হল। গতবছরেও আজকের দিনে ওরা একসে ঙ্গে বেরিয়েছিল। গতবছরের কতকিছু বদলে গেল। কিম্বা হয়ত কিছুই বদলায় নি। আসলে নাটকটা একই আছে, শুধু তার চরিত্র গু লো পাল্টে গেছে। আগের দৃশ্যে শুভ ছিল, এই দৃশ্যে নেই। তার জায়গায় অন্য কেউ অভিনয় করছে এখন। .....ঘাড় উঁচু করে শুভ তাকে দেখতে পেল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছে, ঘাড়ের কাছে খুব ঝকমকে লাল ওড়নার অংশ বিশেষ। বেরোবে নিশ্চয় । দাঁতে দাঁত চেপে বাড়ীর সামনেটা পার হয়ে গেল শুভ। আর ঠিক তখনই পাশের গলির মোড় থেকে একটা গা জ্বালা করা স্বর-- ''এই যে শুভ, আজ এদিকে কি মনে করে?'' শুভ তাকিয়ে দেখল পিন্টু, ওদের দলটা আড্ডা মারছে গলির মোড়ে। ওকে দেখলেই আজকাল গা জ্বলে যায়। শালা সব জানে, জেনেশুনে আওয়াজ দেয়। না হলে এমন অনাবশ্যক চিৎকার করে এই কথাগুলো শুভে ক শোনানোর কোনো প্রয়োজন ছিল? সামনেই খোলা জানলা। এই আওয়াজটা নিশ্চয়ই ওর কানে যাবে। কি ভাববে? শুভ এখন ঘুর ঘুর করে। নিজের ওপর বিতৃষ্ণায় দু কান লাল হয়ে গেল ওর। একটা কথারও জবাব না দিয়ে দ্রুত গলিটা পার হয়ে গেল। ব ড় রাস্তায় পড়ে গাড়ীর গতি বাড়াল শুভ। ও সেই ছেলেটাকে চেনে। খেলার মাঠে অনেকবার দেখেছে। ভাল ক্রিকেট খেলে ছেলেট া। তবে খেলার জগতে শুভই বা কম যায় কিসে! মাঠে কোনদিন মুখোমুখি হলে দেখিয়ে দেবে।

গাড়ীর গিয়ার পাল্টাল শুভ। পূজোর দিন রাস্তায় যথেষ্ট ভীড়। এই অবস্থায় এত জোরে গাড়ী চালানো কখনই উচিত নয়। যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কিন্তু শুভর চোখের সামনে এখন সব ফাঁকা, শুধু একটা সবুজ মাঠ; তার মাঝে বাইশ গজ ফাঁক ি দিয়ে দু-সার উইকেট। তার ওই প্রান্তে প্রতিপক্ষ আর এই প্রান্তে শুভ। হাতে আলো পিছলে যাওয়া চকচকে লাল একখানা বল। দু খানা রিক্সার ফাঁক দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে বেরিয়ে গেল স্কুটারটা। ওভারের শেষ বল, শুভ দৌড় শুরু করল। পেছনে সমুদ্র গর্জনেব . মত দর্শকের চিৎকার। শুভর স্কুটার এখন এক্সিলেটারের কানমলা খেয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটছে। সামনেই লিচুতলা মোড়। শুভ দৌড়াচে ছ। স্টাম্পের পাশ দিয়ে পপিং ক্রিজে ডান পা পড়ল। বাঁ হাত ওপরে উঠাল। তারপর কাঁধের সমস্ত জোর দিয়ে লাল বলটাকে ছে

ড় দিল শুভ, দেখল গুডলেংথ নিশানার সামান্য আগে থেকে বিষাক্ত সাপের মত লাফিয়ে উঠছে বলটা। .....আর ঠিক তখনই ঘটে গেল ঘটনাটা। লিচুতলার বাঁকে এসে হঠাৎই থেমে গেল সামনের রিক্সা দুটো। সে দুটোকে পাশ কাটাতে গিয়ে ব্যালান্স হারালো শুভ। শেষ মুহূর্তে বাঁচাতে বাঁচাতেও পাশের সাইকেলটার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল।

বেধড়ক মার খেতে পারত শুভ। বরাত খুব ভাল তাই সে রকম কিছু হল না। অবিশ্রান্ত অশ্রাব্য গালাগালির মধ্যে এবার খুব সাবধানে স্কুটারের স্টার্ট দিল। সবুজ মাঠটা চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে। ওভারের শেষ বলটায় কি হল তাও বোঝা গেল না। শুভ অনুভব করল ওর সমস্ত শরীরটা এখন একটা তেতো স্বাদে ভরে গেছে।

.....

সুধাকর বাবু মনে করেন বয়স হলে লোকে যেমন পাল্টে যায় উনি তেমন পাল্টান নি। এই ব্যাপারটা তিনি শুধু যে মনে করেন তাই নয়, রীতিমত বিশ্বাসও করেন। আর তাই সুযোগ পেলে বলেও ফেলেন। তবে কথাটা সত্যি। বয়স মানুষকে অনিবার্য ভাবে যেটুকু পাল্টে দেয় তার বাইরে সত্যিই খুব একটা পাল্টাননি সুধাকর বাবু। যৌবনের কিছু কিছু দুঃসাহসিক কাজ বাদ দিলেও এখনও তিনি আর পাঁচজন বৃদ্ধের থেকে কম বৃদ্ধ। রূপ, রস, গন্ধে ভরা এই পৃথিবী সমস্ত আবেদন নিয়ে এখনও ধরা দেয় তাঁর কাছে। এতদিনের পাওয়া না পাওয়া লাভ ক্ষতির হিসাব মাথায় নিয়ে তবু এখনও তিনি ওই জীবনের প্রবাহকে উপভোগ করেন। এই দুর্লভ ক্ষমতা এখনও সুধাকর বাবুর মধ্যে সমান ভাবে রয়েছে। এখনো এখানকার রবীন্দ্রমঞ্চে কোন ভাল থিয়েটার বা সিনেমা হলে ছেলেকে দিয়ে পরের দু-খানা টিকিট কাটিয়ে রাখেন। এই তো সেদিন তালতলার মাঠে ভীমসেন যোশী, দীপক চৌধুরী, আমজাদ আলীর অনুষ্ঠান শুনলেন সারা রাত ধরে; মন ভরে গিয়েছিল।

নির্বিবাদী সৎ ভালোমানুষ বলে খ্যাতি বা অখ্যাতি কর্মক্ষেত্রে সারাজীবন সুধাকর বাবুর সঙ্গে সঙ্গে ছিল। পোর্টট্রাস্টের কর্মী ছিলেন আজীবন, খুব উঁচুতে নয়, আবার একেবারে নীচুতেও নয়। তবু উঁচু নীচু আর মাঝের তলার সকলের কাছেই দত্ত বাবু বা দত্ত দা ভালোমানুষ সহকর্মী ছিলেন। অজাতশত্রু হওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে দু-একজনের খুব মৃদু একটু শত্রুতা ছিল। এছাড়া সত্যি তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। সারাজীবন কর্মক্ষেত্রে শুধু তাঁর দক্ষিণ হস্তকেই ব্যবহার করেছেন; আর একটা হাত ব্যবহার করার কথা কখনো মনে হয় নি। সুযোগ যে একেবারে ছিলনা তা নয়। আশেপাশে বহু সহকর্মীকে সারাজীবন ধরে দেখেছেন , তবুও হয়ত তাই কর্মজীবন শেষ করে আজও তাঁর একখানাই পৈতৃক বাড়ী, সেটার কোনও পরিবর্ধন বা সংস্কার হয়ে ওঠেনি। তেজী শেয়ার বাজারের নামী বা অখ্যাত কোন রকম কোম্পানীর একটাও শেয়ার তাঁর নেই। গোটা কয়েক ব্যাঙ্কে কয়েকটা ছোটখাট অ্যাকাউন্ট আছে, ব্যাস, আর কিছু নেই। বাড়ীতে ভি সি আর, ভি সি পি নেই। টি ভি একটা আছে বটে, তবে সেটা ছোট আর সাদা-কালো। এয়ার কণ্ডিশনার নেই, ওয়াশিং মেশিন নেই, জিভ বার করা অ্যালসেসিয়ান নেই, অনেক কিছুই নেই। অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই। ছেলেটা বি এস সি পাশ করে বসে আছে, কি করবে ভগবান জানেন। এখনকার চাকরির বাজার ঠিক কিরকম সে সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট কোন ধারণা না থাকলেও সেটা যে আর আগের মত নেই সেটুকু জানেন সুধাকর বাবু। তাই চিন্তা আরও বেশী হয়। ছেলে যতই সাবালক হয়ে গেছে বলে মনে করুক, 'আমার জন্য কিছু ভাবতে হবে না', 'আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারব' জাতীয় কথাবার্তা যতই বলুক, সে সব যে অন্তঃসারশূন্য তা তিনি ভালই বোঝেন। আর পিতার কর্তব্য বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। সেটা ছেলের পক্ষে যতই অসহ্য হোক তবু কর্তব্য পালন তো করতেই হবে। ভাইপোরা বলছিল কলকাতায় কোনও একটা ম্যানেজমেন্ট বা কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য; তাতে নাকি চাকরি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সে তো অনেক টাকার ব্যাপার; অত টাকা কোথা থেকে আসবে।

সুধাকর বাবু তাঁর দোতলার ঘরে, রাস্তার দিকের জানলার ধারে, তাঁর বহু প্রাচীন মস্ত হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে চিন্তার এই সমুদ্র সাঁতার দিচ্ছিলেন। একটু আগে পূজোতলা থেকে ফিরেছেন, তারপর আর ঘরে আলোটাও জ্বালা হয়নি। আধো অন্ধকার এই ঘরে সুধাকর বাবু এখন সবার ভাবনা নিয়ে একেবারে একা। এরা সব ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছে, গৃহকত্রী গৃহকর্মে ব্যস্ত, কাল বিজয়া দশমী। আর ছেলের তো পাত্তা নেই সেই বিকেল থেকে। খোলা জানালা দিয়ে নিচের রাস্তা আর ঠাকুরতলার বাঁদিকটা দেখা যাচ্ছে, ভিড়ে ভর্তি! পূজো শুরু হয়েছে। ঢাকের বাদ্যি আর সঙ্গে ধুনুচি নাচ। ওই ভিড়ের মধ্যে শুভ থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। আজকাল ছেলে কখন কোথায় থাকে সে খবর সুধাকর বাবুর কাছে থাকে না। ছেলে অনেক বড় হয়ে গেছে, তারও পর যুগ পাল্টে গেছে। নিজের ছেলেকেও তাই এখন সবসময় চিনতে পারেন না।

এরকম ভাবে সুধাকর বাবুর চিন্তার সূত্রটা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে শুধুই ঘোরাফেরা করে বেড়াতে লাগল। তিনি চেষ্টা করতে লা

গলেন ভাবনাগুলোকে একের পর এক সাজিয়ে নিতে। একটা একটা করে সেই ভাবনাগুলোর সমাধান করতে। কিন্তু কিছুতেই সেহ
ৈ অস্থির সূত্রটাকে স্থির করতে পারলেন না। একবার মনে হল এমারজেন্সি লাইটের ব্যাটারীটা ফেটে গেছে, জল বেরিয়ে যাচ্ছে, ে
সটা সারাতে হবে। তার পরক্ষণেই মনে পড়ল সামনের বছর তাঁর একটা পলিসি ম্যাচিওর করবে; সেটা দিয়ে ছেলেকে কোন এক
টা কোর্সে ভর্তি করে দেওয়া যেতে পারে। এক সময় ভাবলেন এই রবিবারেই চোখের ডাক্তারের কাছে যাবেন। তারপরেই মনে হ
ল কাল দশমী, কিছু মিষ্টি কিনে রাখতে হবে, আজই কেনা উচিত ছিল, কাল আবার দাম বেড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সমাধানহীন ভাব
নার স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সুধাকর বাবু। প্রাচীন চেয়ারে একটা বৃদ্ধ শরীর অসহায় ভাবে পড়ে রইল। একসম
য় ঘরের পর্দা সরিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল আর একটি ছায়া। ‘‘কি হল, অন্ধকারে ভূতের মত বসে আছ কেন?’’ শুনতে পেলেন না
সুধাকর বাবু। ‘‘কি গো কি হল তোমার, শরীর খারাপ লাগছে?’’ একটা অত্যন্ত ব্যাকুল স্বর তাঁকে প্রশ্ন করে উত্তরের প্রতীক্ষায় র
ইল। গভীর ঘুমের ভেতর থেকে যেন জেগে উঠলেন সুধাকর বাবু। চোখ মেলে দেখলেন সামনে স্ত্রীর উদ্বিগ্ন মুখ। চারিদিকে আলে
া, ঘরে আলো জ্বলছে, মাথার ভেতরটাও অনেক হালকা হয়ে গেছে। সুধাকর বাবু বুঝলেন এবার আস্তে আস্তে সমস্ত সমস্যার সমা
ধান হয়ে যাবে।

নীচে পূজোতলায় তখন ঢাক বাজছে, কাঁসর বাজছে, ধুনোর গন্ধে আর ধোঁয়ায় ভারী হয়ে আছে বাতাস। মণ্ডপের ডানদিকে ক্লাব
ঘরের রকে তখন গোল হয়ে বসে আড্ডা জমিয়েছে শুভ, পিয়ালী, সুদীপ্তারা।

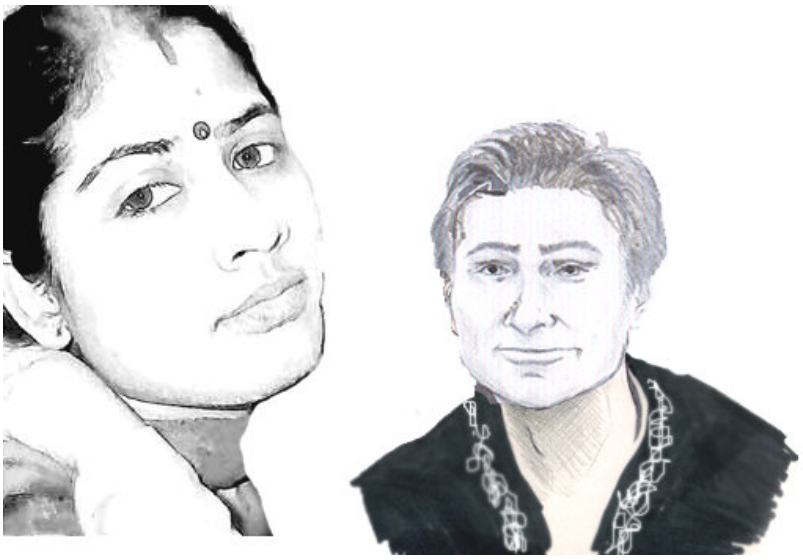

একটি বিয়ে বাড়ির গল্প

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য

বিয়ে বাড়ির হৈহল্লা এই ঘরটাতে সবচেয়ে কম। বিশাল দোতলা বাড়ির সর্বত্র এখন গমগম করছে লোক। একতলায় এই ঘরটাতেই একমাত্র তিথি ছাড়া আর কেউ নেই। সোনাদি-কে দেবার আসবাবে বোঝাই হয়ে আছে ঘরটা। আলমারি, খাট, ড্রেসিং টেবিল, ওয়াসিং মেসিন আঁটো সাঁটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরটাতে । তিথি আপাতত এই ঘরটাতেই আশ্রয় নিয়েছে। ভাবতেই পারেনি এমন একটা ঘর এখন ওর বরাতে জুটবে। নতুন আলমারিতে হেলান দিয়ে মাটিতেই বসেছিল তিথি। নতুন - নতুন গন্ধে ম-ম করছে চার পাশ। আলো জ্বালায়নি তিথি, পাছে লোক ঢুকে পড়ে । অন্ধকারে গরমে ঘেমে নেয়ে মুছে যাচ্ছে ওর সব সাজ। শাড়িটাও কুঁচকে যাচ্ছে ভীষণ। কিন্তু এই মূহুর্তে এসবে মন দিতে পারছে না তিথি।। মনটা কান্নায় ভেঙে পড়ছে। কিন্তু কান্নাটাও গলার কাছে এসে আটকে যাচ্ছে। প্রায় ঘন্টা খানেক হলো তিথি এ ঘরটাতে আছে । তার খোঁজ পড়ার সম্ভবনা খুব কম। তিথির বাবারা আট ভাই বোন। তাদের ছেলেমেয়ে নাতি, নাতনী এবং অন্যান্য জ্ঞাতিরা মিলিয়ে বাড়ি ভরিয়ে তুলেছে গত পাঁচদিন ধরে। সেজ পিসিদের অবস্থা যে বিশাল তা এই বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়। পিশেমশাই -এর আমলের ব্যবসাকে পিসতুতো দাদা আরো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলছে। তাই একমাত্র বোনের বিয়েতে ঢেলে খরচ করছে। সেজো পিসির বাড়িতে এমনিতে খুব একটা আসা হয় না তিথির। তিথির অন্যান্য তুতো ভাই-বোনেরা সবাই খুব আসে এখানে। ওদের খুব পছন্দের জায়গা সেজো পিসির বাড়ি। বড়পিসি আর ছোট পিসি তো বাইরের থেকে এসে এখানেই ওঠে। ঠান্ডার দেশে থাকে বলে এ.সি.ঘর ছাড়া ওরা থাকতে পারে না। তিথিদের পৈতৃক বাড়িটা সে তুলনায় বড়োই হীনবল। বাড়িটার বয়স এক ঝলকেই বোঝা যায়। সেখানে তিথিদের সঙ্গে ছোট কাকা থাকে। ছোটকাকা বিয়ে করেনি বলে ঐ বাড়িতে যাবতীয় গৃহস্থালী দায়িত্ব তিথির মার ওপর। অবশ্য তিথিদের বাড়িটা এই বাড়িটার মতো বড়ো না হলেও, সেটা নিতান্ত শূন্য নয়। তিথিরা পাঁচ ভাই বোন। তিথি এ কথাটা বলতে ছোট বেলা থেকেই ভীষণ লজ্জা পায়। সবাই যেন কি রকম অবাক চোখে তাকায় কথাটা শুনে বন্ধুরাও কম ইয়ার্কি মারে না। বিষয়টা নিয়ে তিথির তখন মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। অনেকটা সে কারনেও বোধ হয় তিথিরা এ বাড়িতে আলোচনার বস্তু। ছোট বেলায় পিসিরা যখন মজা করতে বলতো--এ্যাই তুই কত নম্বর ? ভীষণ রাগ হয়ে যেত তিথির। মা তখন কেমন যেন অসহায় মুখ করে তাকাতো। তিথির আগে আছে দুই দাদা এক দিদি। তিথি আর তীর্থ যমজ। তিথির মনে আছে এ নিয়ে রোজ মাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। ছোটবেলা থেকে তিথি ওদের বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্যটা খুব ভালো করে বুঝতে পারতো। বড়ো জ্যেঠা ছাড়া সকলের সঙ্গেই তিথিদের মৌখিক যোগাযোগ আছে। যাতায়াত প্রায় নেই বললেই চলে। বড় জ্যেঠার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সব ভাই বোনেরা একরকম বাধ্য। সবার বাস স্থান আলাদা হয়ে হয়ে গেলেও বাড়ির সবচেয়ে প্রবীন হিসেবে, এখনও বড় জ্যেঠার মতামতকেই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিথিদের এটা পারিবারিক ঐতিহ্য বলা যেতে পারে। বড় জ্যেঠার সামনে এখনো বাবারা মাথা নীচু করে রাখে। তিথির অসহ্য লাগ ব্যাপারটা । পৃথিবীর সব রকম ভন্ডামি এদের মধ্যে আছে বোধ হয়।

:

তিথি ধীরে ধীরে দাঁড়ালো। ভীষণ গরম লাগছে। শাড়িটা ঠিক করছে দ্রুত । বটল গ্রীণের ওপর অফ্ গোল্ডের সুতোর কাজ। দিদিব . কাছ থেকে নিয়ে এসেছে তিথি শাড়িটা। তিথি গিয়েই পছন্দ করে কিনে এনেছিল দিদির জন্য। শাড়িটা হাতে নিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলা ওকে। বিয়ের পর এটাই ছিলো প্রথম উপহার ওদের বাড়ির তরফ থেকে দাসের সঙ্গে যুক্তি করে লুকিয়ে কেনা হয়েছিলো শাড়টা। এখনও বাবা-মা জানে না কিছু। আর তীর্থকে জানানোর প্রশ্নই ওঠে না, যা হাঁদা ছেলে। কি বলতে কি বলে বসবে । এখানে

আসার আগে আবারও দিদির কাছ থেকে লুকিয়ে এসেছে তিথি শাড়িটা। ভাগ্যিস মা আসেনি। তা না হলে ঠিক ধরা পড়ে যেতে হ তো। ওদের গোনগুনতি ভালো শাড়ির মধ্যে এই নতুন শাড়িটাকে চিনে ফেলা কোনও ব্যাপারই না। এখন তিথির মনে হচ্ছে শাড়ি টা এখনে না নিয়ে এলেই ভালো হতো বোধ হয়। ছোট পিসির মেয়ে মৌগি চিরকালই ভীষণ ঠোঁট কাটা। বলেই দিলো--

---বাঃ, এতদিনে এই প্রথম তোকে দারুণ চয়েজেব্‌ল শাড়ি পরতে দেখলাম। আগে যা পরতিস -- এরকম পরলেই তো পারিস।

ভীষণ রাগ হলেও কোন উত্তর দেয়নি তিথি। এদের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতেই ভালো লাগে না তিথির। বড়পিসির বড় নাতনির কথা, সে আবার মিছরির ছুরি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো --

---ও ভাবে বলিস না মৌলি।

---তারপরেই বলে উঠ্‌লো --

---শাড়িটা কি তোর নাকি? প্রশ্নের মধ্যে এমন একটা বিদ্রুপ ছিলো যা তিথির সর্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দিলো। খুব সংক্ষেপে সতর্কভাবে মি থ্যেটা বলেছিলো তিথি -

--হ্যাঁ।

মিথ্যেটা না বললে বিপদ ছিলো। দিদির শাড়ি বললে আরো বিপজ্জনক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো। দিদি এখন এ বাড়ির মানুষগু লার কাছে প্রায় একটি নষ্ট মেয়ে। তিথির মা-বাবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকার সেটাই মুখ্য কারন। তিথিরও আসার কোন হ চ্ছে ছিল না। সেজ পিসি প্রায় জোর করেই আনিয়েছে তিথিকে। তীর্থকে নিয়ে ছোটোকাকুর সঙ্গে তিথি এখানে এসে পৌঁছেছে পাঁ চদিন আগে। সেজপিসিকেও না করা যেত, কিন্তু বড় জ্যেঠুর আদেশ বাবা আগ্রাহ্য করতে পারেনি। তিথিকে এখানে আনতে ব্যস্ত ি ছলো সবাই । কারনটা তিথিও কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলো। দিদির বেলায় যে অসাবধানতার জন্য একটা অঘটন ঘটে গে ছ, সেটাই এবার শোধরাতে চাইছে সবাই - বাবা মাও। তিথির এখনও গ্র্যাজুয়েশান কম্‌প্লিট হয়নি, তবুও একরকম পাত্রী দেখানো র জন্যই তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত করে ফেলতে হচ্ছে তার বেলা পাছে দেরী করলে দিদির মতো এ কটা কান্ড ঘটিয়ে ফেলে তিথি । অথচ দিদি এই তথাকথিত কান্ডটা ঘটিয়ে সুখে আছে।

:

একটা নার্সিং হোমে রিসেপশানিষ্টের চাকরি পেয়েছিল দিদি। খুব বেশী কিছু মাইনে ছিল না বলে প্রথম থেকেই বাড়ির সবাই বাধা দিয়েছিল দিদিকে। বড় জ্যেঠু দিদিকে ডেকে বলেছিল --

---বীথি, এই চাকরীটা তোমায় ছাড়তে হবে। এরকম চাকরী আমাদের বংশে কেউ কখনো করেনি।

---জ্যেঠু, চাকরীটা আমাদের বংশের কেউ আমাকে দেয়নি। সুতরাং তাদের কারোর কথায় আমি ওটা ছাড়বো না।

বড় জ্যেঠু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির অন্যান্যদের অবস্থা আরো তটস্থ। কিন্তু সবাইকে অবাক করার জন্য আরো একটা কাজ করা র বাকি ছিলো তখনও। দিদি চিরকালই ভীষণ জেদী আর ঠান্ডা মাথার। পৃথিবীর কাউকেই বোধহয় ও ভয় পায় না। তাই খুব সহ জেই অ-হিন্দুকে বিয়ে করে ফেলতে পেরেছিল। উজানদা ঐ নার্সিং হোমেরই অ্যাসিসটেন্ট সার্জেন হিসাবে কাজ করতো তখন। বি য়ের দিনও দিদি রোজকার মতো বাড়ি ঢোকেনি। একখানা চিঠি রেখে গিয়েছিলো। মার কান্না আর বাবার চিৎকারে প্রথমে বহুক্ষণ ি বষয়টা বুঝতেই পারেনি তিথি। পরে ছোটদা বলেছিল। কে জানে কেন, তিথি মনে মনে একটু খুশিই হয়েছিল। এরপর থেকে তিথি অনেকবার দেখা করেছে দিদির সঙ্গে নার্সিং হোমে। উজানদাকেও বেশ ভালো লেগেছে তার। দিদির বিয়ের প্রায় আটমাস পরে দা দাদের সঙ্গে ওর বাড়িতে গিয়েছিল তিথি। তিথি শুধু এটুকু বুঝেছিল দিদি বেঁচে গেছে।

:

লোক বাঁচিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল তিথি। এক্ষুনি কোনও পরিচিত লোকের মুখোমুখি হতে চায় না তিথি, তার মুখটা একদম ঘেঁটে ে গছে। জল দিয়ে ধুয়ে মুখটাকে প্রসাধনহীন না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না সে। এমনিতেই তিথির সাজতে একদম ভালো লাগে না। চুল আঁচড়ায় না বলে রোজই মায়ের কাছে বকা শোনে । মা, রোজই জোর করে বেঁধে দেয় চুলটা। আর মুখে বলেই যায় -

--- ভগবান এই চুলটাই তো দিয়েছে। আর তো সবেই অন্ধকার। এটা উঠে গেলে আর অন্যের ঘর করতে হবে না।

এরপরই মা স্বগতোক্তির মতো বলে -- তা ভালোই হয়েছে। শাপে বর যেটার রূপ ছিলো সেটাকে তো ঘরেই রাখতে পারলাম না। বেজাতে চলে গেলো। সবাই আমার কপাল। জন্মের দোষ খন্ডাবে আর কে।

---মা আবার পুরানো কাসুন্দী শুরু করে । তারা চিরকালই তাচ্ছিল্য পেয়ে এসেছে পরিবারের অন্যান্যদের কাছে। বাবার আয় ভা য়েদের মধ্যে সবচেয়ে কম কিন্তু ব্যয় সবচেয়ে বেশী । এতগুলো ছেলে মেয়ে। ভাসুর-দেওর-ননদেরা কখনও ভালো চোখে দেখেনি তাঁকে। অবিবেচকের মতো কাজ বলে সর্বক্ষণ কথা শুনিয়েছে। মা একাই বলেচলে কথাগুলো ---

--- তা বলে কি কেউ এক পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। উঃ সে বেলা কাঁচকলা। খালি মুখে মুখে। উল্টে দিয়ে দিয়ে এমন একটা অ নাসৃষ্টি কান্ড ঘটালো।

:

অনাসৃষ্টি কান্ড বলতে মা দিদির বিয়েটাকেই বোঝায়। যেন লোকেদের কুনজরেই এটা ঘটেছে, দিদি কিছু করেনি। তিথি বুঝতে পা

র মা হয়তো সান্ত্বনা পাবার জন্যই এরকম বলে যায়। তখন মার জন্য তিথির ভীষণ কষ্ট হয়। বেচারী মা, খুব চালাক চতুর নয়। শুধু মা কেন, বাবাও প্রায় একই ছাঁচে গড়া। সুতরাং তাদের পরিবারের কাছে সুবিবেচক হয়ে উঠতে জ্যেঠার খুব অসুবিধে হয় নি।

:

--- তিথি, কি রে কোথায় ছিলি? তখন থেকে খুঁজে যাচ্ছি।

--- একটু নীচে গিয়েছিলাম। তুই যা আমি আসছি।

বিয়ে শুরু হয়ে গেছে। মৌলিকে সেখানে পাঠিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মুখটা ধুলো তিথি। এখন বেশ আরাম লাগছে। চুলে গুচ্ছ ক্লিপ লাগিয়ে দিয়েছে এরা। এসব কায়দার চুল বাঁধা অতি অসহ্য লাগে তার । ক্লিপের জন্য মাথাটা ব্যথা করছে। চুলটা তাড়াতাড়ি আঁচড়ে একটা আলগা হাতে খোঁপা করে ফেললো তিথি। মৌলির কাছে ধরা না পড়লে এখন কিছুতেই যেত না বিয়ের ওখানে । কিন্তু এখন যেতেই হবে।

:

সোনাদি হাসি হাসি মুখে বিয়ে করছে। বেশ লাগছে দেখতে। সোনাদির পেছন দিকেই, মৌলিরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফটো উঠবে বলে এই স্থান নির্বাচন। মৌলি ওকেও হাত নেড়ে ডাকছে। তিথি মরে গেলেও ওখানে যাবে না। ছবি তোলার মতো ভয়ঙ্কর কাজ আর নেই। সেজপিসির ছেলেরও বিয়েতে এসে অনেক ছবি উঠেছিল তিথির। দেখে অনেকেই আড়ালে হেসেছিল। তিথি মন দিয়ে বিয়ে দেখছে। বাবা - মার জন্য খুব মন খারাপ লাগছে। ইস্ ওদেরও খুব ইচ্ছেছিল । দিদির বিয়েটা এরকম ভাবে দেবে। এত জাঁকজমকের বাহুল্য হয়তো থাকতো না, তবুওফরম্যাট টা একই হতো। তবুও দিদি খুব ভালো আছে কথাটা ভাবতেই মনটা হালকা হয়ে যায় তিথির।

---এটা কি করেছিস ?

---ন্যাকা, জানো না, না সব সাজ তুলে ফেলেছিস্ কেন, জানিস না এখনই আবীর এসে যাবে। ওরা দেখবে তোকে।

---সে তো সকাল থেকেই দেখছে।

---আবীর তো আর দেখেনি। ওর বাবা - মা দেখেছে।

:

তিথি আর উত্তর না দিয়ে বিয়ে দেখায় মন দিলো। তিথি এখন বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছে। আবীরের বাবা - মার ওকে একটুও পছন্দ হয় নি। এই খবরটা তিথি নিজেই আবিষ্কার করতে পেরেছে একটু আগে।। তাই বেশ মনটা ফুরফুর লাগছে। এতদিন তা না হলে খুবই দমচাপা লেগেছে তার। সেজপিসির ছেলের বৌ -এর মাসির ছেলে আবীর। খুবই ভালো চাকরী - বাকরী । সেজো পিসিই সম্বন্ধটা করেছিলো। বেচারী এখনও জানে না। ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে আবীরের বাবা - মা আজ সকাল থেকেই এসে ছিলো, নানা ভঙ্গীতে যাতে তিথিকে দেখা যায়। আর আবীর আসবে রাতে। পটিয়সী সাজে দেখবে বলে। না, সেটা তিথি হতে দেবে না। আর অবশ্য দরকারও নেই। মুখ ধুয়ে চুলটা বেঁধে হেলে দুলে উঠছিল তিথি, বিয়ে দেখতে । চিলে কোঠার ঘরে বৌদির আর তার মাসির গলায় নিজের নাম শুনে একটু ধমকে দাঁড়িয়ে ছিল তিথি। মাসি রাজি হতে পারছে না বৌদির চেষ্টা সত্ত্বেও ---

---না মেয়ে কেন খারাপ হবে। তাছাড়া আজকাল ওরকম ঘটনা অনেক বাড়িতেই ঘটে। সেসব কিছু নয়। কিন্তু আবীরের পাশে ওকে একেবারেই মানাবে না রে। তুই-ই বল্ মানাবে।

:

এই পর্যন্ত শুনেই চলে এসেছিলো তিথি। যদিও তিথি জানে এই সম্বন্ধটা নাকচ হবার পেছনে এরা দিদিকেই দায়ী করবে। হঠাৎ পেটে একটা গুঁতো খেয়ে চমকে উঠলো তিথি। মৌলি কখন যেন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন ওকে গুঁতো মেরে কি যেন দেখানোর চেষ্টা করছে। তিথি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারছিলো না, এখন হঠাৎ চোখ পড়লো চারধারে ঘিরে থাকা ভীড়ের একটা কোনায়। পিসতুতো দাদার বৌ -এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় ছ ফুটলম্বা একটা মানুষ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এবং একই সঙ্গে অনেকগুলো কৌতুহলী চোখ চেয়ে দেখছে দৃশ্যটা । এমনকি বিবাহরত সোনাদিও সামিল সেখানে। তিথি আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি ওখানে। ভালো লাগছিল না। মনটা বেশ অস্থির লাগছে। এসময় দিদিটা পাশে থাকলে খুব ভালো হতো।

:

রাতে সোনাদির বাসর জমে উঠেছে। গান আর কথায় কেউ হার মানতে চাইছে না। নতুন জামাই বাবুও কিছু কম যাচ্ছে না। তিথিকে অস্থির করে তুলতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে মৌলি। আবীরকে শুনিয়ে নানা অর্থবোধক কথা বলে যাচ্ছে এক নাগাড়ে। সিন ক্রিয়েট হবার ভয়ে উঠেযেতে পারছে না তিথি। এভাবে মানুষকে অপ্রস্তুত করতে কি যে মজা পায় মৌলি কে জানে। আবীর অবশ্য তাপ - উত্তাপ বিহীন। ভুলেও একবারও আর তাকায়নি তিথির দিকে। অথচ বেশ সহজভাবে গল্প করে যাচ্ছে সবার সঙ্গে। তিথিও বাদ পড়ছে না। শুধু তিথির উত্তর দেবার সময় ঘরটা প্রায় নীরব হয়ে যাচ্ছে। এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা এড়ানোর জন্যই বোধহয় এখন তিথির সঙ্গে আবীর বিশেষ কথা বলছে না। কিছুটা পরিত্রাণ পেয়েছে তিথি। শুধু মনে খচ্খচানি কাজ করছে। ছেলেটা কি হতাশ হয়েছে তাকে দেখে । নিশ্চয়ই তাই। তা না হলে, মুগ্ধতা শূন্য স্বাভাবিক কথাই বা বলছে কি ভাবে। কিন্তু প্রশ্নটা এখানেই শেষ হচ্ছে না।

তিথির ভেতরে অদ্ভুত একটা আফশোস কাজ করছে। ছেলেটা তাকে পছন্দ করলো না --- এই আফশোসটা কেন হল। আপাততঃ এটাই বেশী কষ্ট দিচ্ছে তিথিকে। তাকে যে এরা অপছন্দ করেছে এটা সে অনেকক্ষণ জেনে গেছে। আর আবীরকে দেখার পর সে স ম্পর্কে কোনও সংশয় নেই, আবীরের পাশে কোনও ভাবেই তাকে মানায় না। তবুও কেন যে কষ্টটা পাচ্ছে।

:

ভোরের দিকে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিথিরও চোখ দুটো লেগে গিয়েছিল। । মৌলির একটা হাত ঘুমের মধ্যে ওরমুখে এসে বেকা য়দার লাগলো, ঘুম ভেঙে গেল তিথির। মৌলির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পাশ ফিরে শুলো তিথি। আর তখনই চোখে পড়লো -- আবীর অক্লান্ত মুগ্ধতায় চেয়ে আছে তার দিকে।

শিরোনামাহীন

সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়

শিঞ্জিনীর বাবা লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। লোকটা ট্রাম কোম্পানিতে চাকরি করে। চাকরিটা যে খুবব সুবিধের নয় তা গত তিনবছরে আমি জেনে গেছি। কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা গোটা পৃথিবীর ওপর সারাক্ষণ তিতিবিরক্ত হয়ে থাকেন, শিঞ্জিনীর বাবা সেই দলের । একটু আগে আমি যখন এ বাড়িতে ঢুকি তখন ভদ্রলোক বাজারে বেরোচ্ছিলেন। পরণে লুঙ্গি পাঞ্জাবি, হাতে বাজারের থলি। সদরের কাছে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, হাতের প্রায় শেষ হয়ে আসা বিড়িটায় দুটো ছোট ছোট টান দিয়ে বললেন, মাস্টার, দেশের হালটা দেখেছ কি অবস্থা করে ছেড়েছে এরা? গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাটাকে প্রায় ধবংস করে দিয়েছে!

আমি চোখ তুলে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার দেশটাকে দেখি। দেশ মানে আপাতত এই পাড়া।আটফুট রাস্তার এখানে - ওখানে গর্ত, পথের দুধারে গাছপালা, নতুন গজিয়ে ওঠা আপার্টমেন্টের সারি। শিঞ্জিনীদের পুরনো একতলা বাড়িটাই শুধু এখনও প্রমোটারের হাতে পড়েনি। সবই ভোরবেলায় রোদের সোনালি পাতে মোড়া। চেনা একটা কুকুর এসে আমার গা শোঁকে। লেজ নাড়ে। দেশের যে খুব খারাপ হাল হয়েছে তা আমি বুঝতে পারি না। একটু মাথা নেড়ে ভেতরে ঢুকি।

পড়াতে শুরু করবার আগে শিঞ্জিনীর মা রোজই আমাকে কড়া করে এক কাপ চা দিয়ে যান। ইদানিং পড়াতে বসে আমার খুব ঘুম পায়। আজ কড়া চা-তেও কাজ হচ্ছে না। মাথাটা ভারী হয়ে আছে।

আপনার বোধহয় রাতে ভাল ঘুম হয়নি, মানুদা। তাছাড়া কদিন দেখছি খুব অন্যমনস্ক থাকেন। পড়াশুনো থাক, আপনি বরং আজ বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।

কথাটা বলে হাসল শিঞ্জিনী। অনিদ্রায় ক্লান্ত চোখদুটি তুলে আমি টেবিলের উল্টোদিকে বসা শিঞ্জিনীর মুখখানা দেখি। বড় বড় চোখ দুটিতে বুঝি কৌতুকই ফুটে আছে। কত আর বয়স হবে মেয়েটার? হয়ত ষোল পেরিয়েছেসবে। গোলাপি স্কার্টের ওপর সাদা টপ পরে আছে। বলতে গেলে আমর চোখের সামনেই ধীর কিন্তু নিশ্চিত গতিতে পূর্ণ নারীত্বের দিকে এগোচ্ছে শিঞ্জিনী। অজান্তেই আমার চোখ চলে যায় তার শরীরের দিকে। আমি জানি আমারর দৃষ্টির সঙ্গে পাপ মিশে আছে। আমি সুদেষ্ণাকে ভালবাসি, শিঞ্জিনীকে নয়। যদিও আমি জানি সুদেষ্ণাকে আমি কোনওদিন পাব না, তবু আমি তার সব উপেক্ষা সব অপমান সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করেছি। এই ছোট্ট সুন্দর নিষ্পাপ মেয়েটিকে দেখে তাহলে আজ পাপ জেগে উঠল কেন আমার মনে?

প্রাণপণে দুচোখের পাতা থেকে ক্লান্তি আর অবসাদ তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে আমি চেয়ারে সোজা হয়ে বসি, মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলি, আজ তোমাকে দুটো প্রশ্ন লিখিয়ে দেব। মাধ্যমিকের কিন্তু আর খুব বেশি দেরি নেই, শিঞ্জিনী।

শিঞ্জিনী আমার কথাটা শুনল কি না বোঝা গেল না। সে এখন খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। গত তিনবছর ধরে শিঞ্জিনীকে আমি পড়াতে আসছি। আগে সন্ধেবেলায় আসতাম, টেস্ট পরীক্ষার পর স্কুল নেই বলে ইদানীয়ং, সকালবেলায় আসি। তাতে বিকেলটা আমার ফ্রি হয়ে যায়। কথাটা বোধহয় একটু ভুলই বলা হয়ে গেল, ঠিক ফ্রি নয়, ওই সময় সপ্তাহে দুদিন আর একটা টিউশান ধরেছি। সোম থেকে শুক্রবার। ঢাকুরিয়া দাসপাড়ায়।

শিঞ্জিনীর যে আজ পড়ায় মন নেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এই বয়সের মেয়েদের আমি ঠিক বুঝতে পারি না। বাইরে নভেম্বরের চমৎকার একটা দিন ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলছিল। বড় রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে বলে এই পাড়াটায় ভিড়ভাট্টা কম। তবু স্কুলগামী শিশুদের কোলাহল আমি শুনতে পাচ্ছি।

শিঞ্জিনী আমার কথার কোনও জবাব দিচ্ছে না। হয়ত আমার কথাটা ভাল করে শোনেওনি সে। তার দৃষ্টি এখন দূরের গাঢ় নীল আকাশে। সেখানে আজ মেঘ নেই, পাখি নেই। বাতাসে হিমের স্পর্শ। শীত আসছে। আর কদিনের মধ্যেই কলকাতায় পশমের কল্লো

ল শুরু হবে। বাইরে এখন সোনালি রৌদ্রের ঝর্ণাধারা বইছে আর ঘরের ভেতরে তারই আভায় শিঞ্জিনীর দূরমনস্ক কচি মুখখানা ে দেখতে দেখতে ছোট একটা শ্বাস ফেলে আমি বলি, এবারে শুরু করা যাক, শিঞ্জিনী, আর দেরি নয়!

শিঞ্জিনী ঘাড় ঘুরিয়ে একবার আমাকে দেখে, তারপর ফিক করে হেসে ফেলে বলে, আপনার চোখে কিন্তু এখনও ঘুম, মানুদা!

আমি ভয়ংকর চমকে উছি। শিঞ্জিনী কি আমার সব ব্যর্থতা সব হতাশার কথা জেনে গেছে? ও কি জানে সুদেষ্ণার কথা? সুদেষ্ণার সঙ্গে আমার শেষ দেখা মাসখানেক আগে, গোলপার্কে। সুদেষ্ণা বলেছিল, তুমি কিন্তু অনেকদিন আমাদের নতুন ফ্ল্যাটে আসনি, মা নুদা! মা প্রায়ই তোমার কথা বলেন, আসলে পুরনো পাড়ায় আর যাওয়াও হয় না... তোমার মা ভাল আছেন? জান, আমার আর একটা প্রমোশন ডিউ হয়ে গেছে... তুমি কিন্তু ঠিক আগের মতই রয়ে গেছ।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে রাতে আমার ভাল ঘুম হয়নি। কদিনই এরকম হচ্ছে। ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম, ঘুমের ভেতরে অদ্ভুত সব স্বপ্ন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে জাগরণের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে আমি যার কথা ভাবি সেই সুদেষ্ণা কিন্তু কোনওদিন স্বপ্নে আমাকে দেখা দেয়নি। স্বপ্ন যারা আসে তারা বোধহয় সকলেই আমার চারপাশের মানুষ। বিষাদগ্রস্তমুখ, স্বপ্নভঙ্গের পর আমি কারও কথা মনে করতে পারি না। প্রকৃত কোনও কারণ নেই, বাস্তব কোনও সম্ভাবনাও নেই, তবু এক একদিন সন্ধেবেলায় পশ্চিমের আকাশ যখন গাঢ় লাল হয়ে ওঠে তখন কেন জানি আমার মনে হয় সুদেষ্ণা একদিন আমারই হবে, জলভরা চোখদুটি তুলে বলবে, মানুদা, এই দেখ, আমি তোম ার কাছেই ফিরে এলাম।

বাইরের ঘরে কলিংবেলটা বেজে উঠেছে। কেউ এল বোধহয়। কেউ গিয়ে দরজা খুলে দিল। আর অমনি কলকল করে কথা বলে উঠল অচেনা এক নারী। এই বাড়িটায় কত লোক আসে। আমি তাদের কাউকেই চিনি না।

শিঞ্জিনী উৎকর্ণ হয়েছিল। কি ভেবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বকুলমাসিরা এলেন বোধহয়। আজ পড়াশুনো থাক, মানুদা।

।। দুই ।।

টেবিলের ওপর অনেকক্ষণ হাতটা বিছিয়ে রেখেছি। একটু ধরা ধরা লাগছিল।

লোকটা ঝুঁকে পড়ে খুব মনোযোগ দিয়ে হাতের রেখাগুলো দেখছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম লোকটার ভূরুতে পাক ধরেছে। বয়স প ঞ্চাশের ওপরেই হবে। খুব অল্প বয়স থেকে বেঁচে থাকবার জন্যে কঠোর সংগ্রাম করলে মানুষের যেরকম চেহারা হয় লোকটাকে ে সরকমই দেখতে। তোবড়ানো কৌটোর মত মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল, অধিকাংশই পাকা। চশমা নাকের ও পর ঝুলে পড়েছে। গায়ে ময়লা নীল শার্ট, পরণে ট্রাউজার্স। চেহারায় আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। কলকাতার রাস্তায় এরকম চে হারার লক্ষ লক্ষ লোক ঘুরে বেড়ায়। স্বাভাবিক অবস্থায় কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

উল্টোদিকের চেয়ারে বসা রতন আর বাদল খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে লোকটার কাজকর্ম দেখছিল। ওরা দুজনেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছুই নেই। ফুটপাতের চায়ের দোকান বলেই কিনা কে জানে, রামলাল টিউবলাইট লাগায়নি। ঘরের অ ল্প আলোয় লোকটা মুখ তুলল, তারপর খুব চিন্তিত হতাশ গলায় বলল, আপনার বয়স কত ?

আটাশ।

চাকরি - বাকরি কিছু করেন ?

না।

লোকটা একটু অবাক হয়ে বলল, মানে? চলছে কি করে?

টেবিলের ওপর থেকে রতন উত্তরটা দিল, ওর ডজন খানেক পোক্ত টিউশনি আছে। বিশুদা! এখন তো প্রাইভেট টিউটরদের রমর মা বাজার।

লোকটা কথাটা কানে তুলল না, বলল, বাড়িতে কে কে আছেন?

মা। দিদি ছিলেন, তার বিয়ে হয়ে গেছে।

বলে চকিতে একবার রতন আর বাদলের মুখ দেখে নিলাম। ওরা দুজনেই আমার ছোটবেলার বন্ধু। যে কথাটা বলেছি সেটা মিথ্যে নয়, আবার পুরো সত্যি নয়। বছর দুয়েক আগে আমার দিদি একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। বি এ পাশ করেছিল, টিউশনিও করত। ছেলেটা ছিল ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, উড়িষ্যায় বাড়ি। কি করে ভাব - ভালবাসা হয়েছিল তা কোনওদিন জানতেও পারিনি। প্রথম প্রথম কিছুদিন চিঠিপত্র লিখত। তাতে ঠিকানা থাকত না। বছরখানেক হল কোনও খোঁজ নেই।

লোকটা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে পকেট হাতড়ে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে উদাস গলায় বলল, আপনার হ াতে ভাল কিছু নেই। সামান্য যা কিছু প্রাপ্তি তা-ও চল্লিশের পর।

সামান্য কিছু প্রাপ্তির আশায় আমাকে আরও বারো বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে তেমন বিশ্বাস না থাকলেও আ মার মনটা খারাপ হয়ে এল। লোকটা উঠবার উপক্রম করতেই আমি বললাম, কিছুই কি ভাল নেই?

অজান্তেই আবার খোলা হাতের পাঞ্জা বাড়িয়ে দিয়েছি। আমার গলায় কাতরতা ফুটে উঠল কি না কে জানে? চশমা ঠিক করে নিয়ে লোকটা একটু হাসল, আমার বাড়িয়ে দেয়া হাতের দিকে না তাকিয়েই বলল, আছে। একটা জিনিস ভাল আছে আপনার হাতে তবে সে জিনিস আপাতত আপনার কোনো কাজে লাগবে না। এ গ্রেট লাভ ! হ্যাঁ, আপনার জীবনে একটা বড় ভালবাসা আসবে!

কথাটা শেষ করে ম্যাজিশিয়ানের মত উঠে গেল লোকটা। আমরা তিন বন্ধু কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে বসে রইলাম। তারপর রতন চোখ টিপে বলল, আসবে কি রে ! এসেই গেছে বল! সেই সুদেষ্ণা না কি যেন নাম, তোর সেই ছাত্রী, হেভি দেখতে ছিল... বল না, গাঙ্গুলিবাগানের দিকে থাকত...

রতন কথাটা শেষ করল না। বাদলও মিটিমিটি হাসছিল। হায়, ওরা জানে না সুদেষ্ণা আমাকে ভালবাসেনা, কোনওদিনই বাসত না। তবু কেন জানি মনে হয় লোকটার ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে না-ও হতে পারে। এটা ঠিক, সুদেষ্ণারা যখন গাঙ্গুলিবাগানে থাকত তখন কিছুদিন আমি ওকে অংক শেখাতে গেছি। বারদুয়েক ভাড়া বাড়ি পাল্টাবার পর মাস ছয়েক হল সুদেষ্ণারা ঢাকুরিয়ায় ওদের নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গেছে। রতন বা বাদল তখনও এসব খবর জানে না। জানবার কথাও নয়। রতন তার নতুন চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। বাদল ঠিক একটা অর্ডার সাপ্লাই-এর কাজ নিয়েছে, সারাদিন ব্যারাকপুর থেকে বনগাঁ চষে বেড়ায়। ওরা জানে না সুদেষ্ণা এখন বড় চাকরি করে।

পকেট থেকে ফিল্টার উইলস্-এর প্যাকেট বার করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে রতন বলল, নে।

বাইরে গাঢ় হয়ে সন্ধে নামছিল। রামলালের দোকাল থেকে দূরের বাসস্ট্যান্ড দেখা যায়। অফিসফেরত ক্লান্ত মানুষেরা ঘরে ফিরছে। কোথায় একটা কবিতায় পড়েছিলাম এ সময় নিজস্ব নারীর কাছে ফেরে মানুষ। আমাদের নিজস্ব কোনও নারী নেই। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে আমরা তিনজন দূরের দিকে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ রতন বলল, বিশুদার কথা কিন্তু ফলে যায়। আমি কয়েকটা কেস জানি। মুড়ে না থকালে লোকটা সহজে কারও হাত ফাত দেখতে চায় না। শেয়ালদা গিয়েছিলুম আছে, ধরে নিয়ে চলে এলুম।

রামলালের দোকানে আমি ঢুকেছি সবার পরে। আমি যখন ঢুকি তখন বাদলের হাত দেখা চলছিল।

বাদল বলল, বিশুদার কথামত তাহলে এবার আমার একটা চাকরি হতে যাচ্ছে?

বাদলের গলায় কীই ছিল, রতন উত্তর দিল না। কিন্তু গ্রেট লাভ মানে কি ? মহান প্রেম? ভাবতে ভাবতে আমি উঠে দাঁড়াই। আমার বুক কাঁপে।

রতন বলে, যাচ্ছিস?

যাই।

বাইরের কোলাহলে বেরিয়ে এসে ভেতরে এক অদ্ভুত বেদনা অনুভব করি। সত্যিই কি কোনও মহান প্রেম অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে? খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে জ্যোতিষশাস্ত্র। ল্যাম্পপোস্টের অজস্র আঁকিবুকিতে ভরা নিজের ডানহাতের পাঞ্জা চোখের সামনে মেলে ধরি আবার।

:

।। তিন ।।

ওমা, এতদিন পর আমাদের কথা মনে পড়ল, মানু?

দরজা খুলে মাসিমা বললেন। টিপ করে একটা প্রণাম সেরে নিয়ে বললাম, আজকাল বড় একটা সময় পাই না, মাসিমা। সকালবিকেল টিউশনি থাকে।

সুদেষ্ণা বলছিল, গোলপার্কে একদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি বলেছি ধরে নিয়ে এলি না কেন? সেই গৃহপ্রবেশের দিন এসেছিল, তারপর তো তোমার কোনও খবর নেই।

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকি। মাসিমা বললেন, তোমার মেশোমশাইও তোমার কথা বলছিলেন। এসো, ভিতরে এসো।

বেশ বড়ই ফ্ল্যাটটা। গৃহপ্রবেশের দিন খেয়াল করে দেখা হয়নি। এখনও বোধহয় ভাল করে সাজানো হয়নি। পুরনো আসবাব এই নতুন ফ্ল্যাটে একটু বেমানানই লাগছে। পাশের ঘর থেকে সুদেষ্ণার বন্ধুদের হা-হা হি-হি শব্দ ভেসে আসছিল। সুদেষ্ণার গলাও পাওয়া যাচ্ছে মাঝেমাঝে। পুরুষকণ্ঠে দু-কলি রবীন্দ্রসঙ্গীত ভেসে এল। বুঝতে পারি এ বাড়িতে একটা উৎসব চলছে তখন।

বাইরে বিকেল ফুরিয়ে এল। ঘরের ভেতরে উজ্জ্বল নিয়ন আলো। মাসিমা বললেন, সুদেষ্ণার একটা প্রমোশন হয়েছে বলে ও বন্ধুদের একটা পার্টি দিয়েছে আজ। খুব ভাল করেছ আজ এসে। তারপর কি ভেবে ডাকলেন--- সুদেষ্ণা ! সুদেষ্ণা!

যাই, মা!

ভেতর থেকে সাড়া দিয়েছে সুদেষ্ণা। তারপর এক ছুটে বেড়িয়ে এল ডাইনিং স্পেসে। চন্দনরঙের একটা তাঁতসিল্কের শাড়ি পরেছে। হাতে কগাছা চুড়ি। কপালে বড় খয়েরি টিপ, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিকের ছোঁওয়া। এই সামান্য প্রসাধনেই সুদেষ্ণাকে আজ দেবী প্রতিমার মত দেখাচ্ছে। মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে আমি সুদেষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

তির্যক ভ্রূকুটি হেনে সুদেষ্ণা বলে, পথ ভুলে এলে বুঝি? যাক গে, ভাল দিনেই এসেছ। এস--

বলে এগিয়ে এসে আজই প্রথম আমার হাত ধরল সুদেষ্ণা। আমি এখন সুদেষ্ণার শরীরের ঘ্রাণ পাচ্ছি। বুকের খুব গভীরে আমি আসন্ন এক ভূমিকম্পনের আগমনধ্বনি শুনতে পাই। চকিতে একবার দেখতে পাই সেই জ্যোতিষীর মুখখানা।

ঘরের ভেতরে তিনটি মেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। একটি ছেলে খাটের ওপরে আধশোওয়া। অভিজাত চেহারায় ছেলেটির চোখে দামি ফ্রেমের হাই-পাওয়ার চশমা। মৃদু একটা বিদেশি মিউজিক বাজছে টেপরেকর্ডারে।

সুদেষ্ণা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল, এর নাম বিদিশা, এ হচ্ছে সায়নী আর এ নীলা। আর ইনি হচ্ছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ দেবপ্রিয় রায়।
চারজোড়া চোখ এখন আমার দিকে স্থির। হাত জোড় করে নমস্কার করতে গিয়ে শুনতে পেলাম সুদেষ্ণা বলছে, ইনি আমার এককালের গৃহশিক্ষক, মানুদা। মানব চক্রবর্তী।
আমি বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি। বিছানায় উঠে বসে দেবপ্রিয় নামের ছেলেটি কৌতুকভরা দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল। এই দৃষ্টি আমি চিনি। উপেক্ষার ভাষা চিনতে আমার ভুল হয় না।
সুদেষ্ণা বলছিল, দেবপ্রিয়দা আমাদের শুধু বন্ধুই নয়, আরও অনেক কিছু। উনি একটা বিখ্যাত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ফিনান্স ম্যানেজার। আরও অনেক গুণ আছে ওঁর, সেসব ক্রমশ প্রকাশ্য।
বিদিশা বলল, দেবপ্রিয়দা এখন আমাদের গান গেয়ে শোনাবেন।
গম্ভীর মুখ করে দেবপ্রিয় বলল, এখন আবার গান কেন?
আদুরে গলায় সুদেষ্ণা বলল, তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে দেবপ্রিয়দা!
সে তোমাকে একা একা কোনওদিন শোনাব। গানের দিন কি শেষ হয়ে গেল? সারাজীবনইতো পড়ে আছে, সুদেষ্ণা।
রাঙামুখে সুদেষ্ণা বলল, আবার ঠাট্টা শুরু করেছ?
ঘরের বাকিরা হি হি করে হেসে উঠল। সায়নী বলল, সে যখন শোনবে তখন আমরা তো আর শুনতে পাব না।
দেবপ্রিয়র দিকে তীব্র কটাক্ষ হেনেছে সুদেষ্ণা। কি যে অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে ! আমি স্থির জানি, সুদেষ্ণার ওই লজ্জারাঙা মুখ চিরকালের জন্যে গেঁথে রইল আমার বুকে। চিতার আগুন ছাড়া এ ছবি পুড়বে না।
ওরা কেউ এখন আর আমাকে লক্ষ করছে না। আমি অশরীরীর মত নিঃশব্দে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে।
:
।। চার ।।
শিঞ্জিনীর বাবা কোথায় বেরোচ্ছিলেন। হঠাৎ কি ভেবে পড়ার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। সাধারণত এ ঘরটায় উনি আসেন না। আমি একটু উৎকণ্ঠা নিয়ে তার মুখের দিকে তাকাই। কয়েক সেকেণ্ড কি ভাবলেন ভদ্রলোক, তারপর হতাশগলায় বললেন এদেশের কোনও ভবিষ্যত নেই, মাস্টার। দিনদুপুরে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি---কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই! আর পুলিশ? হুঁ হ্....
বলতে বলতে ফিরে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক হঠাৎই কি মনে পড়তে বললেন, সোম - মঙ্গল দুদিন আমরা থাকছি না, মাস্টার। কোন্নগরে যেতে হচ্ছে। সেখানে আমার এক শ্যালিকার বিয়ের ব্যাপার আছে।
বলে ঘড়ি দেখতে দেখতে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কেন কে জানি শিঞ্জিনী কথাটা আমাকে বলেনি। একটু রাগ হচ্ছিল, বললাম, দুদিন থাকবে না, কই, আমাকে বলনি তো ?
শিঞ্জিনী আমার কথার উত্তর দিচ্ছে না, মাথা নিচু করে বসে আছে। কালও সারারাত ভাল ঘুম হয়নি, বিছানায় এপাশ- ওপাশ করে কেটেছে। কপালে দুপাশের শিরা দপদপ করছে সকাল থেকে, ভার হয়ে আছে মাথা। বিরস গলায় আমি বললাম, তোমার কি পড়াশুনা করবার ইচ্ছে নেই, শিঞ্জিনী? তোমাদের এইসব ব্যাপারগুলো আগে থেকে জানা থাকলে আমার কিছু সুবিধে হয়!
শিঞ্জিনীর বাবা লোকটাকে আমি পছন্দ করি না। তার জন্যেই হঠাৎ ভেতরটা এত তোতো হয়ে উঠল কিনা কে জানে? শিঞ্জিনী কি ভাবল খানিক, তারপর গম্ভীরমুখে বড় বড় চোখদুটি তুলে বলল, আমি বোধহয় আপনাকেখুব কষ্ট দিই, মানুদা!
কিছু না ভেবেই আমি বলি, তা একটু দাও বইকি !
শিঞ্জিনীর চোখদুটি ছলছল করে ওঠে, মুখ নিচু করে সে বলে, আপনার অনেক কষ্ট। আমি জানি।
শিঞ্জিনীর গলায় কি ছিল, আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। চোখ অসম্ভব ভারী। ওই ফ্রকপরা ছোট্ট কিশোরীটিকে আমি আর ছোট বলে ভাবতে পারি না। এক মুহূর্তেই সে যেন পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠেছে। আমার খুব ইচ্ছে করে ওর কচি মুখখানা দু হাতের অঞ্জলিতে তুলে ধরি। প্রাণপণে এই পাপ ইচ্ছে দমন করে মনে মনে বলি, কি জান তুমি, শিঞ্জিনী? কতটুকু জান ?
শিঞ্জিনীর চোখের পাত্রদুটি জলে ভরে উঠছিল। আমি শিঞ্জিনীকে বলতে চাই, আমার জীবনে কোনও মহান প্রেমের আগমনবার্তা নেই আর। না, সুদেষ্ণাকেও আমি আর চাই না, শিঞ্জিনী!
কোনও কথাই আমার বলা হয় না। অস্ফুট এক নারীর মুখোমুখি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি শুধু।

রুলিং পার্টি অপোনেন্ট পার্টি

ব্রত চক্রবর্ত্তী

লোকাল থানার ওসি-র মুখ গম্ভীর, থমথমে। তবু ঠোঁটে একটা আলগা হাসি ঝুলিয়ে রেখে ওসি বললেন, ওরা মানে ওই আটজন চলে যাবার পর সে রাতে প্রথম কী করলেন?

প্রশ্নটা রিতার গালে যেন ঠাস ক'রে একটা চড় কষাল। অপমানে দুকান ঝাঁ ঝাঁ। চোয়াল শক্ত হল। কপালের দুই রগ রাগে রি রি। একটা ভয়ঙ্কর জবাব ঠোঁটে এসে গেল। তবু রিতা প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চাপল। সামলে নিল নিজেকে। মুখ তুলে একবার দেখল ওসি-কে। জবাব দিল না।

ওসি চেয়ারে ব'সে। হাতলভাঙা একটা চেয়ার। ডানদিকের হাতল নেই। রিতা খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। সকাল দশটা। বাইরে ঢিমেতালে রোদ্দুর। মাঝে মাঝে মেঘ আকাশ। পাখা ঘুরছে ঘরে। পাশের ঘরের দরজার কাছে একটা উলুকঝুলুক উৎকণ্ঠার মুখ। রিতার ছেলে। ছবছর। ঘরে খাকি রয়েছে দেখে পাশের লাগোয়া চিলতে ঘরটায়। কদিন যা ঘটছে, ঘটে চলেছে, ছেলেটা ভয়ে এত টুকুন। থানার জিপ দেখে ও-ই ছুটে এসে মা-কে খবর দেয়। তারপর পাশের ঘরে। দরজা জানলায় পড়শীদের ভিড় জমে যাচ্ছিল। ওসি হাত তুলতেই কেটে পড়েছে। জটলাটা এখন দূরে। বড়রাস্তায় থানার ভ্যান। তার আশেপাশে। জানলা দিয়েই দেখতে পাচ্ছে রিতা। এমনিতেই হাটখোলা ঘর। আড়াল বলতে কিছু নেই। কদিনে আরও বেআব্রু। মুখে আগল নেই কারুর। যে পারে দরজায় জানলায় এসে গলা তুলে জানতে চায়, তাহলে এই হল? রিতা জবাব দেয় নি। দিতে পারেনি। খর চোখ সবার। বিঁধছে। সমবেদনা ও যে এ-ঘরে আসে নি, তা নয়। রিতা ভাবলেশহীন। খর চোখের সামনে। সমবেদনায়। তারপর তো পার্টি এসে গেল। ঝান্ডা। খবরের কাগজ। খাকি।

ওসি ইতিমধ্যেই দুটো সিগারেট শেষ করেছেন। তিননম্বরটা তাক করলেন। ঠোঁটে এখন আর হাসিটা নেই। মুখ গম্ভীর। রিতা জবাব দেয় নি। তাই হয়তো।

দুটো কাঠি নষ্ট হল। তিননম্বরে ধোঁয়া। ধোঁয়া উগরে রিতার দিকে থেকে মুখ সরিয়ে ওসি চোখ রাখলেন ঘরের দেওয়ালে। দেওয়ালে একটাই মোটে ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারে মা কালীর অনেকটা জিভ-বের-করা একটা ছবি।

দুলছে। পাখার হাওয়ায়।

রিতা ঠায় দাঁড়িয়ে। ঘরে খাকি রয়েছে। এই নিয়ম। তাছাড়া এটা বে-টাইম। রিতা একা। বটুকদার লোকজন বিকেলে বা সন্ধেয় অ

াসে। খোঁজখবর নিয়ে যায়। নতুন ফেউ লাগলে জানাতে বলেছে।
দেওয়ালের মা কালী দর্শন সেরে ওসি ফের ফিরলেন রিতার দিকে, ওরা চলে যাবার পর কী করলেন?
— সেই রাতে?
— হুঁ।
— ওরা চলে যাবার পর ধুয়ে এলাম।
— কী?
— পাপ। মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল রিতার।
— আই সি! আরও যেন গম্ভীর হলেন ওসি। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বললেন, এটা কিন্তু এফ আই আর-এ নেই। ধুয়ে ে ফলেছেন বলছেন। ধুয়ে ফেলা মানেই তো এভিডেন্স চলে গেল। ধুতে গেলেন কেন?
রিতা প্রথমটা খেয়াল করে নি। খেয়াল হতেই চম্‌কে উঠল। ধাক্কা লাগল যেন সমস্ত শরীরে। টলে উঠল। আচমকা সেই রাত যেন সামনে এসে দাঁড়াল। একটা শরীর নিয়ে আট-আটটা শেয়াল-কুকুরের টানাটানি। ওসি-র কথাটা কানে-মাথায় আসতেই পলকেই মেরুদন্ডে যেন টান ধরল। পারা চড়ল রাগের। তবু তার মধ্যেই খেয়াল হল রিতার, ওসিটা ওকে ক্ষ্যাপাচ্ছে। কথা খুঁচিয়ে কথা বে র করতে চাইছে। রিতার মন বলল খাকিরা কক্‌খনো কারও ভাল করে না। ভাল চায় না। তাই চুপ থাকা ভাল। অন্তত এখন। যদি ও, লুকোবারও আর কিছু নেই। পুলিস কাগজ পার্টি কদিনে ন্যাংটো ক'রে ছেড়েছে। তাই রিতা আর কিছু না বলে চুপ হল। স্থির চোখে চেয়ে রইল ওসি-র দিকে।
সিগারেট শেষ। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে অ্যাশট্রে খুঁজলেন ওসি। নেই। দগ্ধাবশেষ মেঝেতে ফেলে জুতোর নিচে পিষলেন। তারপ র মুখে কী একটা ফেললেন। রিতাকে দেখলেন একপলক। তারপর জানলার কাছে উঠে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে পিক ফেললেন দুবার।
ওসি চেয়ারে ফিরে আসার আগেই অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়েছে রিতা।
ওর মন বলল এই খচ্চর পুলিসটাকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না। এরা যা লোক, মুখে এক বলে আর মনে এক। ফিরে গিয়ে হয়ত আজ রাতে আবার ক'জনকে পাঠিয়ে দেবে। শোড্‌টেল মাছের মতো বরটা সেই যে বছর-দুই আগে অল্প কথা-কাটাকাটির পর ভাগ্‌লবা , আর এল না। আসে নি। রিতা তখন পোয়াতি। পেটে ছ মাসের বাচ্চা। ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, ওদিকে মিন্‌সের নেশার ে জাগাড় রাখতে হবে। সেই যে পগার পার হল, আর এল না। তারপর ছ-ছটা বছর গেল। ছ'বছরের ছেলেটাকে নিয়ে এই দেড়ফাি ল ঘরে এটা-সেটা ক'রে দিন যায়। স্কুলের চাকরিটা হতে গিয়েও হল না। তার ওপর বনমানুষের হামলা।
ওসি ফের বললেন, ধুতে গেলেন কেন?
রিতা এবার রীতিমত রাগল, তখন মনে হল।
— তাই?
— হ্যাঁ।
— এভিডেন্স চলে গেল। প্রমাণ। বোঝেন?
— বুঝি।
— তাহলে?
ঠাট্টাটা বুঝল রিতা, কিন্তু গায়ে মাখল না। বরং গলা সহজ রেখেই বলল, আপনি তো স্যার মেয়েমানুষ নন। আর আপনাকে তো কেউ রেপ করে নি।
— চোপ! দাবড়ে উঠলেন অফিসার, এখনও প্রমাণ হয়নি যে য়্যু আর রেপ্‌ড্‌।
রিতা ঘাবড়ে যায়, তার মানে?
চোয়াল শক্ত হয় অফিসারের, মানেটা অতি সোজা। আপনিও জানেন জল গড়িয়ে কোথায় গেছে। অপোনেন্ট পার্টি দিয়ে রুলিং পা র্টির কজনের নামে থানায় এফ আই আর করেছেন।
— তারা কই? শেয়ালগুলো? সব তো মজা লুটে গা-ঢাকা।
অফিসার হঠাৎ চুপ হয়ে যান। অবাক মুখ। ঈষৎ অপ্রস্তুত। মুখ তুলে রিতাকে একবার দেখেন। তারপর মৃদু গলায় বলেন, আই নো, দে আর অ্যাবস্কন্ডিং। আর তো লুকোছাপা নেই, আপনিও তো জানেন তারা রুলিং পার্টির।
— তার মানে?
ওসি গলা নরম করলেন, রুলিং পার্টির ব্যাপার। এই নিয়ে কবার এলাম এখানে? আমার খেয়াল আছে, তিনবার। আজকের আসা টা অন্যরকম। বুঝেছেন?
দাঁতে দাঁত চাপে রিতা, বুঝেছি। কিচ্ছু হয় নি বলতে হবে। ওদিক কাগজে তো সব বেরিয়ে গেছে।
— ঠিক। কাগজে খবর হয়েছে। দুদিন বন্‌ধও হয়েছে ঘুঘুডাঙায়। মন্ত্রী—আলিমুদ্দিন পর্যন্ত গেছে ব্যাপারটা। জানেন?

— জানি। গলা শান্ত রাখার চেষ্টা করে রিতা, আমাকে নিয়েই তো সব।
— আই সি! আপনাকে নিয়েই তো সব। আপনার বেশ ইগো তৈরি হয়েছে দেখছি। ইগো, বোঝেন?
— বুঝি।
— তারপর?
— বটুকদার সঙ্গে কথা বলবো।
সরু চোখে তাকালেন অফিসার এবার রিতার দিক, বটুকদা! তার মানে অপোনেন্ট পার্টি! তার মানে গন্ডগোল জিইয়ে রাখতে চাইছেন?
— তা আমি জানি না। রিতাও চোপা দেয় এবার, বটুকদা যা বলবে তাই হবে। আর তাছাড়া, বটুকদা নতুন ক'রে মুখ খুলতে বারণ করেছেন।
— এই তো খুলছেন।
— আপনি জানতে চাইছেন।
— আই সি! রাগটা যেন হজম করলেন অফিসার। ঘরে আর কথা নেই। রিতা চুপ দাঁড়িয়ে। ওর দিকে সরু চোখে একবার তাকিয়ে অফিসার চোখ সরিয়ে নিলেন। ঘরে পাখার কিচকিচ। দেওয়ালের ক্যালেন্ডারে মা কালী। জিভ বের করে। অনেকটা। দুলছে। পাখার হাওয়ায়। ওসি মুখ তুলতেই পাশের ঘরের দরজার কাছ থেকে একটা মুখ সরে গেল। ছ'বছরের টিঙ্কু।
রাগ চেপে রিতা সতর্ক গলায় বলল, স্যার —।
— হুঁ। ওসি মুখ তুললেন।
— কী যেন একটা হয়নি বললেন সে রাতে।
— রেপ। ওসি গলা নামান, আই মিন, ধর্ষণ।
— যদি বলি, হয়েছে।
— এই তো বললেন এভিডেন্স ধুয়ে ফেলেছেন।
— ঘটনাটা তার আগে। ঘটনাটাতো ধুয়ে ফেলিনি স্যার।
ভ্রু কোঁচকায় অফিসারের, কী রকম?
— আটজনে মিলে আমাকে —। রিতা হঠাৎ থেমে যায়।
— আপনি বলছেন ব্যাপারটা হয়েছে?
— হ্যাঁ তাই।
— কী ক'রে হলো?
— থানায় তো বলেছি।
— আরেকবার বলুন।
রিতা ঘাবড়ে যায়। ভারী শ্বাস পড়ে। কদিনেই এদের ব্যাপারটা বোঝা হয়ে গেছে। এরা আর কিছু জানে না, শুধু বায়োস্কোপ চায়। কী করে হল। তারপর কী হল, আঁচল কতটা ছিঁড়েছিল, কোমরের নিচে শাড়ী শেমিজ ছিল কি ছিল না, দলে কজন ছিল, তারপর কী হল। তারপর। তারপর। ছ'বছরের একটা ছেলে নিয়ে একলা একটা মেয়ে মানুষ। দুর্গার পায়ের নিচে অসুর কই, যা দিনকাল, অসুরের পায়ের নিচে হাতজোড় দুর্গা। কেউ জানতে চাইল না চলে কী করে মা ছেলের। শুধু কেচ্ছা খুঁজে বেড়ানো গোটা সমাজ। অসুরের লোক ভর্তি। আগে বুকে বিঁধিয়ে দেয়, তারপর জানতে চায়, লাগল? আর, তারপর কী হল। তারপর। রিতা একটু সামলে নেয়। ঘাবড়ে যাওয়া ভাবটা যেন দম নেয়। সে রাতের ঘটনাটা কী করে ফের বলবে এখন, ভেবে নেয়। তারপর শুরু করে ঃ আমার বর এখানে থাকে না। আমি আর ছবছরের ওই ছেলে। অনেকটা রাত তখন। বিছানায় মা ছেলে ঘুমিয়ে। দরজায় টোকা পড়ল। ধাক্কা। দরজা খুলতেই ওরা। ছেলেটাকে, ঘুমন্ত ছেলেটাকে ছুঁড়ে পাশের ঘরে ফেলে শেকল তুলে দিল। তারপর আমাকে—।
ওসি-র হাত উঠে যায়, থাক, নামগুলো আর বলতে হবে না। ও হ্যাঁ, চোখ সরু হয় ওসি-র, বর এখানে থাকে না বললেন। থাকে কোথায়?
— জানি না। ছবছর আগে দরজা পেরবার পর আর এ-মুখো হয়নি। মদ খেয়ে চুর হয়ে একদিন অনেক রাতে ফিরল। টাকা চাইল। আমি চোপা দিতেই মারধর। ভাঙচুর করল এটা-ওটা। ভোর রাতে —।
— দু'জনের চলে কী করে?
— ওই, এটা সেটা।
— বটে! একটা চিলতে হাসি ওসি-র ঠোঁটে ফুটতে না ফুটতেই মিলিয়ে গেল। অফিসারের খর চোখ এবার রিতার দিকে, বাড়িতে কদিন পাওয়া যায়নি আপনাকে। কোথায় ছিলেন?
রিতার গলা নির্লিপ্ত, ছিলাম না।

— কেন?
— পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম।
— কেন?
— রাস্তাঘাটে ওরা ভয় দেখাচ্ছিল। বলছিল মুখ খুললেই প্রাণে মেরে ফেলব। ওরা বলছিল—।
— থাক। ওসি-র হাত উঠে যায় এবার, নাম বলতে হবে না। ও হ্যাঁ, পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এই তো ফিরে এসেছেন। কই, প্রাণে মারল কই?
ওসিটার মতলব বুঝে ফেলল রিতা। ল্যাজে খেলাচ্ছে ওকে। কথা দিয়ে কথা বের করবে। রুলিং পার্টির আড়কাঠি এটা। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে তাই খকিটা এসেছে কল পাততে এ-ঘরে। ইঁদুর ধরবে। বটুকদার সাবধানবাণী মনে পড়ল রিতার, কিছুতেই যেন মুখ না খোলে আর। এ পর্যন্ত যা বলেছে ওই পর্যন্ত। ব্যস।
আগের প্রশ্নটাই আবার ফিরিয়ে আনলেন ওসি, তাহলে বলছেন ভয় দেখাচ্ছিল আপনাকে। প্রাণে মারেনি।
— তাই তো দেখছি। রিতা বলল যেন নিজেকে শুনিয়ে।
ওসি ফের সিগারেট ধরাচ্ছেন। রিতা গুনল, এটা চারনম্বর। ধোঁয়া ছেড়ে, আঙুলের টোকায় বাতাসে খানিকটা ছাই ভাসিয়ে দিয়ে ঘরের চারদিকে চোখ রাখলেন অফিসার। ঘর বলতে ছোট একটা খাট, খাটের নিচে দুটো তোরঙ্গ ওপর-নিচ রাখা। দেওয়াল-ঘেঁষে কিছু বাসনপত্র, কাৎ একটা সেলাইমেশিন, দড়িতে ঝোলানো কিছু জামাকাপড়, ঝোলানো আরশি, ভাঙা শেলফে মেয়েদের টুকিটাকি প্রসাধনসামগ্রী, দেওয়ালের ওপরের দিকে একটা যুগলছবি, কুলুঙ্গিতে দেবতার পট, আর পাখার হাওয়ায় দেওয়ালে দুলে-ওঠা জিভ-বের-করা মা কালী। ঘরের থেকে চোখ সরিয়ে ওসির চোখ ফের ফেরে রিতার দিকে, যারা সে রাতে ঘরে এসেছিল আর যারা রাস্তায় ভয় দেখাচ্ছিল, একই লোক?
রিতা ঘাড় নাড়ে, না, আলাদা।
— এখন দেখলে চিনতে পারবেন?
— পারবো। সববাইকে চিনি।
— হুম! ওসি বড় ক'রে শ্বাস ফেলেন, সব মনে আছে দেখছি। কেন সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন না? ভুলে গেলেই তো সব ঠিক হয়ে যায়। সওব আগের মতো।
— আপনিই তো স্যার সব জানতে চাইছেন। মনে করাচ্ছেন।
— তা বটে। চিলতে একটা হাসি ফোটে যেন ওসি-র ঠোঁটে। হাসিটা ঠোঁটে রেখেই বলেন, কিন্তু আমার কাজ আপনাকে সব মনে করানো নয়। ভুলিয়ে দেওয়া। কী বুঝলেন?
রিতা পাশের ঘরের দরজার দিকে একবার চোখ রাখল। ছেলেকে খুঁজল। খোলা জানলা দিয়ে চোখ গেল বাইরে। এখন আর রোদ নেই। মেঘ আকাশ। ওই তো থানার জিপটা বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ভীড় হাল্কা। জটলা সরে গেছে। এ-বাড়ির দরজা জানালাতেও আর কোনও উঁকিঝুঁকি নেই। সবাই একবার ক'রে উঁকি দিয়ে সরে গেছে। আসলে, রিতার মনে হল, কদিনে পাড়ার লোকের কাছে ব্যাপারটা গা-সহা হয়ে গেছে। প্রথম কদিন আহা উহু ছিল, এখন তা-ও নেই। ওসি এই নিয়ে এ-বাড়িতে এল তিনবার। কাগজের লোকেরা প্রথম দিকটায় খুব আসছিল। এখন শুধু বটুকদার লোকজন। ওরা না ভরসা দিলে ছেলেটার হাত ধরে এ-বাড়ির দরজায় তালা ফেলে ঘুঘুভাঙা ছাড়তে হতো। একেক সময় চোখ ফেটে জল আসে রিতার। মাগো, কী সব লোকজন। মানুষ নয় সব, ঘুঘু। কার ভিটেয় চরবে ভিটে খুঁজে বেড়ায়। প্রথমে সব জানতে চাইল। তারপর চাপা দেবার চেষ্টা, আঙুল তোলে সবাই, আপনি কিন্তু কিছুই দেখেন নি। কিন্তু দেওয়ালে পিঠ ঠেকলেও রিতা এখন সাহসে বুক বেঁধেছে। রুলিং পার্টি অপোনেন্ট পার্টি, রিতা জানে ও এখন দুই পার্টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে।
ওসি ফের বললেন, কী বুঝলেন?
— বুঝেছি স্যার, চাপা গলা রিতার, কেসটা তুলে নিতে বলছেন।
— ঠিক বুঝেছেন। তা, কী করবেন?
রিতা এবার সতর্ক হয়, মানে বটুকদাকে বলবো। বটুকদা বলেছেন —।
— হুম! ওসি-র চোয়াল ফের শক্ত হয়, অপোনেন্ট পার্টি। বুঝেছি। বুঝেছি বলেই অবশ্য ওসি গলা নরম করে ফেলেন, বোঝাই যায় কথা ঘোরাবার চেষ্টা, সেই গলায় বললেন, এখন আর প্রাণের ভয় নেই?
ফিকে একটা কষ্টের হাসি ফোটে রিতার ঠোঁটে, আপনারা সব আছেন স্যার।
খোঁচাটা বোঝেন ওসি, কিন্তু গায়ে মাখেন না। বরং আগের গলাতেই বলেন, তা কী নিয়ে লাগল আপনার সঙ্গে?
— থানায় তো বলেছি।
— আবার বলুন।
— স্কুলের চাকরিটার জন্য দরখাস্ত করি। বাকি তিনজন যারা দরখাস্ত দেয় ওরা রুলিং পার্টির। ওরা তিনজন জাল সার্টিফিকেট দে

য়। আমি জানতে পেরে যাই। বটুকদাকে জানাই। পিওনের পোস্ট। পেট চলে না মা ছেলের। চাকরিটা দরকার। বটুকদাকে জানাতেই পেছনে লাগা শুরু।

চারনম্বর সিগারেটটাও শেষ। শেষ টানটা মেরে, ধোঁয়া উগরে, আগের ভঙ্গিতেই সেটা মেঝেতে ফেলে জুতোর নিচে পিষলেন অফিসার। তারপর ফের ফেরেন রিতার দিকে, পেছনে লাগা শুরু। বললেন কীরকম?

রিতার মুখে ভয়ের ছায়া পড়ে, চারপাশে তাকায়, অল্প দম নেয়, তারপর গলা তোলে, চোখ রাখে ওসি-র দিকে, তারপর ওরা ভয় দেখাতে শুরু করল। ওই যে জাল সার্টিফিকেটের ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছি।

— ওরা? ওরা কারা?

— রুলিং পার্টির লোকেরা।

— আপনি ঠিক জানেন?

— জানি।

— আপনার কোন্ পার্টি?

— বটুকদার পার্টি।

— হুম। ভারী শ্বাস পড়ে যেন অফিসারের। একটু চুপ। তারপর মৃদু গলায় বলেন, তারপর বলুন।

— ঠাট্টা টিপ্পনি তো চলছিলই। এখানে ওখানে সবজায়গায়। তারপর ওরা গায়ে হাত দিল। খালপাড়ের পাশ দিয়ে আসছি একদিন, সন্ধ্যের সময়, একা ছিলুম আমি, ওরা দুজন, ঘিরে ধরল, আচমকা।

— তারপর?

— ওরা বলল পার্টি দেখাচ্ছিস মাগী! বটুকদাকে লাগিয়েছিস! আমাদের সব জাল, আর তোর সব আগমার্কা? বেশি তড়পালে তাকে মাগী জানে মেরে দেব। নয়তো, ন্যাংটো ক'রে দেবো।

— তারপর?

— আমিও চোপা দিই। পাল্টা। বলি যে ধাপ্পাবাজি ফাঁস ক'রে দেব। ঝান্ডা ফান্ডা সব দেখা আছে। জাল সার্টিফিকেট ধরিয়ে তোমরা যতই তোমাদের লোককে স্কুলে দেবার চেষ্টা করা, চাকরিটা আমারই হবে।

— তারপর?

— আমি চোপা দিতেই ওরা খালপাড়ের জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেল। গায়ে হাত দিল।

— আর কোথায়?

দাঁতে দাঁত চাপল রিতা, গায়ে।

মুখ তুলে ওসি তাকালেন রিতার দিকে। রিতাও দেখল ওসি-র চোখ। ঘুরছে। শরীরময়। যেন সার্চলাইট। ঘুরছে। স্পষ্ট বুঝল রিতা ওর কাটাকাটা জবাব পছন্দ হচ্ছে না খাকিটার। লোকটা আরও কিছু চায়। কথা দিয়ে কথা আদায়। কিন্তু বটুকদা আর অন্যরা পই পই ক'রে বলে দিয়েছেন ও যেন আর কারুর কাছে মুখ না খোলে। ঘটনা বা জল যেখানে পৌঁছেছে, রিতাও জানে, এখন এইসব দিনে বুদ্ধি রাখতে হবে। ঘুঘু ঘুরছে এ-বাড়ির চারপাশে। একটু সুযোগ পেলেই ঘুঘু চরিয়ে দেবে এরা, ওরা। ওরা, ওরা, রিতা জানে, কারা, কারা।

রিতার শরীরে ঘুরতে ঘুরতে ওসি-র চোখ একসময় স্থির হল। ওসি গম্ভীর গলায় বললেন, সবাই আপনার গায়ে হাত দিতে চায় কেন?

রিতা এবার আড়চোখে দেখল ওসি-কে, জানে একলা মেয়েমানুষ। সবাই গায়ে বুকে হাত দিতে চায়।

— আপনার ঘরে কারা আসে?

— লোকজন।

— তবে আর একলা মেয়েমানুষ কই! বেশ তো দোকান খোলা হয়!

রিতা রাগ চাপে। সতর্ক হয় আরও। রাগটা লুকিয়ে বলে, এ ও সে এসে খোঁজ নিয়ে যায়। ওই পর্যন্ত।

— হুম! ওসিও যেন রাগ লুকিয়ে রাখছেন সেই গলায় বলেন, আপনার ছেলে কোথায়? ছেলেক ডাকুন।

— টিঙ্কুকে? কেন?

— দরকার আছে?

ঠোঁটে ঠোঁটে চাপল রিতা। একপলকের দ্বিধা। তারপর গলা তুলে ছেলেকে ডাকল। ডাক শুনে টিঙ্কু ছুটে এসে মা-র পাশে দাঁড়াল। জড়োসড়ো হয়ে। ওসিকে দেখল। মুখ নামাল সঙ্গে সঙ্গে। ওসিও দেখলেন টিঙ্কুকে। একপলক। তারপরই চোখ রাখলেন ছবছরের টিঙ্কুর চোখে, সে রাতে মা-র ঘরে যখন অত লোক এল, তুমি তখন কোথায় ছিলে?

টিঙ্কু কিছু বলার আগেই রিতা হঠাৎ গর্জন ক'রে উঠল, না স্যার, ও কিছু বলবে না। যা বলার আমিই বলছি। সে রাতে ও আমার পাশেই ছিল। ঘুমিয়ে। রাত বারটা হবে তখন। আমি দরজা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে ঘরে এল ওরা। ওরা আটজন। এসেই আমার ঘুমন্ত

ছেলেকে বিছানা থেকে তুলে পাশের ঘরে ছুঁড়ে দিল। শেকল তুলল ও ঘরের দরজায়।
ওসি-র মুখ রীতিমত গম্ভীর, কী ক'রে জানলেন ওরা আটজন? দাঁতে দাত চাপল রিতা, আমার খেয়াল আছে। ছজন আমরা চেনা। বাকি দুজন ঘুঘুডাঙার লোক নয়। অচেনা। চিনতে পারিনি। অচেনা। বাইরের লোক।
ওসি-র ডান হাত উঠে গেল ওপরে, আমি যদি বলি আপনি সে রাতে কাউকেই চিনতে পারেন নি। সব উল্টোপাল্টা নাম দিয়েছেন এফ আই আর-এ।
— তাই?
— হ্যাঁ।
রিতার গলা স্থির, যদি বলি আমি ঠিকই চিনেছি ছজনকে।
ওসি-র মুখে এবার কথা নেই। মুখ তুলে দেখলেন রিতাকে। টিঙ্কুকে। জরিপের চোখ। এ'কদিনে রিতা সব বুঝে ফেলেছে। থানা পুলিস কাগজ পার্টি করতে করতে। ওসি-র এই তৃতীয়বারের আসা এতক্ষণে আরও স্পষ্ট হল। কিছু উল্টোপাল্টা খাইয়ে সব ভুলিয়ে দিতে চায়। এ'কদিনে রিতা থানায় গেছে কয়েকবার। যেতে হয়েছে। পুলিসের গেরো। নিজেরা একটা টোপ বা গেঁট ফেলে দেয়। তারপর সেখানে চাপ দেয়। সকালে আজ যখন বাড়ির সামনে থানার জিপ দাঁড়াল, রিতার সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু বুক কাঁপে নি। এক বার ভাবছিল, মনে হয়েছিল, কাউকে দিয়ে বটুকদাকে একটা খবর পাঠায়। কিন্তু তার সময় পাওয়া গেল না। কাগজের লোকেরা কদিন খুব আসছিল। ছাপাছুপির পর কই কোথায় সব এখন যদি থাকতো!
রাগটা সরিয়ে রেখে রিতা ফের বলল, আপনি কী চাইছেন স্যার? মৃদু হাসি ফুটল ওসি-র ঠোঁটে, এই তো ধরতে পেরেছেন। রুলিং পার্টির ছজনের নাম করেছেন। হ্যাঁ, তারা নিখোঁজ। এদিকে ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। ভীষণ চাপ আসছে আমার ওপর। গোটা ঘুঘুডাঙা তেতে আসুন। তাই বলছিলুম, মিটিয়ে নিলে হয় না?
— বটুকদার সঙ্গে কথা বলবো।
ওসি চেয়ে দেখলেন রিতাকে। চুপ, অনেকক্ষণ। ঠোঁটে একটা হাসি ফুটল তারপর। হাসিটা ঠোঁটে রেখেই বললেন, তা বেশ। আপনার বটুকদাকেই বলবেন। তা আপনার বটুকদাকেই সব বলবেন না আমাদেরও কিছু কিছু বলবেন?
রিতার অবাক গলা, তার মানে?
— মানেটা অতি সোজা। বিয়ে হয়েছে বছর ছয়েক, এদিকে তো শরীর ধরে রেখেছেন বেশ। লোকের তো নজর লাগবেই। বর তা শুনলুম পগার পার। এদিকে সিঁথির কোণে সিঁদুর ফেলে রেখেছেন, ওদিকে পাড়ায় তো খুব বদনাম শুনলুম আপনার। ঘরে লোক ঢোকান।
রাগে রিতার দুকান ঝাঁ ঝাঁ, তবু ওর ষষ্ঠইন্দ্রিয় বলল, ওসি অন্য লাইন নিচ্ছে। ঘি তোলার জন্য। আঙুল ব্যাঁকাচ্ছে। তাই ও-ও সতর্ক হয়ে গেল। সেই গলায় বলল, ছেলেটাকে নিয়ে একা থাকি। লোকজন আসে। খোঁজখবর নিয়ে যায়।
— আগে তো বললেন।
— তখন তো জিগ্‌গেস করলেন।
ওসি মুখটা আমতা আমতা করলেন। এটা পাঁচ নম্বর। পাখার হাওয়া। তবু প্রথম কাঠিতেই ধোঁয়া পেলেন। সেই ফাঁকে রিতা ছেলের দিকে তাকাল। তারপর বাইরে। মেঘ সরে এখন রোদপোড়া সকাল। ঝাঁ ঝাঁ সকাল। এতটা বেলা হল, ছেলেটার পেটে কিছু পড়েনি। সকাল থেকেই বাড়িতে পুলিস, থানার জিপ। ধুম্‌সো মিনসেটা কখন বিদেয় হবে কে জানে! অন্যদিন কেউ না কেউ আসে সকালে। আসেই। আজ কেউ নেই।
পাঁচনম্বরে ধোঁয়া ছেড়ে ওসি বললেন, এই তো বললেন ঘরে লোকজন আসে। তো, সে রাতে যারা এসেছিল, আপনার চেনা লোক নয়তো?
— থানায় বলেছি।
— আবার বলুন।
— সে রাতে যারা এসেছিল, তারা মানুষ নয়, বনমানুষ।
— কিরকম?
রিতা বুঝল। ছেলের সাম্নে আবার সব বলাবে। এই হল পুলিস। এরা মদ ফুরিয়ে গেলেও বোতল চাটে। ঠিকাছে, আমিও রিতা মাইতি, রিতা মনে মনে বলল, এরা ফের ন্যাংটো দেখতে চায়। তাহলে তাই। হবো। ন্যাংটো।
ওসি তাড়া দিলেন, কই বলুন।
ছেলের মাথায় আচমকা হাত রাখল রিতা, দরজায় ধাক্কা। ভয়ে বুক কাঁপছে। দরজায় ধাক্কায় সঙ্গে গালিগালাজ। পাশে ছেলে। ঘুমিয়ে। ঘড়ির দিকে চোখ গেল। বারটা। দরজা খুলতেই ঘরে হুড়মুড়িয়ে ওরা —।
সিগারেটের ছাই বাতাসে ভাসিয়ে ওসি বললেন, থেমে গেলেন যে?
রিতা ফের শুরু করল, একজন দরজায় দাঁড়াল, বাকিরা ঘিরে ধরল। দরজা খোলার আগে ঘরের আলো জ্বেলেছি। আলোয় চিনে

ত পারলুম ওদের। রিতা একটু দম নিল। শ্বাস ফেলে বলল, দুজনকে চিনতে পারিনি। যারা ঘিরে ধরল, তাদের একজন বলল, আজ মাগী কোথায় পালাবি। আজ তোর ফুটানি বের করে দেব। আমি সব বুঝতে পারলুম। স্কুলের ব্যাপারটা। তবু গলায় সাহস রেখ বলি, কেন, কী করেছি? বলতেই ওদের একজন আমার থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, আমাদের রুলিং পার্টির ক্যান্ডিডেট রয়েছে, আর তুই কী বলে চাকরি পাবি স্কুলে? রুলিং পার্টি বুঝিস মাগী? রাগের মাথায় বলি, পিয়নের চাকরিটা আমি নেবই। আর তোমাদের লোকের সার্টিফিকেট তো জাল। ব্যস, আগুনে যেন ঘি পড়ল। ওদের ভঙ্গি বদলে গেল। চাপা গলা যেন গর্জন, তাই বটুককে জানিয়েছিস? অপোনেন্ট পার্টিকে? তোর বটুকদাকে বলবি ভোটে জিতে এসে র‍্যাপো দেখাতে ঘুঘুডাঙায়।

ওসি-র গলা ঝিমিয়ে গেল হঠাৎ, তারপর?

ভাঙা গলা রিতার এবার, সেই গলায় বলল, তারপর ওরা এ ওর দিকে চেয়ে হেসে উঠল। দরজায় যে ছিল, সে দরজা বন্ধ করল। আলোর সুইচে চাপড় দিল একজন। বাকিরা আমাকে বিছানার দিকে ঠেলতে ঠেলতে চাপা গলায় হিসহিস করল, আয় তোকে স্কুলের চাকরিটা পাইয়ে দিই আজকে। পাশের ঘরে তখন শেকল তোলা। ছেলে ওঘরে। আমি চিৎকার করতে গেলাম। একটা হাত আমার মুখ চেপে ধরল।

— ব্যস, হাত উঠে গেল ওসি-র, আর লাগবে না। এফ আই আর-এ যা বলেছেন, কাগজের কাছে, আপনার পার্টির কাছে, সব মিলিয়ে নিলাম। জানি, অন্যায় হয়েছে আপনার ওপর। টর্চার। কিন্তু সবই তো বুঝছেন। এখানেই তো থাকবেন। ঘুঘুডাঙায়। মা, ছেলে। এই তো আপনার সংসার। আগের দুবার দেখাই হয় নি ভাল ক'রে। এবার দেখলাম। শুধু একটা কথা বলবেন?

রিতা মুখ তুলল, কী?

— এখন যদি বলেন সেদিন অত রাতে ভাল বুঝতে পারেননি ওরা কারা ছিল।

— কাগজ যে সব ছেপে দিয়েছে স্যার। বয়ান পাল্টালে পার্টি রেগে যাবে। রুলিং পার্টির বিষনজরে আছি। বটুকদার দল যদি হাত গুটিয়ে নেয়?

— আই সি! অপোনেন্ট! ওসি হঠাৎ চুপ হয়ে গেলেন।

ঘরময় চুপ স্তব্ধতা। টিঙ্কুর মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিল রিতা। আসলে, সে রাতের কথা বলতে গিয়ে এখনও শরীর কাঁপে। ঘটনার দশদিন পরেও। রিতা তাই এখন নিজেকে সামলে নিচ্ছে। টিঙ্কুটা কেমন ভ্যাবাচাকা, চুপ। কাগজে খবর উঠেছে। বটুকদাই এনে সব দেখিয়েছে।

আটজন মিলে একটা মেয়েমানুষকে। রিতা একটাও কাগজ বাড়িতে রাখতে চায় নি। রাখে নি। ছেলেটা দেখবে। কিন্তু ছেলের মুখ দেখে রিতা বোঝে টিঙ্কু সব জানে। বুঝে ফেলেছে। কদিনে কী না হল। কতবার বলতে হল এক কথা। খচ্চর লোকজন শুধু শুনতে চায়, তারপর কী হল? তারপর। তারপর। চোখে জল এসে যায় রিতার। চিতা হরিণ জিরাফ গন্ডার কতরকম মানুষ দেখল এই কদিন। ফুটো খুঁজে বেড়ানো সব লোকজন। বুঝতেই পারছে স্কুলের চাকরিটা আর হবে না। এইসব গন্ডগোলে কেঁচে গেল। জেলায় ঢি ঢি, এককাঁড়ি বদনাম। কাগজে খবর ওঠায় কেউ আর জানতে বাকি নেই। রাস্তাঘাটে বেরলেই রিতা টের পায় সব আড়চোখ খরচোখে ওকে বিঁধছে, বেঁধে, ওই যে, ওই-যে। এদিকে দুটো পেট। বটুকদার লোকেরা এই দুর্দিনে ছিল তাই। না থাকলে? ওদিকে ওরা, ওরা, রুলিং এখনও, তক্কে তক্কে আছে!

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল রিতা। চেয়ার টানার শব্দে খেয়াল হল। দেখল ওসি উঠছেন। নিভে আসা সিগারেটটা জুতোর তলায় পিষে ওসি উঠলেন। সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই পকেটে নিলেন। তারপর চোখ রাখলেন জোড়াতাপ্পির, ফুটোফাটা সংসারটায়। মা ছেলে। ভাঙা সেলাইমেশিন।

পারা ওঠা আরশি। ছোট টেবিলঘড়ি, বিছানার একপাশে রাখা। দড়িতে ঝোলানো কাপড়চোপড়।

দেওয়াল আঁকড়ে ঝোলা ঝুলপড়া ধূসর একটা যুগল ছবি। প্লাস্টার-খসা ছোট দুখানা ঘুপচি ঘর, খাটের নিচে দুটো রঙ-চটা তোরঙ্গ, ঝোলানো আরশির কাচে একটা হাঁ-মুখ সংসার। মা ছেলে। ছেলে মা।

ওসি পা বাড়াতে যাবেন, আর হঠাৎ, চোখ চলে গেল দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারে। ওসি থম্‌কে থামলেন। ক্যালেন্ডারে চোখ ওসি-র। ঈষৎ বিব্রত মুখ। বাড়ানো পা থমকে থেমে। ফের চোখ তুললেন ওসি, চোখ গেল দেওয়ালে।

ঘরে পাখা ঘুরছে। দেওয়ালে ক্যালেন্ডার। পাখার হাওয়ায় ক্যালেন্ডার দুলছে।

ক্যালেন্ডারে মা কালী। জিভ বের ক'রে। অ-নেকটা...... :

:

সমীরণ বরুয়া আসছে

মনোজকুমার গোস্বামী

অনুবাদ - বাসুদেব দাস

।। এক ।।

বর্মণ ক্রেডল থেকে রিসিভারটা তুলে নিল। ওপাশে ডি. আই. জি. হর দত্ত। তাঁর উচচারিত ধাতব শব্দগুলির প্রত্যেকটিতে কিছু উদ্বেগ আর উত্তেজনা ভর করে রয়েছে

''হ্যাঁ স্যার'' --- এস. পি. বর্ধণ ধন্যবাদ জানাল। খুব সতর্ক এবং বিনয়ানত তাঁর কথাবার্তা, ---''আমি আপনার পরামর্শ মতোই সমস্ত ব্যবস্থা করেছি; দুজন ইনস্পেকটরকে চৌকিডিঙি আউটপোস্টে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে বহাল করেছি। আমি নিজে ইনস্পেকশনে যাব বলে এখনই তৈরি হচ্ছি। এর মধ্যে সমস্ত থানাগুলিকে অ্যালার্ট করে দেওয়া।''

ডি. আই.জি. দত্ত আরও কিছু নির্দেশ দেশ - খুব সংক্ষিপ্ত, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। টেলিফোনের এক্সটেনশন ওয়্যারটা কাঁপতে থাকে।

হ্যাঁ, এস.পি. বর্মণ কথাগুলি জানে। লোকটা খুব বিপজ্জনক, ভয়ানক। রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন একটির প্রধান নেতা সে। বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সে জড়িত, কয়েকটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি, অনেক দেশবিরোধী কার্যকলাপের পর --- সাত বছর আগে বহু চেষ্ঠা করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে খুব শীঘ্রই সে পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ এবং ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ক্রমবর্ধমান তৎপরতার জন্যই সে খুব সম্ভবত সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে চলে যায়। এর মধ্যে সন্ত্রাসবাদী দলটির অনেককেই পুলিশ গ্রেপ্তার করছে। অনেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে আর কিছু সেই পথ ছেড়ে দিয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। এক কথায় বলতে গেলে বিভিন্ন উপায়ে দলটির কোমর ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর হয়তো এ সমস্ত খবর পেয়েই যেন সে সীমান্ত পার হয়ে পুনরায় ঘুরে আসছে খবর পাওয়া গেছে, সীমান্তের ওপারে সে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছে--- আর সেই প্রশিক্ষণই তাকে বর্তমানে আরও ভয়ংকর করে তুলবে। সঙ্গে করে বেশি কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসাটাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

''ইয়েস স্যার -----'' খুব স্মার্টলি বলল বর্মণ। নাম অনন্ত বর্মণ, খুব কম বয়সে অনেককে সুপারসিড করে আজ সে এস. পি. হয়েছে। কারণ কেরিয়ারটা কিভাবে তৈরি করতে হয় তা তার ভালমতোই জানা। তাই সে কুকুরের মতো প্রভুভক্ত, হায়নার মতো ক্ষিপ্র, খরগোশের মতো সজাগ এবং বুনো কুকুরের মতো শিকারী। সে উচচাকাঙক্ষী--- আরও অনেক ওপরে উঠতে চায়। লোকটাকে ধরতে হবে, কিছুটা রিস্ক নিয়ে হলেও লোকটাকে ধরতেই হবে। কারণ বর্মণ জানে, যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত তার জীবনে সুনাম এবং প

দোন্নতির সুযোগ নিয়ে এসেছে এটা তারই একটা। ইট উইল বি এ প্রাইজ ক্যাচ্। হ্যাঁ, বর্মণ কেরিয়ারের কথা চিন্তা করে, খুব চিন্তা করে।

''থ্যাঙ্কইউ স্যার---'' এস.পি.বর্মণ রিসিভারটা নামিয়ে রাখে। মুখে দু এক ফোঁটা ঘাম।

।

।। দুই ।।

প্রথম পৃষ্ঠার লে - আউটটা দেখে চিফ এডিটরকে সন্তুষ্ট মনে হল না। চশমা জোড়া চোখ থেকে খুলে একমুহূর্ত সে কিছু একটা চিন্তা করল। তারপর বলল--- শিরোনামটা ভাল হয়েছে। 'সমীরণ বরুয়া আসছে'। বাঃ ইট উইল সেল। কিন্তু লোকটার একটা ফটোগ্রাফ দেবার খুব প্রয়োজন ছিল।

'না স্যার ---' স্টাফ রিপোর্টর বলল। ''কোনোমতেই লোকটার একটা ফটো জোগাড় করা গেল না। আমাদের গোস্বামী এবং লহকর বহু চেষ্টা করেছে, কিন্তু লাভ হলো না। এমনকি পুলিশ ফাইলেও তার ফটো পাওয়া গেল না।''

''আচ্ছা---'' চিফ এডিটর পকেট খুলে ঠোঁটের ডগায় একটা সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বলল--- ''গোস্বামী, আপনি থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, লহরক অন্যভাবে চেষ্টা করতে থাকুক। আপনার সোর্সগুলি থেকে খবর পাবেন, তা দিয়ে প্রতিদিন বক্স নিউজ করুন। লোকটাকে যদি অ্যারেস্ট করা হয়, তার প্রথম ছবিটা আমাদের কাগজেই বেরোতে হবে। মোটের উপর তার গতিবিধি সম্পর্কিত সম্ভাব্য সমস্ত খবর আমরা আমাদের পাঠকদের জানাতে থাকব। মনে রাখলেন, সমীরণ বরুয়া, --- দা নেম সেলস্।''

সামনের ঘরটায় টেলিপ্রিন্টার থেকে ক্রমাগত শব্দ ছিটকে পড়ছে। বিভিন্ন জায়গার টুকরো টুকরো খবর। নিচের রাস্তা থেকে ভেসে আসছে গাড়ি - মোটরের একটানা হর্নের আওয়াজ। কোনো একটা ঘরে একটা টেলিফোন বাজতে থাকে। ব্যস্তভাবে সাব - এডিটর এবং গোস্বামী উঠে গেল।

লহকর চেয়ারটা এডিটরের টেবিল থেকে আরও সামনে টেনে আনল, --- ''একটা কাজ করা যেতে পারে না, স্যার?'' --- সে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ''লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কোনোরকম আশাই তো দেখতে পাচ্ছি না। পুলিশই কোনোরকম ট্রেস করতে পারেনি। একটা কাজ করলে কেমন হয় -- একটা ফেক ইন্টারভিউ...।''

এডিটর সিগারেটের ছাই ফেলার অ্যাসট্রেটা হাতড়ে বেড়াল। তাঁর চোখ লহকরের দিকে--- ''ইউ মিন আমাদের কাউকে সন্ত্রাসবাদীর গোপন ঘাঁটি একটায় নিয়ে যাওয়া হলো--- ব্লাইণ্ড ফোল্ডেড। সেখানে যে সমীরণ বরুয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলল, তার পরবর্তী কার্যকলাপের কথা জিজ্ঞেস করল, আর জিজ্ঞেস করল সীমান্তের ওপারে তার অভিজ্ঞতার কথা, বর্তমান সরকারের প্রতি তার মনোভাব।''

''সঙ্গে সমীরণ বরুয়া, তার সাক্ষাতের ঘরটির একটি অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া ফটো''---উৎসাহের সঙ্গে লহকর বলল।

এডিটর সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল। বহুদিনের নিউজ পেপার সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার গাম্ভীর্য তাঁর মুখে ফুটে উঠল--- ''না, না, না --- ইট উইল কজ ট্রাবল লহকর। মিছিমিছি পুলিশের ইন্টাররোগেশন, ক্রস্ কোশ্চেন, --- তা ছাড়া খবরটা যদি জানাজানি হয়ে যায়, অর্থাৎ ইন্টারভিউটা যে কাল্পনিক, তাহলে আমাদের পেপারের ইমেজটাই শুধু নষ্ট হবে।

।। তিন।।

প্রকাণ্ড ড্রেসিং আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নীলা চুল আঁচড়াচ্ছিল। থমথমে নির্জন দুপুর। টেপরেকর্ডারে চড়া ভলিউমে ক্লিফ রিচার্ডর গান বাজছিল। এর মধ্যে ক্যাসেটটাও শেষ হয়ে আসছে। কাজের ছেলেটা ম্যাটিনি শো - তে সিনেমা দেখার জন্য বেরিয়ে গেছে। সাড়ে চারটের আগে তার স্বামী নীলম মহন্তরও ফেরার অভ্যেস নেই। মুখে ক্রিম ঘষতে ঘষতে নীলা প্রকাণ্ড ঘরটার শূন্যতা অনুভব করে। সামনের জানালা দিয়ে দুপুরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। জনহীন। বড়জোর মাঝেমধ্যে একটা দুটো গাড়ি যাওয়া আসা করছে। উঠে এসে নীলা বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওয়ালক্লক থেকে দুপুরের অসল সময় খসে পড়ছে। ঝিরিঝিরি বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে জানালার পর্দা। ঠিক এই সময়টাতেই --- টেলিফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। নীলা লাফিয়ে উঠে বসল। টেলিফোনটার দিকে তাকাতেও তার ভয় করতে লাগল। ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সে কি করবে। রিসিভারটা ওঠাবে কিনা কিন্তু ফোনটা ক্রমাগত বেজেই যেতে থাকে। সেই তীক্ষ্ণ শব্দে ঘরটাই যেন বারবার কেঁপে কেঁপে ওঠে।

অস্থির - বিহ্বলভাবে সে ফোনটার সামনের দাঁড়াল। সমস্ত শরীরে একটা ঠণ্ডা শিরশিরানি। কাঁপা কাঁপা হাতে রিসিভারটা তোলার আগেই সে ভাবল, যদি ওদিক থেকে ভেসে আসে তার কথা? সেই গভীর, কঠোর পুরুষালিগলা?

''হ্যালো ---'' নিজের কণ্ঠই যেন সে চিনতে পারে না। ''কি হলো নীলা---শরীরটা ভাল নেই নাকি?'' ওদিকের গলাটা শুনে সে স্বতি স্বর নিঃশ্বাস ফেলে, তার স্বামীরই কণ্ঠ। বুকের কাঁপুনিটা এখনও থামে নি। স্বাভাবিক অবস্তা ফিরে পেতে নীলার কয়েক সেকেণ্ড লাগল।

''কি হলো নীলা? ইজ সামথিং রং?''

''না না । এই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।''

''সিনেমা দেখবে নাকি আজ? স্পিলবার্গের একটা ভাল সিনেমা চলছে। তুমি তৈরি হয়ে থেক; মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমি পৌঁ

ছ যাব। সন্ধেবেলা আবার ভট্টের ছেলের জন্মদিনে যেতে হবে না?''
নীলা চোখ দুটো বুজে ফেলে। রিসিভারের ডায়াফ্রাম থেকে ভেসে আসা নীলমের কণ্ঠস্বরের মধ্যে সে ডুবে যেতে চায়। যেন এক নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়। ''আজ বাদ দাও। অনিলটাও যে কোথায় গেল, তুমি শুধু একটু তাড়াতাড়ি চলে এস। এস একা লাগছে আজ।''
প্রকাণ্ড ঘরটায় নীলা ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। পায়ের নীচে মোলায়ম কার্পেট, চারদিকেই দামি কাঠের আসবাব, একটুকরো বরফের মতো এক কোনায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা রেফ্রিজারেটার। প্রকাণ্ড বেলজিয়ান গ্লাসটায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে রঙিন টেলিভিশনটা। জানালার সুদৃশ্য রঙিন পর্দা সরিয়ে নীলা দেখতে পায় সবুজ লনটার ওপারে গ্যারেজটাকে, যেখান থেকে লাল মারুতি গাড়িটা নিয়ে কয়েক ঘন্টা আগে তার স্বামী অফিসে বেরিয়ে গেছে... কিন্তু দুরু দুরু বুকে নীলা ভাবে, --- এইগুলি সে নিশ্চিতভাবে ভোগ করতে পারবে কি? এগুলির মধ্যে, এই বর্ণময় প্রাচুর্যের মধ্যে সে তাকে দুর্ভাবনাহীন ভাবে ছেড়ে দেবে কি? কোনো একদিন, হয়তো এমনই এক দুপুরবেলা, কলিংবেলের নির্মম আহ্বান শুনে দরজা খুলে সে চেয়ে দেখবে সামনে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
''কি খবর নীলি?'' সে জিজ্ঞেস করবে। মুখে তার ক্রূর কুটিল হাসি। চুলগুলো এলোমেলো, গালভরা দাড়ি, গায়ে কাপড় জামা মলিন, কিছুটা জীর্ণ হয়ে গেছে, জিঘাংসায় পরিপূর্ণ শীর্ণ হাত দুপাশে ঝুলে রয়েছে। হয়তো সে দু পা এগিয়ে আসবে। শ্লেষ এবং ঘৃণার চোখে তাকাবে ওদের ঘরের চারদিকের সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্যের দিকে। হয়তো সে তার চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকবে। ধীরে ধীরে সে নীলাকে বলবে, ''তুমি ফিরে এস নীলি। তুমি আমার কাছে ফিরে এস।''
নীলা চমকে উঠল। একদিন না একদিন সে তো নীলার কাছে আসবেই। এটা অবশ্যম্ভাবী। নীলা জানে সে তাকে কখনও ভুলে যেতে পারবে না। সে জানে সে কোনো বাধা মানে না, সমাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, মৃত্যুর সামনেও সে নির্বিকার এবং আজ সাত বছর সীমান্তের ওপারে কাটিয়ে, গভীর অরণ্য, জন্তু এবং ক্রুদ্ধ কিছু মানুষের সঙ্গে বসবাস করে সে আরও না জানি কতখানি দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।
নিজের ওপরই ঘৃণা জন্মাল নীলার। ছিঃ ছিঃ। দশ বছর আগে কি কুক্ষণেই না তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সে তার সঙ্গে কাটিয়ে দিয়েছিলেন বহু সান্নিধ্যঘন মুহূর্ত, সে আন্তরিকতার জন্ম তার বুকে কেন হয়েছিল? প্রেম - শব্দটার প্রতি ঘৃণা জন্মে গেল তার। এর জন্যই তো সে নীলার কাছে ফিরে আসবে। কোথায়, নীলমের সঙ্গে তো তার কোনো প্রেম ছিল না। কিন্তু নীলম মহন্তের দুবাহুর মধ্যে, ফ্রিজ, টি ভি, গাড়ি সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে কি নিশ্চিন্ত আনন্দের সঙ্গে তার জীবন কেটে যাচ্ছিল। আজ সে ঘুরে আসছে, কলুষিত সেই সম্বন্ধ আজ যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে তার সাজানো ঘর। জানালার গরাদে গাল রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

।। চার ।।

কোনো একজন আরও একটা হুইস্কির বোতল খুলল, কারো হাত লেগে একটা গ্লাস ঠং করে মেঝেতে ছিটকে পড়ল। একটা পাত্রে জল ঢালার শব্দ শোনা গেল, কেউ একটা বেসুরো গলায় গাইতে চাইল একটা গান---ইটস বিন এ হার্ড ডেজ নাইট, আই শুড বি স্লিপিং লাইফ এ...। ঘরটাতে জিরো পাওয়ারের একটা লাইট জ্বলছে।
কয়েকটা সিগারেটের ধোঁয়ার ধোঁয়াময় ঘরটাতে অনুজ্জ্বল আলোতে ছড়ানো ছেটানো কয়েকটা চেয়ার টেবিল, একটা বিছানা এবং কয়েকটা ছায়ামূর্তি। ওরা বিপুল, অজিত, দুলে, বগেন, রফিযুল...। অজিত জানালার কাছে গেল, জানালাটা খুলে দিল! রাতের বাতাস আর অন্ধকার ঘরটার মধ্যে বয়ে এল।
''সারাটা রাত আমরা মদ খেলাম। অন্ধকারের সঙ্গে মদের একটা ককটেল...। কারণ আমাদেরই তো সকাল আনতে হবে।'' ---অজিত বলল। সম্ভবতঃ তার কবিতার পঙক্তি, ও কবিতা লেখে। অসমের একজন প্রথম সারিরকবি বলে তাকে গণ্য করা হয়।
''চুপ ইডিয়েট।'' ---বিরক্ত কণ্ঠে বগেন বলল। ''তোর কবিতার আমি ইয়ে...করি।'' বলেই ও একটা অশ্লীল ভঙ্গি করল।
দূলের একটা বিকৃত হাসিতে সমস্ত ঘরটা কেঁপে ডঠল। ওকে এভাবে কেন বলবে পার্টনার? এই কবিতা লিখেই তো সে কত আদরের উত্তরীয় উপহার পায়, কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের অটোগ্রাফ দেয়, আরও কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়েকে ও শালা... ---দুলের জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়! জড়ানো গলায় ও যা বলতে চায় অস্পষ্ট হয়ে যায়। ''কিহবে ভাই কবিতা লিখে,'' বিমর্ষভাবে অজিত বলল, '' আমার কবিতার প্রতিটি শব্দ শালা আমাকেই অপমান করে। পাবলিসিটি অফিসারের চাকরিটার জন্য কত চেষ্টা করলাম, আমার প্রকাশিত কবিতার কত ম্যাগাজিন ইন্টারভিউ বোর্ডে দেখালাম, কোথায়? মাঝখানে কোথা থেকে দুটো ফচকে ছোঁড়া এসে চাকরিটা থাবা মেরে নিয়ে চলে গেল।''
বাইরে একটা মোটর সাইকেল এসে দাঁড়াল। বোঝা গেল, ঈশ্বর এসেছে। ওভারসিজ স্কলারশিপ নিয়ে সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটায় পড়তে যাবে, সেই উপলক্ষে আজ দুলে, বগেনদের মদের খরচটা সে দিচ্ছে।
''হ্যালো।'' ---ঈশ্বর ভেতরে এল।
''আর ইউ লিভিং আস, ইয়ং ম্যান?'' কেউ একজন অন্ধকার থেকে জিজ্ঞেস করল।
''ইয়া, আই অ্যাম লিভিং ইউ।'' এক পেগ হুইস্কি হাতে নিয়ে ঈশ্বর ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগল। ''সকালবেলা এয়ারপোর্টে তোর

া আসবি, আসবি কিন্তু ---।'' রফিয়ুল তার দিকে দু পা এগিয়ে গেল। অনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ। আলগোছে যে ঈশ্বরের কাঁধে একটা হা
ত রাখল । ---''তুই আমাদের আমেরিকা থেকে কী পাঠাবি ভাই? প্রমিস কর যে তুই আমাদের পাঠাবি --- কয়েকটা দামি মদের বে
াতল, সাগর তীরে সানবাথরত উলঙ্গ যুবক - যুবতীর পিকচার কার্ড, কয়েকটা হট পর্ন, আর অনেক রঙিন আবর্জনা।'' --- অজিত
শেষ করল। ''প্রমিস কর, প্রমিস কর, শালা।'' বিছানায় শুয়ে থাকা বিপুল চিৎকার করল।
''প্রমিস, আই উল ডু।'' ঈশ্বর ম্লানভাবে হাসল। খালি গ্লাসটা সে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে।
''শা - শালা। তোরা সব চলে যা।'' দুলে বলল। পাঁচ বছর পর যখন ঘুরে আসবি তখন দেখবি এখানে সবচেঞ্জ হয়ে গেছে। এক কু
ইন্টাল চালের দাম বিশ টাকা, এই যে একশ পঁচিশ টাকার মদের বোতল, তার দাম ম্যাক্সি-মাম ত্রিশ টাকা। সিগারেট ফ্রি, যুবতীরা
বিয়ের জন্য খুঁজে বেড়াবে বেকার যুবক, বাতাসে ঝরে পড়া পাতার মতো উড়ে বেড়াবে টাকা, --- মানে যাকে বলে রাম রাজ্য। কা
রণ আমরা জেনে গেছি...।''
''আচ্ছা --- আমি যাই। আরও কয়েক জায়গায় ঢুকতে হবে। নীলিদের ঘরেও যাইনি। সকালবেলা এয়াপোর্টে তোদের সঙ্গে দেখা
হবে।'' খুব স্মার্টলি ঈশ্বর বলল, ''গুড বাই ইয়ং ম্যান। উইশ ইউ অল দি বেস্ট।'' অন্ধকার কোণ থেকে কেউ একজন বলে উঠল, ''
কখনও তোর সঙ্গে আমরা নানা ধরণের বাজে ইয়ার্কি করেছি,--- ভুলে যাস। কিছু মনে করিস না। তুইও তো আমাদের সঙ্গে কম
করিসনি। রেভলিউশন, বিপ্লব, কি এক সিস্টেম চেঞ্জ করার কথাও বলেছিলি, আমরা তো সেগুলিতে কোন রকম মাইণ্ড করিনি। তু
ই যে বলেছিলি, --- গুলিতে উড়িয়ে দিতে হবে। মেরে টেলিফোনের পোস্টে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। যতসব ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার, ঘুষখো
র অফিসার, লোভী মন্ত্রী, এম. এল. এ, ভুয়ো প্রেমিকা...।''
''আই হ্যাভ শাট দ ডোর অফ ইয়েস্টারডে, অ্যাণ্ড থ্রোন দি কী এওয়ে,'' ---বিব্রত হাসিতে ঈশ্বর বলল।
''আচ্ছা, গুড নাইট।''
ঈশ্বর বেরিয়ে যায়। তার মোটসাইকেল স্টার্ট করার শব্দ হয়। আর ক্রমশঃ সেই শব্দ দুরে সরে যায়।
'২ লেবেক ইন দি আর্ম সামওয়ান।'' --- ভাঙা গলায় বগেন গেয়ে উঠল। অন্ধকারের মধ্যে সে উঠে দাঁড়াল। অস্থির পদক্ষেপে সে
খোলা জানালার কাছে গেল।
''ঠিক আছে শালা'' --- হঠাৎ দুলে চিৎকার করে উঠল। ''সবাইকে গুলি করব। লাইটপোস্টে ঝুলিয়ে দেবসব ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারকে
--- মিনিস্টার, এম. এল. এ--- ঘুষখোর অফিসার, ভুয়া প্রেমিকা...'' সে মেঝের মধ্যে হামাগুড়ি দিতে থাকল। এখন দেখা যাচ্ছে সে
প্রায় উলঙ্গ, শুধু মাত্র আণ্ডারপ্যান্ট রয়েছে তার গায়ে। সে অজিত ওদের দিকে ঘুরে তাকাল। সম্পূর্ণ নেশাগস্ত --- প্রায় উন্মাদই ব
লা যেতে পারে। ---''তোরা কোনরকম চিন্তা করবি না ভাই। সব ঠিক হয়ে যাবে। হাতে স্টেনগান নেব, বোমা নেব...। ও, তোরা ভ
াবছিস এ সমস্ত আমাদের কে দেবে। ভয় করিস না, --- সমীরণ বরুয়া আসছে। হি উইল লিড আস টু হেভেন।''
প্রচণ্ড জোরে হাসতে গিয়ে দুলে থেমে গেল। মেঝের দিকে মুখ করে সে বমি করতে লাগল।
:
।। পাঁচ ।।
কেরোসিন তেলের প্রদীপটার মুমূর্ষু আলো বারান্দাটা আলোকিত করতে পারেনি। প্রদীপটা হাতে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা লো
কটির ক্ষীণ অবয়ব অনুজ্জ্বল আলোতে আরো শীর্ণ মনে হচ্ছে। সামনের গেটটা খুলে লোকটি ভেতরে এল। বিন্দুমাত্র শব্দ না করে
সে দরজাটা পার হয়ে ভেতরে এল। প্রদীপটা তার অনুসরণ করল, সে চলেনা যাওয়া পর্যন্ত। লোকটা গায়ের জামা খুলল; বিছানা
র দিকে ছুড়ে দিল। খুব ক্লান্ত তার মুখ, চুলগুলি অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। হতাশ ভঙ্গিতে সে শরীরটা বিছানায় ছেড়ে
দিল।
সমীরণ - সমীরণ
''সে নাকি ঘুরে আসছে। প্রত্যেকে তাই বলছে।'' ধীরে ধীরে সে বলল। প্রদীপের শিখাটা কেঁপে উঠল। লোকটির মুখের উপর ছায়া
টা নড়ল। ''কেন সে ঘুরে এল।'' লোকটি আবার বলল। যেন স্বগতোক্তি করল। ''আমি তো ও মরে গেছে বলেই ধরে নিয়েছিলাম
। এই বুড়ো বাপটাকে সে কখনও একটা পয়সা দিয়েও সাহায্য করতে পেরেছে কি? এখনও তার তিনটি যুবতী বোনের বিয়ে দেবা
র বাকি রয়েছে, সে ঘুরে এলে তা কি সম্ভব হয়ে উঠবে?'' তার কথা অভিমান আর আবেগে আর্দ্র হয়ে উঠল। ''তার চেয়ে... তার
চেয়ে ও মরে গেল না কেন? এত জন্তু জানোয়ার --- গুলি - বোমা - বারুদ ওকে মেরে ফেলতে পারল না?''
লোকটি প্রদীপটা খামচে ধরল। নীরবতা, তারপর প্রথমবারের জন্য তার ক্ষীণ দুর্বল কথা শোনা গেল, --- ''আমি জানি, সে ঘুরে অ
াসবে।''
।। ছয় ।।
বিরাট সুদৃশ্য টেবিলটাতে কয়েকটা খবরের কাগজ ম্যাগাজিন, একটা অ্যাসট্রে, সিগারেটের বাক্স, দুই প্লেটকাজু বাদাম, সরবতের গ
লাস; টেবিলটাকে ঘিরে পাঁজচন লোক বসে রয়েছে।
''ফুকনদা, তাহলে তো আপনে সমীরণ বরুয়াকে খুব ভালভাবে চিনতে লাগে'', স্বাস্থ্যবান লোকটি সাবধানে প্রশ্ন করল।

''ওহ, আই নো হিম, আই নো হিম'' ---যাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সে বিড়বিড় করল। তিনি একজন বৃদ্ধ। রাজ্যের সবচেয়ে প্রবীন এ বং অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। সোফাটাতে হেলান দিয়ে তিনি বসে রয়েছেন, চোখে রুপোলী ফ্রেমের চশমা, জামাটাতে দুটি সোনার বো তাম ঝলমল করছে, সামনের টেবিলটাতে হেলান দিয়ে রাখা রয়েছে তাঁরওয়াকিং স্টিক। ''ওর বাবা ছিল আমার বন্ধু। স্বাধীনতার আগে আমরা একসঙ্গে জেলে ছিলাম। স্বাধীনতার পর, কয়েক বছর পর আমি যখন মন্ত্রী হলাম, সেই লোকটির কি হলো, কোথায় ি ছটকে গেল আমি জানতেও পারলাম না। মানুষটা খুব অভিমানী ছিল। প্রবল আত্মসম্মানবোধ, তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজনীতির লোক ি ছলেন না। অনেক বছর পরে, গ্রামে একটা মিটিঙ করতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। গ্রামের স্কুলটার তিনি হেডমাস্টার।'' --- ''কি খবরফুকুন'' --- এরকম স্পষ্টভাবে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। সঙ্গে একটা ছোট ছেলে, পরিচয় দিয়েছিল তার ছেলে বে ল--- সমীরণ বরুয়া। ছেলেটি নমস্কার করেছিল, আমাকে কাকু বলে ডেকেছিল, সেদিনের বিকেলের চা-টা আমি ওদের ঘরেই খে য়ছিলাম। ওহ, আই নো হিম... ।''

''দেন হোয়াই ডোন্ট ইউ'' --- শ্রোতাদের একজন উৎসাহ সহকারে জিজ্ঞেস করল, আপনে আমাদের দলের সপক্ষে তাকে বলুন ন া। তাকে বলুন বর্তমান সরকারের বিপক্ষে লড়তে হলে আমাদের দলটাই হবে তার বেস্ট প্ল্যাটফর্ম।''

বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

''হ্যাঁ আপনি ওর সঙ্গে দেখা করুন। যেভাবেই হোক না কেন। তার সমস্ত খবর আপনাকে জোগাড় করে দেব। দেখুন ফুকনদা, রাজে ্যর রাজনীতিতে আমাদের দলকে ঘুরিয়ে আনার এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। এটা হারালে আমাদের আর কোন আশাই নেই।''

''হ্যাঁ, আমি সেটা করতে পারি। এর জন্য একটু অভিনয়, একটু ফাঁকির দরকার হবে, কিন্তু আমি সেটা করতে পারি।'' বৃদ্ধ ওয়াকি ং স্টিকটা হাতে নিল, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। ''কারণ নিজেকে আমি অনেক দূরে ছেড়ে এসেছি। এমন একদূরের পৃথিবীতে, যেখান থেকে আজ আমি আমার নিজের চিৎকার নিজেই শুনতে পাই না। আজ আমি আর আমার খবর নেবারও প্রয়োজনবোধ করি না।' '

''বুড়া আজকে কোথাও একটু বেশি টেনে ফেলেছে।'' শ্রোতাদের মধ্যে একজন ফিসফিস করে বলল।

''আমি বলব। তার দেখা পেলে তার কাঁধে আমি হাত রাখব, খুব সুন্দর অভিনয়ের সঙ্গে, কথায় দরদ আরসহানুভূতি ঢেলে দিয়ে ব লব--- সমীরণ তুই ফিরে আয়, তুই স্বাভাবিক জীবনে ঘুরে আয়, কি পাবি এভাবে? এই পথ, এই পরিবেশ, এই দেশের মানুষের জ ন্য নয়। ছেড়ে দে এসব। আমার সঙ্গে থাক। আকমা এই দলের সঙ্গে কাজ কর। মানুষকে কিছু দেবার চেষ্টা কর। তুই আমাদের সে ঙ্গ থাক সমীরণ, তুই তো জানিসই তোর বাবার সঙ্গে আমি কতদিন থেকে....''

।। সাত ।।

চারালির সিনেমা হলটার সামনে সমীরণ এসে দাঁড়াল। হলটা নতুন, প্রকাণ্ড --- তার গায়ের রঙ ঝলমল করছে। সমীরণের মনে প ড়ল, ঐ জায়গাটাতে আগে কুশ মাষ্টারের ঘর ছিল। মানুষটা কোথায় গেল? তার বদলে কি মারাত্মক ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সিনেমা হলট া দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মহানগরে এসে উপস্থিত হওয়ার আজ তার দুদিন হয়েছে। বহুবছর পার হয়ে গেছে। চারদিকেই অনেক বদলে গেছে। পথে ঘাটে এ খন আর কোন পরিচিত মুখ দেখা যায় না। দেখা যায় না কারও মুখে বন্ধুত্ব, সহানূভূতি বাআন্তরিকতা। চারালিটার এক কোণে এক টা বড় বটগাছ ছিল, এখন আর সেই প্রকাণ্ড গাছটি নেই, সম্ভবত কেটে ফেলা হয়েছে। ব্যাঙের ছাতার মতো চারদিকে গজিয়ে উঠে ছে দোকান - পাট - অট্টালিকা। পথের দুধারে শত শত ব্যস্ত মানুষ হুড় হুড় করে গাড়ি, মোটরও বেড়ে গেছে, প্রচণ্ড শব্দে পার হয়ে য াওয়া ট্রাক, সিটিবাসের তীক্ষ্ণ হর্ন এবং রিক্সার পরিত্রাহী চিৎকার সমস্ত পরিবেশটাই চৌচির হয়ে যাচ্ছে

ধীরে ধীরে সমীরণ সামনের চায়ের দোকানটাতে ঢুকল। ভেতরে হালকা ভিড়। সামনের টেবিলের একটাতে এক কাপ চা নিয়ে বল স সে। দরজায় তার সতর্ক চোখ। গত দুরাত কোন হোটেলে সে আশ্রয় নেয়নি। নিজের ঘরতো বাদই, কোন বন্ধ বা সহকর্মীর ঘরে ও সে আশ্রয় নিতে সাহস করেনি। কারণ সে বুঝতে পেরেছে, পুলিশ তার শহরে প্রবেশ করার কথা টের পেয়ে গেছে। চৌকিডিঙা পুলিশ থানা নিশ্ছিদ্র পাহারাকে কোনরকমে সে টপকে এসেছে। লামডিঙ রেলস্টেশনেও তার কয়েকজন মানুষকে সন্দেহজনক, যার া সি আই ডি ব্রাঞ্চের হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি চোখে পড়েছে, আর....। তীব্র সাইরেনের সঙ্গে দুটো ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেল। সে চমকেউঠল, চারদিকে তাকাল। --- না সকলেই নিস্পৃহ, গ্লাস, কাপপ্লেটের টুংটাং, ম্যানেজারের কর্কশ কথ াবার্তা, একটা টেপরেকর্ডার থেকে ভেসে আসা হিন্দি গান -- এই সমস্ত শব্দের মধ্যে সমস্ত কিছু ডুবে রয়েছে। খালি কাপটা নামিয়ে রাখে সমীরণ।

হ্যাঁ, সে ফিরে এল। হাতে সে কিছুই নিয়ে আসতে পারেনি। যে কয়েকটা টাকা ছিল, সেটাও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। অল্প কি ছু অস্ত্র পাওয়া গেছে, যা আগামী দুমাসে এখানে পৌঁছে যাবার কথা,--- যদিও সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করছে শুধুমাত্র বিশ্বাসের ও পর। আর এখন বিশ্বাসের ওপর এতটা নির্ভর করাটা ঠিক হয়েছে কিনা, তার সন্দেহ হচ্ছে। কারণ এখানে সে দেখছে, তার সহকর্মী রা অনেক দূরে দূরে ছিটকে পড়েছে, পিনাক মহন্ত এমন খুব ভাল চাকরি করে, দীপেন ফুকুন একজন বড় কন্ট্রাকটর, রমেন এম. এ ল. এ হয়েছে, আর পরশু রাতে সে গিয়ে দেখে তার এক সময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বিজেনের ঘরের সামনে কোন একজন মন্ত্রীর গাড়ি দঁ

াড়িয়ে রয়েছে। ...কি করবেএখন সে? কার কাছে যাবে? আচ্ছন্নের মতো সে এদিকে এদিকে ঘুরে বেড়ায়।
রাস্তায় একটা বিরাট শোভাযাত্রা, খুব সজ্জিত কয়েকটা গাড়ি, ফুলের মালা এবং টিউব লাইটের সারি, ক্ল্যারিওনেট ও ড্রাম বাজা নরত ভাড়াটিয়া বাদ্যযন্ত্রীর দল, দুই যুবক আত্মহারা হয়ে নাচছে, প্রচুর কোলাহল এবং আলো--- রাস্তা অতিক্রম করে যাচ্ছে। এক টা পান দোকানের সামনের যুবকদের ভিড়টা পার হয়ে গেল সমীরণ। পথ চলা কয়েকটি যুবতীর প্রতি ভিড়টা থেকে কিছু প্রায় অশ্লী ল চিৎকার এবং ভঙ্গি ভেসে আসছে।
একটা টিভির দোকান সামনে কিছুটা ভিড়, শো কেসের টিভিতে একটা ক্রিকেট ম্যাচ চলছে। ভিড় থেকে কয়েক জনের উৎসাহজন ক ধ্বনি ভেসে আসছে। 'আরও একটা উইকেট পড়ল। রবি শাস্ত্রী খুব ভাল বল করছে।'' -- কোনো একজন উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠল।
এগুলির মধ্যে, সে, সমীরণ বরুয়া শহরের মধ্য দিয়ে যেতে থাকে। খুব শান্ত, নিঃস্ব, নৈরাশ্য পীড়িত তার মুখ। সে দেখে অদূরের সিে নমা হলে শো শেষ হয়েছে। ভিড় ঠেলে শত শত মানুষ বেরিয়ে আসছে। সামনের দেওয়ালের সিনেমার বিরাট রঙিন পোস্টার --- নায়িকাকে উপরে তুলে বীর নায়কের ভীষণ রোমান্টিক ভঙ্গি, সিগারেট ---সঙ্গীত সন্ধ্যা --- জন্ম নিরোধের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন, রামলাল সেবাদত্তের কাপড়ের দোকানের ওপরে বিভিন্ন অন্তবাসের হোর্ডিং, প্রায় উলঙ্গ নারী পুরুষের বিরাট ছবি। নির্বিকার উদ াসীন মুখ তার নিচ দিয়ে শহরের মানুষ পার হয়ে যায়। হঠাৎ আর্তনাদের মতো শব্দে চমকে ওঠে সমীরণ, দেখে যুবক যুবতী ভর্তি দু টি বাস -- দুটোরই সামনে লাউড স্পীকারের হর্ন, যা থেকে তীক্ষ্ণ বিরাট গলায় চিৎকার ভেসে আসছে, হয়তো একটা পিকনিক পা র্টি---।
পরিশ্রান্ত পদক্ষেপে সে কোলাহল থেকে বেরিয়ে আসে। সেলুনটার সামনে একটা বাদামওয়ালা তার সামাগ্রী নিয়ে বসেছে। তার সামনে দাঁড়াল সে। দুটাকার বাদাম কিনল। এদিক ওদিক তাকাল, না কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। খুব সহজ ভঙ্গিতে সে সেলুনটার স ামনে দাঁড়িয়ে একটা দুটো বাদাম ছাড়াল। রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে শব্দ, আলো এবং ধুলো ঘিরে ধরছে। দূরের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং - এ হ্যালোজেন লাইট একবার জ্বলছে একবার নিভছে, সেলুনের একটা আয়নাতে তার মুখ দেখা যাচ্ছে, গালের দাড়ি সে পরিচ ছন্ন করে কেটে ফেলেছে। চুল বড় হয়ে গেছে, চোখে চশমা, মুখটা তাই খুব ক্ষীণ, দুর্বল দেখাচ্ছে, গালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, হয় তো সে রোগাও হয়ে গেছে।
তাহলে কার জন্য সে ফিরে এল? কিসের জন্য সে দেশ বিদেশের বনে - জঙ্গলে, জন্তু - জানোয়ার, নৃশংস মানুষের মধ্যে কাটিয়ে এল? কেন তাকে ভুলে যেতে হলো যৌবনের অনেক রঙিন স্বপ্ন? কার জন্য? এই মানুষগুলো --- সমীরণ ভাবল, এই লোকগুলো ি ক কিছুই চায়নি? সে তো ভেবেছিল , ট্রেন দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত কোন কামরার মধ্যে যেমন যন্ত্রণায় ছটফট করে মুহূর্ত গোনে প্রত্যেকে, তেমনই এক অস্থিরতার মধ্যে সবাই অপেক্ষা করে রয়েছে। কিন্তু কোথায়, কেউতো প্রস্তুত হয়ে নেই। কি সহজ, সাবলীল গতিতে সমস্ত কিছুই চলছে। চারদিকেই কি প্রাচুর্য বৈভব আর উল্লাস। এর মধ্যে তার প্রয়োজন আছে কি? এখন যদি সে ঐ চারালির মাঝ খানে দঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে --- আমিই সমীরণ বরুয়া বলে, পুলিশ ছাড়া আর কেউ তার দিকে এগিয়ে আসবে কি?
''আপনাকে আরও একটু বাদাম দেব কি?'' বৃদ্ধ বাদামওয়ালা জিজ্ঞেস করল। ঠেলাগাড়িটার ওপর জীর্ণ স্টোভ একটা জ্বলছে, কাঁ পা কাঁপা হাতে সে তাতে বাদাম সেঁকেছে, ভাজা বাদমের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। আগুনের শিখাটা অল্প অল্প করে কাঁপছে, চা রদিকের নির্মম শীতলতা সেই শিখার উত্তাপ দূর করতে পারেনি।
বৃদ্ধ বাদামওয়ালার কাছ থেকে সমীরণ একমুঠা বাদাম কিনল।
''আজ কিরকম বিক্রি হয়েছে?'' সে এমনই জিজ্ঞেস করল।
ফোকলা মুখে বৃদ্ধ হাসল, ''---চলে যায়, এমনই চলে যায় প্রতিদিন।''
এক একটা বাদাম ভেঙে বিভ্রান্তের মতো সমীরণ দাঁড়িয়ে থাকে। সে কি যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে? নাহলে তার মা র কাছে? নাহলে সে কি পুলিশের হাতে ধরা দেবে? বা সে কি চলে যাবে বহু দূরের কোন শহরে, আরম্ভ করবে এক স্বাভাবিক, নির াপদ জীবন?
ধীরে ধীরে সে এগিয়ে যায়। মহানগর তখনও উদ্দাম আবেগে চঞ্চল। শব্দের আবর্তে চারদিক ভেসে বেড়াচ্ছে, চারদিকে বিজ্ঞাপনে র ভৌতিক ভাস্বরতা হ্যালোজেন স্ট্রীট লাইটগুলি অবিরাম বিচ্ছুরণ করে চলেছে হলদে আলো।
শেষ বাদামটা হাতে নিয়ে বাদাম বেঁধে দেওয়া কাগজটা মুচড়ে ফেলে দিতে গিয়ে সমীরণ থেমে গেল। কাগজটাতে, খবরের কাগে জর সেই টুকরোটিতে স্পষ্ট এক সারি ছাপা অক্ষর, একটা নিউজ হেডলাইন--- সমীরণ বরুয়া আসছে।
ভেতরে ভেতরে সে কেঁপে ওঠে। বিব্রত ভঙ্গিতে কাগজের টুকরোটা ধরে সে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। মহানগরীর রাস্তা দিয়ে চ লেছে অগণন গাড়ি, মোটর, মানুষ, রাস্তা ছড়িয়ে পড়ছে হাসি - চিৎকার - গান। বর্ণময় পোষাক পরে পার হচ্ছে কয়েকজন যুবতী, কয়েকজন ভদ্রমহিলা, একদল ছোট ছেলেমেয়ে, পান দোকানের সামনে আড্ডাটা ভেঙে গেছে, যুবক - যুবতীর দলটা পথে নেমেছে। মন্থর পদক্ষেপে কয়েকজন বৃদ্ধ ফুটপাত দিয়ে আসছে।...
হাতের কাগজের টুকরোটা সে ভাসিয়ে দেয়।

--- এক ঝাঁক শুকনো বাতাসে ভেসে ভেসে সেই অমোঘ সংবাদ মহানগরের ব্যস্ত মানুষের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

অমলের বিয়ে

সুকুমার মন্ডল

গাঢ় কালচে রঙের ঠান্ডা পানীয়ের গ্লাসে একটা কুণ্ঠিত চুমুক দিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে অমল বলল, 'বিয়ের আগে আমার সম্বন্ধে সবকিছু আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে রাখা উচিত মনে করি, বিয়ের পরে কোনও কিছু শুনলে আপনার মনে হতে বাধ্য যে আমি আপনার সাথে প্রবঞ্চনা করেছি।' আগে ভাগে বারকতক মহড়া দেওয়া কথা কটা বলতে পেরে এই শীতল রেস্তোরাতেও অমল ঘেমে উঠলো। ঠান্ডা পানীয়ের গ্লাসের গায়ে যেমন জলের ফোঁটা, অনেকটা সেরকম।

---বেশ তো, মনে যখন বিবেকের কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করছে তখন বলেই ফেলুন,মন হাল্কা হবে।

---আপনি হয়তো ভাবছেন ...

---দেখুন ধানাই পানাই আমি দু-চোক্ষে দেখতে পারিনা, ফালতু টেনশন হয়।

---ঠিক আছে.. ঠিক আছে.. বলছি শুনুন। আমার হাঁপানির অসুখ আছে, সেই ছোটবেলা থেকে। মাঝে মাঝে টান বাড়ে, খুব কষ্টে থাকি সেসময়। গত বছর বুকে একবার যন্ত্রণা হয়েছিলো। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেছে, হার্ট বেশ দুর্বল।

---বুঝলাম, আর কোনও ব্যামো ট্যামো আছে নাকি?

---নাঃ ... মানে সেরকম কিছু মনে পড়ছে না। কলেজে পড়ার সময় একবার কঠিন জন্ডিসে ভুগেছিলাম, আর ছোটবেলায় বসন্ত হয়ছিলো। আপনি হয়ত মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। এখনও যদি মনে করেন আপনি বিয়ের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারেন।

---পিছিয়ে যাওযার প্রশ্নই উঠছে না।

---নেই! বাহ্‌ ... জানেন ভারি স্বস্তি পেলাম। আপনার মনের জোর -এর প্রশংসা করতে হয়। ... তবু একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে কেবল ঘুরছে ... বলেই ফেলি কী বলেন?

---আবার কী প্রশ্ন!

---দেখতে শুনতে আমাকে মোটেই তেমন সুশ্রী সুপুরুষ কেউই বলবে না। বয়েসটাও বেশ এগিয়ে গেছে। তার ওপর ওই সব ভয়েব
. অসুখ - বিসুখ শোনার পরও অবিচল আছেন কি করে! হাজার হোক আপনার জীবনেও সাধ - আহ্লাদ নিশ্চয়ই আছে।
আপনার মনে আছে কিনা জানিনা। আমাদের আলাপের প্রথম দিনে কথায় কথায় আপনি বলেছিলেন, আপনাদের অফিসে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে, সেই কর্মী-র স্ত্রী-কে বহাল করা হয়ে থাকে। নিয়মটা বদলায় নি আশাকরি?

--- অ্যাঁ ... ও ... হ্যাঁ ...হ্যাঁ ... আমাদের অফিসে সেটা হয়ে থাকে বটে।

---ব্যাস্‌ তা'হলে আর চিন্তার কি থাকলো। সেরকম কিছু ঘটলে আমি তো আর ভেসে যাবো না!

বিমূঢ় অমল ঢোঁক গিলে কোনমতে বলল, তা বটে!

অমৃত সমান

সমীর সেন

শনিবার সন্ধ্যা সাতটা। পাড়ার ফাংশনে মাইকে তারস্বরে জগঝম্প গান হচ্ছিল। পাশাপাশি দুটো ঘরে মা প্রীতি টি. ভি. দেখছিল, মেয়ে স্মৃতি হায়ার সেকেণ্ডারির পড়া পড়ছিল। প্রীতির মোবাইল বেজে উঠলো। সুইচ অন্ করে প্রীতি বলল, হ্যালো। ....হ্যাঁ, আমি। উ: মাইকের যা আওয়াজ। .....ঠিক আছে, কাল বিকেল চারটায় মেট্রো সিনেমার সামনে তো? ও. কে. রাখছি।

কিছুক্ষণ পর স্মৃতির মোবাইল বেজে উঠল। সুইচ অন্ করে স্মৃতি বলল, হ্যালো। ....হ্যাঁ, আমি। ইস্, মাইকের যা গাঁক - গাঁক আওয়াজ। ....ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাল বিকেলে চারটায় ভিক্টোরিয়ার গেটের সামনে। ঠিক আছে, রাখছি।

পরদিন বিকেল চারটা দশে মেট্রো সিনেমার সামনে গিয়ে প্রীতি দেখল অম্বরীশ আসেনি। বিরক্ত হল প্রীতি। ভাবল আরো মিনিট দশেক দেখে যাবে ও, ফোনও করবে না অম্বরীশকে। চারটা কুড়িতে ক্রুদ্ধ প্রীতি স্থানত্যাগ করার আগে ভাবল, এখন মানুষ দু- নম্বরি, বিশ্বাসযোগ্য নয়।

হন্তদন্ত হয়ে চারটা পাঁচে ভিক্টোরিয়ার গেটে হাজির হল স্মৃতি। দেখল পূতাগ্নি আসেনি। উদাসীন ঘড়ির কাঁটা আস্তে - আস্তে চারটা দশ ছাড়িয়ে যখন চারটা পনেরোয়, ক্রুদ্ধ স্মৃতি ভাবল, অন্য কোনো যজ্ঞকাঠ এখন পূতাগ্নিতে পুড়ে যাচ্ছে না তো? চারটা পঁচিশ পর্যন্ত অপেক্ষা করে ওকে ফোন না করেই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল স্মৃতি। অবশেষে চারটা পঁচিশে স্থানত্যাগ করল।

পরদিন কলেজ যাওয়ার সময় মোবাইল হাতব্যাগে ঢোকাতে গিয়ে হঠাৎ সভয়ে লক্ষ করল স্মৃতি মোবাইলের পিছন দিকে পাকা লাল রঙে ছোট্ট করে লেখা ইংরাজি পি অক্ষরটি ওর দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে দুষ্টু হাসিহাসছে। মা তখন বাথরুমে। ও ছুটে গিয়ে মা -র ঘরে পড়ে থাকা মোবাইলের সঙ্গে নিজের মোবাইল বদল করে দ্রুতনিজের ঘরে ফিরে এল। বাবার কাণ্ডজ্ঞানকে মনে - মনে ধিক্কার দিল স্মৃতি। কারণ গত পূজোয় ওর উচ্চপদস্থ বাবা কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে উপরি পেয়ে মা- মেয়েকে একই কোমপানির একই মডেলের দুটো মোবাইল উপহার দিয়েছিলেন।

:

প্রতিদ্বন্দ্বী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ময়নাটার ওপর বাড়িশুদ্ধ সবাই চটে উঠেছে।

কেনা হয়েছে প্রায় তিন মাস আগে। বেশ বড়োসড়ো হয়েছে এর ভেতরে, তেল চকচকে হয়েছে চেহারা। খাওয়ার ব্যাপারেও পাখিটার প্রচুর উৎসাহ। বাটিভর্তি ছোলার ছাতু মেখে দিতে না দিতে তিন মিনিটেই সাবাড়।

তা ভালো খাকদাক, মোটা হোক --- তাতে কে আর আপত্তি করতে যাচ্ছে। কিন্তু কথা বলার ব্যাপারে তারএতটুকুও উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় না। গলা দিয়ে তার একটিমাত্র আওয়াজই বেরুচ্ছে --- চ্যাঁ - চ্যাঁ - চ্যাঁ ! এবংওই ডাক শুনলেই বোঝা যাবে তার খিদে পেয়েছে ---আরো কিছু ছাতু তাকে মেখে দেওয়া হোক।

ওই কথাটাই যদি বলতে পারে, বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করতে পারে ঃ 'ছাতু দাও' --- তা হলেই তো কোথাও কোনো ঝামেলা থাকে না। কিন্তু তার ধার দিয়েই নেই ময়নাটা। ভাবটা যেন হনোলুলু কিংবা সেনিগেম্বিয়া থেকে এসেছে --- বাংলাটা তার রপ্ত হচ্ছে না কোনোমতেই।

অথচ চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই।

ভোর ছ'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সবাই তাকে পড়াতে চেষ্টা করছে।

---ডাক্ ঃ খোকন -- খোকন - বল্ ঃ বাব্লু--- বাব্লু ---

---হরে কৃষ্ণ --- হরে কৃষ্ণ

--- বলো, মা ছাতু দাও, জল দাও---

কেউ বা সামনে চুঁ চুঁ করে শিস টানছে।

ময়না ঘাড় কাত করে সব শোনে -- দারুণ মনোযোগী ছাত্রের মতোই। ভাবখানা এমন যে সব সে সঙ্গে মুখস্থ করে ফেলল, এখন পড়া ধরলেই টকাটক বলে যেতে পারবে। ব্যাস --- ওই পর্যন্তই। তারপরেই চাঁছাছোলা গলায় একেবারে আদিম অকৃত্রিম চিৎকার ছাড়লঃ চ্যাঁ - চ্যাঁ - চ্যাঁ ---

তিন মাস ধরে চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিক্ত - বিরক্ত হয়ে গেল সবাই। তখন কোথায় হরেকৃষ্ণ, কোথায় শিস; কোথায় খোকন, কোথায় বাবলু। যেই চেঁচিয়ে ওঠে, অমনি কেউ বলে ওঠে ঃ দূর হ আপদ --- দূর হ।

শেষ পর্যন্ত কমিটি বসল বাড়িতে। কী করা যায় ওটাকে নিয়ে? যখন মনে হচ্ছে, কোনদিন ও ডাকবে না, মাঝখান থেকে প্রত্যেকদিন ওকে ছাতুর পিন্ডি গিলিয়ে লাভ কী? এই তিন মাসে কমসে কম দশ টাকার ছাতু খেয়ে বসে আছে।

কাকা বললেন, খাঁচা খুলে তাড়িয়ে দাও ওটাকে।

বাবলু আপত্তি করল ঃ না --- না, উড়তে পারবে না হয়তো। শেষে বেড়ালে ধরে খেয়ে নেবে।

কথাটা মিথ্যে নয়। বাড়ির বেড়াল টুনির বেশ নজর আছে পাখিটার ওপর। প্রায়ই খাঁচার তলায় বসে মুখ উঁচু করে খুব করুণ সুরে ডাকাডাকি করে থাকে। ভাবটা এই ঃ কেন খাঁচার মধ্যে বসে কষ্ট পাচ্ছ ভাই? বেরিয়ে এসো, আমার পেটে জায়গা করে দিই -- দিব্যি আরামে থাকবে।

তখন বাবা বলবেন, তাহলে পাখিওলা আসুক। তাদের হাতে ওটাকে দিয়ে দাও।

পাখিওলা প্রায়ই যায় পথ দিয়ে। কিন্তু প্রস্তাবটা সকলের মনে থাকলেও ময়নাটাকে কেউ বিদেয় করে না।আসল কথা, ছাতু খাওয়াতে খাওয়াতে গা জ্বালা করলেও কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে সকলেরই। দেখলে গা জ্বালা করে, আবার তাড়িয়ে দেবার কথা ভাবলেও কষ্ট হয়। আছে যখন --- থাক। বাড়িতে বেড়ালটাও যখন এক মুঠো খেতেপায় তখন ওটাও না হয় খেলো ছটাক খানেক ছাতু। পূর্ব জন্মের বোধহয় দেনা ছিল ওর কাছে --- সেইটেই শোধ করে নিচ্ছে এইভাবে।

আরো মাসখানেক গেল। ময়নাটা ছাতু খায় আর চেঁচায়। সেই একটি মাত্র ডাক ঃ চ্যাঁ - চ্যাঁ - চ্যাঁ! --- দূর হ মুখপোড়া লক্ষ্মীছাড়া পাখি। আপদ কোথাকার।

এই সময় বাবা একদিন পাখিওলা ডাকলেন। ময়নাকে বিদায় করতে নয়, নতুন পাখি কেনবার জন্যে।

এবার আর ময়না নয় --- টিয়াই কেনা হল বেশ দেখেশুনে।

---কি হে, ডাকবে তো? মানে কথাটথা বলবে তো?

---ডাকবে বইকি বাবু। খুব ভালো জাতের পাখি।

---সবাই ওই কথা বলে, মা মুখ ভার করলেন, এই তো চারমাস আকে একজন একটা ময়না গছিয়ে দিয়ে গেছে। একটা বুলিও তার মুখে ফোটে নি, কেবল চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে।

পাখিওলা উঁচুদরের হাসি হাসল। বললে, এ লাইনে অনেক জোচ্চোর আছে বাবু, ভদ্দরলোকদের ঠকিয়ে দিয়ে যায়। তাই মানুষ কি

চনে কিনতে হয়।
বুবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যে সেই ভালো লোক, তা বুঝব কী করে? সেই ময়নাওলাই এসব অনেক শুনিয়েছিল আমাদের।
---দেখে নেবেন বাবু। পরে বলবেন, কী জিনিস দিয়েছি। বলেই পাখিওলা খুব কায়দা করে চলে গেল।
তখন টিয়াটিকে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ময়নার খাঁচার পাশেই। মা বললেন, মুখপোড়া ময়না দেখে নে। এবার থেকে ওকেই ছাতু ককলা সব খাওয়াব, তুই হাঁ করে থাকবি। কাকা বললেন, দ্যাখো বাবু টিয়া, খুব সাবধান। এই ময়নার কুসঙ্গে যেন পড়ো না। আর দু-মাসের মধ্যে যদি কথা না বলো --- তা হলে ল্যাজ কেটে দুটোকেই বিদায় করে দেব।
ময়নাটা এতক্ষণ একমনে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিয়াটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ -- হঠাৎ সেই পরমাশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল।
টিয়াটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ময়না -- না - চ্যাঁ - চ্যাঁ করে উঠল না। তার বদলে, পরিষ্কার মোটা গলায় যেন টিয়াটিকে সম্ভাষণ করে সে বললে, দূর হ আপদ ---দূর হ!
:

অর্থ বর্ণ-বিবর্ণ আন্দোলন কথা

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

দৈনিক সংবাদ - পত্রিকা 'বসুন্ধরা'র মালিক নবকান্ত বসুর ছোটছেলে দিব্যকান্তিকে 'যাচ্ছি স্যার' বলে রাত দশটায় ডিউটি শেষে ছাপাখানা বিভাগের মজদুর মলয় রায় বাড়ি যাবার মুখে পেছনের ডাকে থমকে দাঁড়াতেই দিব্যকান্তি বসুর শান্ত, অথচ কঠিন কণ্ঠস্বর শুনতে পায়, 'এক গ্লাস জল দিয়ে যা।' মলয়ও শান্ত, অথচ নির্বিকার গলায় উত্তর দেয় 'ওটা আমার কাজ নয় স্যার। রাম বাহাদুর কে বলুন, ওটা ওর কাজ। আমি যাচ্ছি। জানেন তো আমার ছেলে অসুস্থ। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আপনি তো আমাকে একঘন্টা আগেও ছুটি দিলেন না।' এবার দিব্যকান্তি কর্কশ হয়। চোয়াল শক্ত করে বলে, 'না, জল না দিয়ে যেতে পারবি না। কোন টা কার কাজ সেটা তোর কাছ থেকেশুনবো না। আমাদের এখানে কাজ করতে হলে, তোকে সব কাজই করতে হবে। মনে রাখিস্ কথাটা। যা, ওখানে ফিল্টার রাখা আছে, গ্লাস রাখা আছে, এক গ্লাস জল নিয়ে আয়। তারপর যাবি।'

:

এবার শুরু হয় তর্ক বিতর্ক। তক-বিতর্ক ছাপাখানায় ছড়িয়ে পড়ে। ছাপাখানা থেকে অণ্যান্য বিভাগে। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ইউনিয়ন সম্পাদক মিশ্রজি চলে আসে। মলয়ের পাশে দাঁড়ায়। দিব্যকান্তির জেদ বাড়তে থাকে। অবশেষে মিশ্রজি নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়, 'কাজ বান্ধ'। চলমান মেশিন বন্ধ হয়ে যায়। মলয় বাড়ি চলে যায়। মালিকের পুত্রের একরোখামির কথা অন্যান্য বিভাগেও ছড়িয়ে পড়ে। কাজ বন্ধ করে দেয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। দুএকবার স্লোগান বেরিয়ে আসে ''মালিকের স্বেচ্ছাচার চলবে না। দুনিয়ার মজদুর এক হও।'' এক ঘন্টা সময় দ্রুত চলে য়ায়! দৈনিক কাগজের ছাপা অচল করে দেয় মজদুরেরা। দিব্যকান্তির বিরূদ্ধে শ্লোগান একটার পর একটা খোলা দরজা জানলা পেরিয়ে বিশাল সংবাদপত্র অফিসের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

:

অবশেষে মালিক নবকান্ত বসু পুত্রকে নির্দেশ পাঠায়, 'ধর্মঘট তুলে নিতে বলো। শ্রমিকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করো। জল পাঠিয়ে দিলাম।' এর ফলে তাৎক্ষণিক ধর্মঘট উঠে গেল।

:

এই ঘটনার ত্রিশ বছর পর স্বর্গীয় মালিকের নাতি, দিব্যকান্ত বসুর পুত্র অমিতাভ বসু ঠিক রাত দশটায় মেশিন ডিপার্টমেন্টের রতনের কাছে একগ্লাস জল চাইল। রতনের ডিউটি শেষ। তবুও বিধবা মায়ের অসুস্থতার কথা ভেবেও রতন একোয়াগার্ড থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে অমিতাভ বসুর দিকে হাত বাড়িয়ে বিনীত কণ্ঠস্বর বলে, 'এই নিন স্যার।' অমিতাভ বসু পার্স থেকে দশটাকার একটি নোট বের করে বলে, 'তোমার মা অসুস্থ। ধরো।'

:

রতন রায়, মলয় রায়ের তৃতীয় সন্তান, এক কণা দ্বিধা-সঙ্কোচ না করে টাকটা ধরে।

কাঁঠাল

পঞ্চানন কুন্ডু

এই ফুল, ফুল .... এই ফুলটুসী — শয়তানীটা গেল কোথায়? আক্ষেপটা ওর ষাট বছরের ঠাম্মার। মাত্র এগার বছরের এক রত্তি মেয়ে ফুল। ঠাম্মার ইহকাল পরকালের একমাত্র সম্পদ — নয়নের মনি।

বন্দিপুর হাই স্কুলের পাশের পিচের রাস্তার দক্ষিণে ছোট এককামরা ঘরে ফুল আর ওর ঠাম্মা থাকে।

আজ তিন চার দিন ধরে ফুল সকাল সাতটা নাগাদ ঘর থেকে বেরিয়ে পিচের রাস্তা যেটা রহড়া বাজারে গ্যাছে তার পাশে এসে দাঁড়ায়। মালভর্তি ভ্যান রহড়া বাজারের দিকে যাচ্ছে। কোনটাতে শাক-সব্জি, কোনটাতে আম। আবার কোনটায় ভুর ভুরে গন্ধ ছড়ান কাঁঠাল যায়। কাঁঠালের ভ্যান দেখলে ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে ফুল। বলে একটু দাঁড়াও। ভ্যান-ওয়ালা ব্রেক কষে। ফুল কাঁঠালগুলো টিপে টিপে দ্যাখে। শুঁকে শুঁকে দ্যাখে। তারপর বলে, যাও, চলে যাও। আজ পয়সা নেই, কিনতে পারলাম না। দেখি কাল পারি কি না। কাঁঠালের ভ্যান ব্যঙ্গ হেসে চলে যায়।

ঠাম্মার চেঁচানি শুনে রাস্তা থেকে ঘরে ফেরে ফুল। আচমকা ঠাম্মার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, জান ঠাম্মা, কি সুন্দর সব কাঁঠাল গেল ভ্যান ভর্তি হয়ে। পাকা টস্-টসে। গন্ধ ভুরভুরে। খুব খেতে ইচ্ছে করে। জিবে জল রাখা যায় না। একটা কাঁঠাল আনবে ঠাম্মা— বলনা।

ঠাম্মা চারটে বাড়ির কাজের মানুষ। মাসে চার-পাঁচশো টাকা আয়। মাসের প্রথম দিকে সস্তা শাক ও রুটি। আর শেষের কয়েকদিন দুজনে কাঁচা আটা নুন দিয়ে গুলে খাওয়া। তাই ফুলের কথার জবাব ঠাম্মার কাছে নেই। তিনি কথার মোড় ঘোরান। সিঁতির কাছ থেকে কটা উকুন মেরে দে তো, বড্ড খুঁচে খাচ্ছে।

কিন্তু কাঁঠালের চিন্তা ফুলের জিব থেকে যায় না। উকুন বাছতে বাছতে বলে, কাল বিকেলে ইস্কুল থেকে এসে পাশের ঘরের নিলু রসা কাঁঠাল দিয়ে ভাত খাচ্ছিল। দেখলাম এইসা বড় কাঁঠাল রান্নাঘরের দেওয়ালে হ্যালান দেওয়া রয়েছে। জান ঠাম্মা, কাঁঠাল আমি খুব ভালবাসি। কাল একটা ছোট দেখে রসা কাঁঠাল আনো না, তোমার পায়ে ধরি ঠাম্মা। অসহিষ্ণু ঠাম্মা বলেন, সেই কপাল কি লক্ষ্মীছাড়ী, শনিমুখী তুই করে এসেছিস? নইলে মা-টা তোকে ফেলে রেখে এক মিনসের সাথে ভেগে গেল। তার আগে বাবাটা পার্টি করতে গিয়ে বোমার ঘায়ে মরে গেল। তুই তো হতভাগিনী। তুই-ই বা বেঁচে আছিস কেন? কেন বেঁচে আছিস! তিনি কুক্ ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

এখন রাত অনেক। পাশের নিলুদের রান্নাঘর থেকে কাঁঠালের সুবাস ফুলটুসীদের ঘরে ভেসে আসছে। ফুলটুসী ভাবল, নিলুদের রান্নাঘরে তালা দেয় না। শুধু শিকল দেয়। সে উঠল বিছানা থেকে। ঘোর অন্ধকারে চুপি-সাড়ে নিলুদের রান্না ঘরে ঢুকল। আর তখনই একটা বিড়াল পালাতে গিয়ে একটু বাসন নড়ার শব্দ হল। শব্দটা তখনও জেগে থাকা নিলুর মা-বাবার কানে গেল। নিলুর বাবা নিঃশব্দে একটা হাত পাখা হাতে নিয়ে বিড়াল তাড়াতে রান্না ঘরে ঢুকে ইলেকট্রিক লাইট্ জ্বেলেই অবাক হয়ে দেখল ফুলটুসী দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। আর তার ঠাম্মা রান্না ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

নিলুর বাবা রতনবাবু ফুলটুসীর ঠাম্মা লক্ষ্মীদেবীকে বল্লেন, বাঃ বাঃ লক্ষ্মীদি! রাত দুপুরে নাতনিকে নিয়ে চুরি করছেন!

লক্ষ্মীদেবী সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন, মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন।

তখন রতনবাবু ফুলটুসীর কাছে কী চুরি করেছে জানতে চাইলেন। ফুলটুসী কেঁদে ফেলে বল্ল, কিছু চুরি করিনি। রতন বাবু বল্লেন, বটে আবার মিথ্যা কথা! তিনি সজোরে ফুলটুসীর মাথায় মুখে পাখা দিয়ে মারলেন। পাখার ঘায়ে ফুলটুসীর চোখের কোনা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল। তখন লক্ষ্মী দেবী আঁচল দিয়ে ফুলটুসীর চোখ চেপে ধরে নিজের ঘরে ন্যাকড়া দিয়ে ফাটা জায়গা ভাল করে বেঁধে দিলেন।

তারপর নাতনী-ঠাম্মা পাশাপাশি শুয়ে পড়লেন। লক্ষ্মীদেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ফুলটুসী ঠাম্মার আঁচল টেনে নিয়ে ঠাম্মার দুই চোখ মুছে দিল। ঠাম্মার কান্না থামল। ফুলটুসী জিজ্ঞাসা করল, ঠাম্মা তুমি ওদের ঘরে গিছিলে কেন? ঠাম্মা — আগে বল তুই কেন গিছিলি?

—অমি কাঁঠাল খেতে গিছিলাম। এবার বল তুমি কেন গিছিলে?

ঠাম্মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বল্লেন, তোর জন্য চুরি করতে!

— আমার জন্য কী চুরি করতে গিছিলে ঠাম্মা?

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঠাম্মা বল্লেন, কাঁঠাল!